মতিউর রহমান মল্লিক

র•চ•না•ব•লী

৪র্থ খণ্ড

মতিউর রহমান মল্লিক রচনাবলী
৪

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

মতিউর রহমান মল্লিক রচনাবলী

চতুর্থ খণ্ড

দেশজ প্রকাশন

www.nagorikpathagar.org

মতিউর রহমান মল্লিক রচনাবলী
চতুর্থ খণ্ড

সম্পাদক
আবুল আসাদ

সম্পাদনা পরিষদ সদস্যবৃন্দ
ড. আ জ ম ওবায়েদুল্লাহ
মোশাররফ হোসেন খান
সোলায়মান আহসান
তাফাজ্জল হোসাইন খান
সাইফুল্লাহ মানছুর
সাবিনা মল্লিক
কামরুন্নেসা মাকসুদা
ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ
নাঈম আল ইসলাম মাহিন

সহকারী সম্পাদক
আফসার নিজাম
ইয়াসিন মাহমুদ

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০২৪
গ্রন্থস্বত্ব : কবি পরিবার
প্রচ্ছদ : হামিদুল ইসলাম

প্রকাশক
মনোয়ারুল ইসলাম
দেশজ প্রকাশন, ক-১৫/২/এ, বি-১, (৩য় তলা),
জগন্নাথপুর, ভাটারা, ঢাকা-১২২৯
মোবাইল: ০১৭০৮১৬৯৩৩৮,
ই-মেইল : deshoz2017@gmail.com
ISBN : 978-984-98985-8-0
মূল্য : ৬১০/ (ছয়শত দশ টাকা মাত্র)।

www.nagorikpathagar.org

সম্পাদকের কথা

বর্তমান সেক্যুলার সভ্যতার অন্যতম জনক আর্নল্ড টয়েনবী বলেছেন, 'জগতের মৌলিক মহৎ সৃষ্টি ও কাজ ঈশ্বরের ইশারা থেকে হয়'। একজন খুব বড় চিকিৎসক তাঁর মেটেরিয়া মেডিকায় বলছেন, 'চিকিৎসা আমরা করি না, ঈশ্বর করেন। ঔষধ দিয়ে যাচ্ছি কোনো ফল হয় না। হঠাৎ একদিন মাথায় এসে নতুন চিন্তার উদয় হলো। ঔষধ দিলাম, রোগ চলে গেল। এই চিন্তা আমার নয়, ঈশ্বরের ইচ্ছা'। জগতের বিস্ময়কর সব মহৎ কর্মের ব্যাখ্যা এটাই। মহান আন্দোলন হোক, মহৎ মহাকাব্য হোক- সব মৌলিক চিন্তা ও সৃষ্টির পেছনে এবং মহৎ পরিবর্তনের মধ্যে থাকে দয়াময় আল্লাহর ইচ্ছা। বাংলা গানের জগতে মতিউর রহমান মল্লিকের রেনেসাঁর কথা যখন চিন্তা করি, তখন এটাই মনে হয় যে, বাংলা গানের এই রেনেসাঁ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইচ্ছা ও প্রেরণার ফল।

মল্লিকের লিখা গান, মল্লিকের গাওয়া গান বাংলা গানের চলমান ধারায় একটা বড় ঝড়, একটা বড় সয়লাব। কিন্তু এটা ধ্বংসের নয়, সৃষ্টির। বাংলা গানের চলমান ধারায় মল্লিকের গান নিয়ে আসে শক্তিমান ও সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা, লক্ষ্যকে করে সুনির্দিষ্ট। এই ক্ষেত্রে মতিউর রহমান মল্লিকের কোনো পূর্বসূরী নেই। মহাকবি কায়কোবাদের কাব্যে আমরা আজান শুনি, কিন্তু সেটা বিলাপের মতো। তা মসজিদের দরজা খোলে না, মুসলিম টানে না। দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠিছে দ্বীন-ইসলামের লাল মশাল,' 'বাজিছে দামামা বাঁধরে আমামা শির উঁচু করি মুসলমান, 'ধর্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি, ইত্যাদির মতো হাজারো যুগান্তকারী কথা আমরা মহাকবি নজরুলের কবিতা-কাব্যে পাই। এগুলো আমাদের জন্যে মূল্যবান পাথেয়, কিন্তু পথ আমরা পাই না, পথের ঠিকানা এখানে নেই। আধা-অন্ধকার সেই যুগে মহাকবি নজরুলের পক্ষে তা দেয়া সম্ভবও ছিল না। ইসলামের কবি মহাকবি ফররুখ তাঁর কাব্য-মহাকাব্য-কবিতায় হেরার রাজতোরণের স্বপ্ন দেখেছেন। চেয়েছেন সেই রাজতোরণের দিকে মুসলমানদের আবার নতুন অভিযাত্রা হোক। তাই তিনি 'রঙীন মখমল দিন' এর শেষ ঘোষণা করে 'মাঝি সিন্দাবাদ'কে 'নতুন পানিতে' সফরের জন্যে 'হালখুলে' দিতে বলেছেন। এখানে ফররুখ স্বাপ্নিক মহাকবি, বাস্তবের নায়ক তিনি নন। তিনি মঞ্চ পাননি, সামনে মানুষও পাননি। কিন্তু কবি মতিউর রহমান মল্লিক বাস্তবেরও নায়ক। তিনি গান লিখেছেন, সুর দিয়েছেন, আবার মঞ্চে তিনি তাঁর গানের গায়কও। তিনি স্বাপ্নিকমাত্র নন। তাঁর আহ্বান সুনির্দিষ্ট,

www.nagorikpathagar.org

চাওয়া একেবারে সুস্পষ্ট। তাঁর গান দেশে 'পূর্ণ ইসলামী সমাজ' দাবি করে। বঞ্চিত মানবতার মুক্তির জন্যে 'রাশেদার যুগ' ফিরে পেতেও তাঁর গান উচ্চকণ্ঠ। সবার উপরে কবি মতিউর রহমান মল্লিক সৌভাগ্যবান যে, তাঁর অবর্তমানে তাঁর এই গানের পতাকা ভূলুণ্ঠিত হয়নি, ধারাবাহিকতা ধারণের জন্যে অব্যাহত পতাকাবাহীদের তিনি পেয়েছেন।

কবি রবীন্দ্রনাথ, কবি নজরুল, কবি ফররুখের মতো কবি মতিউর রহমান মল্লিকও গানের জগতে একজন যুগস্রষ্টা। সফল ও ক্রমবর্ধমান একটা নতুন ধারার তিনি জনক এবং এই ক্ষেত্রে তিনি কিছুটা অনন্যও। কবি নজরুল, কবি ফররুখ, গায়ক আব্বাস উদ্দিন মুসলিম জনতাকে যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, যে জাগরণের বীজ তাঁদের মনে বপন করেছিলেন, সে জাগরণকে কবি মল্লিক ভাষা দিয়েছেন, পরিচয় দিয়েছেন, পথ-নির্দেশনা দিয়েছেন। একটা উপযুক্ত সময়ে, প্রয়োজনের মূল্যবান মুহূর্তে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের একটা ইচ্ছা তাঁর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

কবি রবীন্দ্রনাথ, কবি নজরুলদের বিশাল সাহিত্য-কর্মের মতো নয় কবি মতিউর রহমান মল্লিকের সাহিত্যকর্ম। তবে সংখ্যা দিয়ে সব সময় সাফল্য বিচার হয় না। ম্যাক্সিম গোর্কির এক 'মা' উপন্যাস রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ছিল মধ্যমণি। একটা গান, একটা কবিতা, এমনকি একটা কথাও বদলাতে পারে অনেক কিছুই।

অপরিণত বয়সে সবাইকে কাঁদিয়ে আমাদের মাঝ থেকে চলে গেছেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক। এই যুগস্রষ্টা কবির সাহিত্য-কর্মকে সংগ্রহে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্যোগের ফল হিসেবে মতিউর রহমান মল্লিক রচনাবলী প্রকাশিত হলো। আমরা আশা করছি এতে মানুষের চাহিদা পূরণ হবে ইনশাল্লাহ।

মল্লিক রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডে ১টি কবিতার বই– আরেক আকাশ; ৩টি গানের বই– ধৈর্যের গান, গানের খাতা, সূর্য ওঠার আগে; ১টি ছড়ার বই– ভেজাল সমাচার; ২টি প্রবন্ধের বই– উলুঘ খানজাহান ও তাঁর খলিফাতাবাদ রাজ্য, প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ : এক সর্বস্পর্শী প্রেরণা ও সাক্ষাৎকার গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে।

আবুল আসাদ

www.nagorikpathagar.org

চতুর্থ খণ্ডে গ্রন্থিত বইসমূহ

কবিতার বই

আরেক আকাশ ১১

গানের বই

ধৈর্যের গান ৫৫

গানের খাতা ১০৫

সূর্য ওঠার আগে ১৫৭

ছড়ার বই

ভেজাল সমাচার ১৮৫

প্রবন্ধের বই

উলুঘ খানজাহান ও তাঁর খলিফাতাবাদ রাজ্য ১৯৭

প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ : এক সর্বস্পর্শী প্রেরণা ২২৫

সাক্ষাৎকার ২৬৯

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

আরেক আকাশ

[অগ্রন্থিত]

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

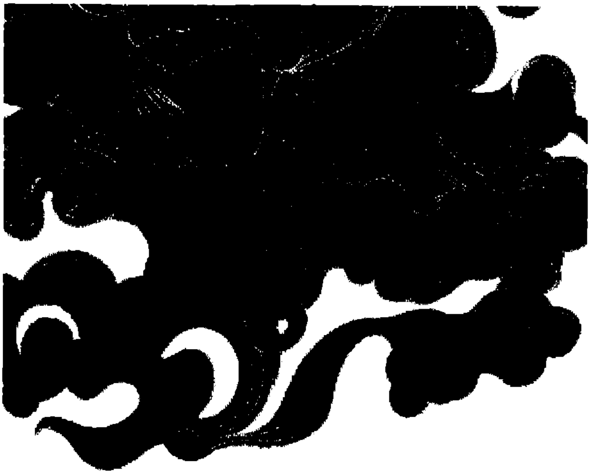

আরেক আকাশ

মতিউর রহমান মল্লিক

www.nagorikpathagar.org

প্রসঙ্গ কথা

'আরেক আকাশ' কবি মতিউর রহমান মল্লিকের কবিতার একটি পাণ্ডুলিপি। এই পাণ্ডুলিপির বেশকিছু কবিতা 'ত্রৈমাসিক প্রেক্ষণ' পত্রিকায় প্রকাশিত। প্রেক্ষণের সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ সংখ্যায় 'একক আকাশ অনেক নক্ষত্র' নামে কবির অনেকগুলি গান-কবিতা নিয়ে একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়। ওই ক্রোড়পত্রের কিছু কিছু কবিতা 'অনবরত বৃক্ষের গান' কাব্যগ্রন্থে স্থান পায়। বাকী কবিতা ও নতুন কবিতা নিয়ে কবির পরিকল্পিত 'আরেক আকাশ' পাণ্ডুলিপিটি তৈরি হয়।

হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে লেখা সর্বশেষ কবিতা 'চিকিৎসা'ও এই পাণ্ডুলিপির অর্ন্তভুক্ত হয়। পাণ্ডুলিপিটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন আফসার নিজাম।

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

আলো ও সুঘ্রাণের ইতিহাস/ ১৭
গন্ধরাজ এবং একজন মোসতফা কামাল/ ১৮
কষ্টের এক অমূল্য তালিকা / ১৯
কবি ও একটা মেঁও-এর গল্প/ ২০
হিজল বনের পাখি/ ২২
সার্ক/ ২৩
ইকবালের দোয়া/ ২৪
কারোর ভাগে/ ২৬
মানুষের কি হলো/ ২৭
ঘোষণা/ ২৮
ফররুখ আহমদ/ ২৯
ঈদের আকাশ/ ৩০
ঈদের কথকতা/ ৩২
প্রিয়তম-র জন্য কয়েক পঙ্‌ক্তি/ ৩৬
হাসানের জন্য/ ৩৮
কফি/৩৯
চতুর্দিকেই/ ৪০
দলের মানুষ/ ৪১
ইয়ে/ ৪৩
সেরা মানুষের জীবন/ ৪৪
তুমি/ ৪৫
সজাগ থাকার রাত্রিদিন/ ৪৭
লাশখেকো/ ৫১
বগুড়ার সীমাহীন মানুষ/ ৫২
চিকিৎসা/ ৫৩

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

আলো ও সুঘ্রাণের ইতিহাস

অনেক আগেই আমি শহীদদের সম্পর্কে জানবার জন্যে
একঝাঁক জালালী কবুতর
উড়িয়ে দিয়েছিলাম
কেবল শহীদ আবদুল মালেক ভাইয়ের নিভৃত গ্রামের বাড়ি
অন্তত দু'বার আমি গিয়েছি-
শিমুল আর শিমুল যেখানে;
যেখানে প্রতিবছরই ছড়িয়ে যায় তাঁর বিচূর্ণ মস্তক
এবং বিক্ষত বক্ষের রক্তের পতাকার মতো
অলৌকিক এক কারুকাজ।

বস্তুত এভাবেই শহীদেরা চিরকাল অমর থেকে যায়
এবং এভাবেই কেউ যেনো মুদ্রিত করে গেছে দলিলেরও অধিক দলিল।

তারপর এইসব আলোচনা
এবং সমুদ্র যাত্রার এক ফাঁকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাখিরা
দিয়ে গেলো আরেক খবর-
বলে গেল মৃত্যুর ঠিক পূর্ব মুহূর্তেও শহীদের দৃষ্টি নাকি
প্রশান্ত এবং প্রজ্ঞাবান দূরগামীর মতো
দূরান্তরে থাকে :
নিষ্পলক-
অনবরত অন্য কোথাও!
এবং তাঁর কবর থেকে বেরিয়ে পড়ে আলো ও সুঘ্রাণের অভূতপূর্ব অধ্যয়ন।

যেমন নিষ্পলক তাকিয়ে থাকলো শহীদ মুহসিন কবীর
যেমন শহীদ আল মামুনের কবর থেকে বেরিয়ে আসলো
আলো ও সুঘ্রাণের ইতিহাস
হায়! আমারও যদি এরকম সাত-সমুদ্র তের-নদীর কপাল হতো!

www.nagorikpathagar.org

গন্ধরাজ এবং একজন মোসতফা কামাল

ছোটবেলা থেকেই গন্ধরাজের প্রতি
আমার একটা সমৃদ্ধ উৎসাহ প্রজাপতির মতো
উড়ে বেড়াতো
ছোটবেলা থেকেই গন্ধবহ
শুভ্রতার প্রতি আমার একটি উন্মোচিত আগ্রহ
ঘুরে বেড়াতো
ছোটবেলা থেকেই সবুজাভ দৃশ্যাবলীর প্রতি
আমার একটি পক্ষপাতিত্বের পাখি
অনবরত উড়াল দিতো

সেই তখনো- আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি
মোসতফা কামাল ভাইকে দেখলে:
কেন আমার গন্ধরাজের নিভৃতির কথা মনে পড়তো
শুভ্রতার নির্মলতার কথা মনে পড়তো
মেধাবী সবুজের কথা মনে পড়তো

এবং এখনো– আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না–
গন্ধরাজের দিকে চোখ গেলে,
শুভ্রতা ও সবুজের প্রতি দৃষ্টি পড়লে;
কেন একজন মোস্তফা কামাল ভাই
অমরতার উদ্ধারের মধ্যে কলকণ্ঠ হয়ে ওঠেন।।

www.nagorikpathagar.org

কষ্টের এক অমূল্য তালিকা

পারতপক্ষে মহাবৃক্ষের বাহুমূলে কিংবা
হাতের অগ্রভাগে অজস্র পাতা থাকতে হয়
থাকতে হয় অজস্র পাতায় পাতায় হরিৎ আন্দোলনের উপাত্ত
এবং হরিৎ আন্দোলনের তাৎপর্য হচ্ছে
ছায়ার মধ্যে বেশুমার আশ্রয়ের বিলক্ষণ আত্মপ্রকাশ।
তার ফলে নির্মিত হয় নরম রোদ
প্রথম সন্ধ্যার মতো হালকা মেঘের আগ্রহ
কখনো অনাবৃষ্টির তুমুল কোলাহল
কখনো অতিবৃষ্টির যোগ-গুণ-ভাগের নিথর ফলাফল
কখনো বা ঝড়ের বিদ্রোহ
এবং সর্বোপরি সবরকমের
নট্‌কনা নীড়ের প্রপাত ও প্রশ্রয়।
অর্থাৎ পাখিদেরও গড়ে তুলতে হয়
দৈনিক সংগ্রামের মতো যাবতীয়
কষ্টের এক অমূল্য তালিকা।

www.nagorikpathagar.org

কবি ও একটা মেঁও-এর গল্প

আমাদের অফিসের মেঁউ
হঠাৎ সে একদিন
হয়ে গেলো খোঁজহীন
খুঁজে তারে পেলো নাতো কেউ।

যায় কেটে দিন যায় রাত
কতো কথা তারে ঘিরে
তবু না সে আসে ফিরে
করে না সে কোনো উৎপাত।

মাঝে-মাঝে অফিসের লোক
তাই তার স্মৃতি নিয়ে
ব্যথাভরা কথা দিয়ে
নানাভাবে করে যায় শোক।

অফিসের কোনো এক কবি
মোনাজাত করতো যে
আল্লাহকে বলতো সে
মেঁউ এক জীবন্ত ছবি।

স্নেহ-মায়া-মমতায় আঁকা
তারে তুমি দাও ফের
দিয়েছো যেমন ঢের
মেঁউ ছাড়া যায় নাতে থাকা।

www.nagorikpathagar.org

বহু মাস পরে সেই দোয়া
আল্লাহর দরবারে
গৃহীত হলে তারে
হঠাৎ করেই গেলো পাওয়া।

স্বাস্থ্যটা ভেঙে গেছে বেশ
সমস্ত লোম তার
কালি মেখে একাকার
চেহারায় কান্নার রেশ।

ভেতরে সে ঢুকলো না আজ
দরজার মাঝখানে
কি কারণে কেবা জানে
ধীরে ধীরে তুললো আওয়াজ।

মেঁউ মেঁউ মেঁউ মেঁউ মেঁউ
তারপর কবিকে সে
চোখে চোখে চোখ রেখে
দেখলো যা দেখলো না কেউ।

www.nagorikpathagar.org

হিজল বনের পাখি

হিজল বনের হে পাখি আমার ভাই
হিজলের বনে সব আছে তুমি নাই
হলদে ডানার বিহঙ্গ ওগো তুমি
তুমি উড়ে গেছো পার হয়ে, মরুভূমি।

অভিমানী ভাই, বুকের ভেতরে সব
জ্বালা-যন্ত্রণা চেপে রেখে, উৎসব
করে গেছো হায়! বাইরে বাইরে প্রিয়
তোমার তুলনা তুমিই; অতুলনীয়।

অভিমানী ভাই, অভিমান করে গেলে
সব ভালোবাসা-প্রণয় পেছনে ফেলে
কবি ফররুখ এভাবেই একা একা
বিদায় নিলেন লিখে রেখে শেষ লেখা।

হিজল বনের হে পাখি গায়ক পাখি
স্মরণে তোমার ভিজে ওঠে কেনো আঁখি।

www.nagorikpathagar.org

সার্ক

কারো তরে তারাভরা সার্ক
কারো তরে ডার্ক আর ডার্ক
সময়ের পিঠে তাই দিয়ে রাখে মার্ক
তারাভরা সার্কের হবে স্পার্ক।

www.nagorikpathagar.org

ইকবালের দোয়া

মুসলমানের সারা অন্তর প্রোজ্জ্বলন্ত বানিয়ে দাও।
রব হে আমার
হে আমার রব
হৃদয়ে হৃদয়ে তীব্র আবেগ শাণিয়ে দাও

ফারান–ভূমির প্রতিধূলিকণা
করো বিদ্যুৎ–চমকিত
নিমিলিত চোখে জাগাও রূপের
আগুনের নেশা অপরাজিত।

বন্ধদৃষ্টি শরাহত করো
জ্যোতির বাণে;
আমি যা দেখেছি, সবাইকে তা–ই
দেখাও পষ্ট তোমার দানে।

কাবার অসীম ছায়ায় সেই সে
হরিণীরে আনো ফিরিয়ে ফের
হারিয়েছিলো যে দিশা পথের।

অচেনা নগরী ছাড়িয়ে কোথাও
মরুর বক্ষে বসুক মেলা
যেখানে নীরবে যতো উদারতা করে খেলা।

প্রাণের মৃত্যু ঘোচাও আমার
নামিয়ে গোপনে শেষ কেয়ামত;
মাহ্‌ফিলে দাও সব লাইলির
উপচানো যতো মুহব্বত।

www.nagorikpathagar.org

যুগ ও কালের ঘোর তমশায়
হাহাকার–ঘেরা চিত্‌–মাঝারে
এমন প্রণয় দাও দয়াময়
যা দেখে শরমে ডুববে ব্যাকুল চাঁদ হাজারে।

সকল স্বপ্ন আকাশ ছোঁয়ানো আর
করো তারকার আসনে উচ্চকিত
এবং খুদীর সাগর–সেঁচা সে মুক্তির মণিহার
পরাও হৃদয়ে আনন্দ–আলোকিত।

মুসলমানের সারা অন্তর প্রোজ্জ্বলন্ত বানিয়ে দাও।
রব হে আমার
হে আমার রব
হৃদয়ে হৃদয়ে তীব্র আবেগ শাণিয়ে দাও.......

[ইকবালের কবিতার সংক্ষেপিত তরজমা]

www.nagorikpathagar.org

কারোর ভাগে

কারোর ভাগে আগুন পড়ে
কারোর ভাগে পড়ে ফাগুন
কারোর জীবন এমন জীবন–
ভাত নেই পাতে- আছে শুধু নুন।

মুখ বুজে-বুজে সবকিছু সয়
জেনে-শুনে তবু সব ব্যথা বয়
কারোর জীবন বোবার মতোন–
নিজকে নিজেই করে যায় খুন।

কারোর ভাগে বিষের বাঁশি
কারোর ভাগে বিশেষ হাসি
কারোর কপাল এমন কপাল–
যেখানে শুধু লেগে থাকে ঘুণ।

আশায় আশায় তবু বেঁচে রয়
মেনে নিয়ে ক্ষত, মেনে নিয়ে ক্ষয়
কারোর পরান এমন পরান–
যতো না করুণ তারচে করুণ।

www.nagorikpathagar.org

মানুষের কি হলো

মানুষের কি হলো যে
সে আজ সবচে বেশী চেষ্টা করছে
মুখোশ উদযাপনের জন্যে
গতির বিরুদ্ধে যে চাষাবাদ
সেই চাষাবাদের মধ্যেই সে খুঁজে ফিরছে উৎকর্ষ
উৎকর্ষের উপমা।

এবং প্রতিবাদের ভাষায় তার আর আগ্রহ থাকছে না
তাহলে শেষ পর্যন্ত এই হলো
মানুষের নামতা পড়ার পরিণাম?

মানুষের কি হলো যে
সে এখন ক্রমাগত ধর্ষণ এবং হত্যাকাণ্ডের
ইতিহাসই হয়ে যাচ্ছে
এবং এইসব ব্যাপারে
রেকর্ড ভঙ্গকারী শোষকদের স্বপ্নের সাক্ষী হয়ে
লুফে নিলো মীরজাফরের 'পলিটিকাল সাইন্স'।

এবং দেশপ্রেমের অভিজ্ঞানে
তার আর কোনো প্রেক্ষণই থাকলো না
তাহলে এই হলো মানুষের জন্মগ্রহণের
নির্বাচিত লক্ষ্য ও চলচ্চিত্র?

মানুষের কি হলো যে
সে আজ সবচে' বেশী কামনা করছে
মুখোশ এবং মুখোশের পরিণাম!

www.nagorikpathagar.org

ঘোষণা

গাঙচিল তার নীড় ভেঙে চলে যায়
নদীহীন নদী ভেসে ওঠে ক্রমাগত
বালিয়াড়ি যতো দ্রুত আরো দ্রুত ধায়
দিগন্তে ওড়ে দুর্দিন অনাগত।

দিগন্তে নড়ে কালো শকুনের ডানা
কালো ছায়া দেখে কেঁপে ওঠে সাধারণ
নাকি আতঙ্ক বয়ে আনে একটানা
সর্বনাশের শীলিভূত আচরণ।

একদম স্রোত থামিয়ে দিয়েছে যেই
আমার শিকড়ে পড়েছে কালোর টান
পড়েছে আকাশ কোনো সন্দেহ নেই
অস্তিত্বের পটভূমি খানখান।

এবং তখনি দুধারী জুলফিকার
ফিরে চাই নদী আরিচা ও পদ্মার।

www.nagorikpathagar.org

ফররুখ আহমদ

তারে তো পেয়েছি নায়কের মতো বিকশিত স্বপ্নতে
মহাপুরুষ আর মহাকাব্যের মিলিত বিপুল স্রোতে;
ভেতরেই তার খুদী পেয়েছিলো শাহীনের প্রিয় গান
আকাশের পরে আকাশে ওড়ার প্রাবল্য অম্লান।

যে-হাতে কাব্য বিশ্বাসী এক আলোকিত পরিণামে
এবং কবিতা যেনো বিদ্রোহী নিত্যনিগূঢ় দামে;
গভীর নিশিথ-সাধনা-সঙ্গী ডাহুকের মগ্নতা
অথবা সে এক ফুল্ল মনন, জাগরিত মানসতা।

নৈতিকতার দীপ্ত উপমা, উজ্জ্বল ধ্রুব তারা
যার গতি হতে গতি খুঁজে পেলো অগণিত গতিহারা;
বিভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে রওশন সত্তার
বেরিয়ে পড়ার মতো তিনি এক দূরগামী রাহবার।

অমর শিল্প-বিশশতকের-কবিতার সম্পদ-
অনাগত-কবি-বিস্ময় কবি ফররুখ আহমদ।

www.nagorikpathagar.org

ঈদের আকাশ

স্বপ্ন এখন ফসল ভেবে–পাথর কুড়ায়
ইচ্ছেগুলো বৈরী হাওয়ায় শেষ হয়ে যায়
ঠিক তখনই তীব্রখরা মনান্তরে
মনান্তরে মরছে নদী
নদীর সঙ্গে মূল্যবোধই
মূল্যবোধের সঙ্গে ঠিকই মনন মরে
ঠিক তখনই তীব্রখরা মনান্তরে।

নৈতিকতার সকল পাখায় লাগলো আগুন
আজ পুড়ে যায় সম্ভাবনার পুষ্প ফাগুন
এবং আগুন নিকষ–আশার সব নীলিমায়
সব ভূগোলেই ঝড়ের আভাস
ক্রুদ্ধ–ক্ষুব্ধ সর্বআকাশ
হিংস্র–পাশব বিদঘুটে এক–সব জানালায়
এবং আগুন নিকষ–আশার সব নীলিমায়।

চোখ যে দিকে : পেশীর প্রবল প্রদর্শনী
চোখ যে–দিকে : ধ্বংসপ্রবণ উলুধ্বনি
চোখ যে–দিকে : জগৎশেঠের কলোল্লাসে
হলুদ পাতার বন্যা তখন
মীরজাফরের কন্যা তখন
মানচিত্র খায় যে কেবল রাহুগ্রাসে
মানচিত্র খায় সে কেবল রাহুগ্রাসে

ঈদের আকাশ তাই–কি কাঁদে কাশ্মীরে আজ :
মানুষ এবং মানবতার কান্নার আওয়াজ
কান্নার আওয়াজ সকল দিকে, সব বিভাগে
বৃক্ষ কাঁদে, নদী কাঁদে

www.nagorikpathagar.org

নির্মমতার নবধা ফাঁদে
কাঁদতে কাঁদতে দিবস জাগে রাত্রি জাগে
কান্নার আওয়াজ সকল দিকে সব বিভাগে।

ঈদের আকাশ কাঁদছে এখন কসোভোতে
কিম্বা কোনো আরবদেশের রক্ত–স্রোতে
তবু এ–ঈদ হাতছানি দেয় অন্য ঈদের–
যে–ঈদ কেবল বিশ্বজুড়ে
গান গেয়ে যায় সুরে–সুরে
কোরান এবং মানবতার বিজয় দিনের
যে-ঈদ কেবল হাতছানি দেয় অন্য ঈদের।

www.nagorikpathagar.org

ঈদের কথকতা

ক. হয়তো বা ঈদ কোথাও এসেছে
কোথাও আসেনি ঈদ
কোনো জীবনের চারপাশে মরু
অন্য জীবনে অজস্র উদ্ভিদ

অন্য জীবনে উজ্জ্বল ফাল্গুন
অন্য জীবনে মৌমাছি গুন্ গুন্
অন্য জীবনে পাতারাও প্রজাপতি
অন্য জীবনে স্বপ্নেরও সম্মতি।

খ. কোথাও ঈদের ফলাফল কাশ্মীর
ঈদের চাঁদের নাম ধরে ডাকে
ক্ষত-বিক্ষত ঝিলামের দুই তীর
কোথাও ঈদের চাঁদ শুধু আঁকে
রক্ত আখরে
তপ্ত পাথরে
ফিলিস্তিনের তছনছ করা পৈত্রিক বস্তির
ছায়া আর ছবি
অথবা সে কোনো রেখা—রঙ স্বস্তির।

গ. হয়তো বা ঈদ শরীরে এসেছে
হৃদয়ে আসেনি ঈদ
অস্তিত্বের কোথাও সে কথা কয়
আত্মার পাখি নয়
জাগরণে কারো উঠেছে গো চাঁদ
সাথে নিয়ে দুঃসহ সংবাদ
স্বপ্নে কেটেছে সিঁদ
হয়তো বা ঈদ শরীরে এসেছে
হৃদয়ে আসেনি ঈদ।

www.nagorikpathagar.org

কারো মন জুড়ে গ্রীষ্মের দাবদাহ
ঈদের বিরহ দুই গুণ তিন গুণ
চোখের ওপরে শুধু
ঝুলে আছে হায়
পতাকার মত ছেঁড়া–খোঁড়া পাতলুন!
চরাচরে তার পোড়া– পোড়া ঘ্রাণ
শরাহত করে ব্যথাহত প্রাণ
নিঃশেষ হলো তূণ
পাখিরাও হলো খুন...

ঘ. কোনো কোনো ঈদে বস্তি কেবল
অগুন অস্বস্তি কেবল
দুলতে দুলতে কখনো সে ঈদ
রুগ্ন বক্ষে ডোবে
কখনো বা বিক্ষোভে
বেতনবিহীন বাড়ি–ঘর জুড়ে শুকনো রুটির মতো
অথবা সে কোনো শূন্য বাসন রংচটা অন্তত।

কারো ঈদ এসে থেকে গেছে জেলগেটে
কোনো ভিখারীর
ঘোলা দু'চোখের কোটরেই
মৃত্যুর মতো ঈদ এলো হেঁটে হেঁটে
না হয় সে ঈদ
আটকে তো গেছে ভূখা-নাঙ্গা এক জঠরেই।

www.nagorikpathagar.org

ঙ. অন্য সে ঈদ কৃচ্ছ্রসাধনা ছাড়া
অন্য সে ঈদ ভোগ-বিলাসের মেঘে
দিগ-দিগন্তহারা
অন্য সে ঈদ : তাকওয়া ও নদীহীন
ছিলো না যেখানে ধৈর্যের স্রোতধারা
অন্য সে ঈদ পোশাকের জৌলুস
পরিণামে শুধু অগ্নিকাণ্ড; বামহাতে আফ্‌সুস
অন্য সে ঈদ অহংকারের ষাড়
আঘাতে আঘাতে তার
ক্ষত-বিক্ষত হয় বঞ্চিতজন
অন্য সে ঈদ বাঁধতে জানে না কাটে শুধু বন্ধন।

কোথাও সে ঈদ বাণিজ্য-ভরা দিন
কেনাকাটা বিকিকিনি
তে-রে-কে-টে-ধা-ধা-ধি-ন-ধি-ন
ফ্যাশান শো আর ডানাকাটা সুন্দরী
শিরনির তশতরী
কিম্বা কেবল করমর্দন-
হরিণে-দোয়েলে-নৌকায়-দরজায়
কিম্বা কেবল-কাটানো সময় প্রতিচ্য-সিম্ফনি
বুঝি অথবা না বুঝি অবশ্য চিনি না অথবা চিনি।
কোথাও সে ঈদ 'প্যাট্রোল পাম্প, হাওয়া আর হাওয়া'
ছাড়া কিছু নয়, না না কিছু নয়
'ঈদের জন্যে ঈদ' সে কেবল তত্ত্বের বিনিময়

www.nagorikpathagar.org

চ. বস্তুত ওই চাঁদ হাসলেই
হাসে না চাঁদের দিন
ঈদ আসলেই আসে না ঈদের দিনঃ
যদি প্রতিদিন কুফুরিবাদের জমে আরো আন্ধার
জাহেলিয়াতের ঘোঁচে না সময়
চিরসূর্যের হয় নাকো জয়
শিরকের ঘোর কালো রাত থেকে
অত্যাচারীর কালো হাত থেকে
মুক্তি মেলে না আল্লাহর বান্দার
যদি প্রতিদিন খোদাদ্রোহীরা
নীড় ভাঙে পাখিদের
কালো গোখরার দল ছেড়ে দেয়
বীথিকায় বাকীদের
ফুল ফোটানোর ক্ষণ কেড়ে নেয় ফলসা ধরিত্রির
যদি প্রতিদিন অত্যাচারীরা ঘর ভাঙ্গে পৃথিবীর।

ছ. সুতরাং শুধু কোরানের দিন
আসলেই আসে ঈদ
শাওয়ালের চাঁদ হাসে, উদ্ভাসে ঈদ
না হয় সে ঈদ উপড়ানো উদ্ভিদ
না হয় সে ঈদ স্বপ্নের নামে
উল্টানো উম্মীদ।

www.nagorikpathagar.org

প্রিয়তম–র জন্য কয়েক পঙ্‌ক্তি

১.
তুমি শিক্ষক, সকল শিক্ষা তাই
তোমার নিকটে জমা
'মিয়ারে হক' তুমি
এবং সকল–
সব সৃষ্টির উত্তম শুধু তুমি
সেকথা বোঝে না অক্ষম–অক্ষমা।

তোমার পথের প্রতিধূলিকণা মেখে
অধম–পুরুষ–নারী–
হঠাৎ কখনো উত্তম–উত্তমা।

২.
চরিত্রে চাই পরিপূর্ণতা তাই
কেবলি তোমারে খুঁজিঃ
কারো মাধ্যমে নয়
কোরানেই সোজাসুজি
এবং তোমার দেখানো পদ্ধতিতে
যখন যতোটা বুঝি।

হে আমার প্রিয়তম
সকল কর্মে
আমি যেনো শুধু তোমারেই অনুসারি;
দু'টি চোখ মেলে অথবা দু'চোখ বুজি।

www.nagorikpathagar.org

৩.
আরবি জবানে পড়ি আর পড়ি
কতো যে 'সাইয়্যেদেনা'
ঝামেলা হয় না তাতে
অনুবাদ করে যেই বলি, "তুমি-
তুমিই মোদের নেতা,"
অমনি তখনি শুরু হয়ে যায় যতো,
বেদনা ও বঞ্চনা!

হে আমার প্রিয়তম
দু-টি চোখ মেলে অথবা দু-চোখ ঢেকে
তোমারি জন্যে তবু যেনো সব সই-
সব বিদ্রূপ, সব উপেক্ষা
সকল শংকা, সমস্ত যন্ত্রণা!

www.nagorikpathagar.org

হাসানের জন্য

(সরদার হাসান ইলিয়াস তানিমকে নিবেদিত)

হাসানের পরীক্ষা সামনে
বেশী করে আল্লা'র নামনে
তিনি যেন ওর বুকে বল দেন
পায় যেন এ প্লাস গোল্ডেন

হাসানের পরীক্ষা সামনে
ওর থেকে একটাই কামনে
পড়ালেখা পড়ালেখা কেবলি
ঘোরাঘুরি একদম দেবলি

হাসানের পরীক্ষা সামনে
রাত জাগা কষ্টের ঘামনে
তবে হবে এখনই প্রতিজ্ঞ
জ্ঞান-গুণে হতে বড় বিজ্ঞ

হাসানের পরীক্ষা সামনে
এখন না হয় ওর দামদে
ওর দাবী পূরণেও কানদে
মাঝে মাঝে শুনতে দে গানদে

ইসলামী গান ওর প্রিয় তো
আর প্রিয় মাছ-ভাত-গোস্ত
ইমানের নূর দুটি চোক্ষে
আল্লা'র প্রেম সারা বক্ষে

www.nagorikpathagar.org

কফি

কখনো কখনো প্রাণের ভেতর থেকে
কফির আকাঙ্ক্ষা
গড়িয়ে পড়ে মস্তিষ্কের কোষে কোষে
দুলে ওঠে মগজের চাকায় চাকায়
অর্থ্যাৎ
সাত– আটজন পেয়ালার মধ্যে
লাফিয়ে পড়তে পড়তে বিহঙ্গ যায়।
এবং কলেজ গেটের আশে পাশে
অথবা হানিফ স্ন্যাক্সের সন্নিহিত জীবন হয়ে ওঠে
আকণ্ঠ জীবন
যেমন যান্ত্রিকতার ছোবল থেকে
বেরিয়ে পড়ে কিছু কবিতা
কিম্বা
কবি জাকির আবু জাফর;
বেঁচে যায় কিছু ছন্দ
কিম্বা
কবি আফসার নিজাম;
হেসে ওঠে কিছু তাল- লয়- মান
কিম্বা
শিল্পী আবদুল লতিফ;
পাখা মেলে কিছু হিসেব- নিকেশ
কিম্বা
ওয়াসিকুল আজাদ;
গল্প করে কিম্বা ঘটমান অতীত
কিম্বা
গায়ক আবদুল মান্নানের বিরহ গীতিকা;
তাছাড়া পর্দারা দুলে ওঠার
পরপরই হৃদয়ের গলা ধরাধরি করে
বের হয়ে আসে কফি ঘরের
অলৌকিক মিমাংসা ও মধ্যস্থতার
মধুর পরিণাম।

www.nagorikpathagar.org

চতুর্দিকেই

চতুর্দিকেই অবিশ্বাসের কালো
চতুর্দিকেই অহংকারের দাপট
চতুর্দিকেই কোলটানা পটভূমি
ঔদার্যের নদীতে পড়েছে ভাটা
অসতেরা ঘোরে ক্ষমতার চারপাশে
দেশের বারোটা বাজানোর মৌসুম
অযুত চক্র ঘুরছে চক্রাকারে
প্রেমের আসরে কালোসাপ তোলে ফণা
নীতি-অনীতির ব্যবধান কমে গেলো
অধিকাংশের মাথায় অর্থকড়ি
বুকে দ্বন্দ্বের কূটকৌশল ভরা
গতরে শুভ্র বসনের ওড়াউড়ি
বকেরা মেনেছে বহু আগে পরাভব
চতুর্দিকেই হিংসার দাবানল
চতুর্দিকেই কবর দেবার সভা
ভাঙনের দিকে মহাজনদের
মহাজনদের ঝোঁক
গড়ার মানুষ ক্রমাগত কমে যায়
চতুর্দিকেই পক্ষপাতের ঘোর
সম্বল শুধু আল্লা'র নির্দেশ।

www.nagorikpathagar.org

দলের মানুষ

দলের মানুষ মরেছে তাই গরম সমাবেশ
মিছিল গরম, মিটিং গরম, গরম সারাদেশ।

নেতার মুখে আগুন ঝরে
প্রতিবাদের তুমুল ঝড়ে
মুহুর্মুহু দেন ঘোষণাঃ দেখে নেবেন শেষ!
দলের মানুষ মরেছে তাই তপ্ত পরিবেশ।

পত্রিকাতে ডাইনে বামে
বজ্র খবর আট কলামে
পড়তে গেলে যায় দাঁড়িয়ে লম্বা মাথার কেশ!
দলের মানুষ মরেছে তাই ক্ষোভ যে অনিশেষ!

পোস্টারে যায় দেয়াল ছেয়ে
মিছিল আসে রাস্তা বেয়ে
সঙ্গে আসে উড়ে উড়ে লিফলেটে নির্দেশ!
দলের মানুষ মরেছে তাই হাজারো জিজ্ঞেস!

হঠাৎ কোথাও পটকা ফোটে;
বিকট ভীষণ আওয়াজ ওঠে।
কান থেকে কান প্রবেশ করে তরতাজা সন্দেশ–
দলের মানুষ মরেছে তাই যুদ্ধই শেষমেশ।

কিন্তু যখন বনি আদম
পথের ওপর শেষ করে দম
বইতে বইতে সারা জীবন দুঃখ কষ্ট ক্লেশ!
ওদের পক্ষে কোন সে দলের থাকছে ব্যথার রেশ?

www.nagorikpathagar.org

ছুরির নীচে পৃষ্ট হয়ে
ট্রাকের তলায় পিষ্ট হয়ে
মরছে যারা তাদের তরে বিবেকের উন্মেষ
কোন্ দলের হয়? ক'জনের রয় মর্মজ্বালার লেশ?

শোক প্রস্তাব ওদের তরে
সাংসদেরা কেউ কি করে
কোন্ নেতার হয় ওদের তরে বিবেকের উন্মেষ?
ওরা দলের মানুষ হলে, জটিল হতো কেস!

যৌতুকের ঐ খাড়ার ঘায়
কতো মেয়ে প্রাণ হারায়
কোন দলের হয়, বন্ধু ডাকার বিন্দুমাত্র এশ
দলের কাজে মরলে ওরা দামটা পেতো বেশ!

www.nagorikpathagar.org

ইয়ে

ইয়ে,
মানে–সাঈদ ভাইয়ের বিয়ে।
অবাক করা ঘটনা,
নাকি স্রেফ রটনা,
বুঝতে হলে বুঝতে হবে,
সিলেট শহর গিয়ে।

হচ্ছে কি বুঝিনা!
ভাবী হবেন রুবিনা
পড়েন যিনি সি.এ;
সাংবাদিকের ঘর গোছাবেন
ক্যালকুলেটর দিয়ে?
নাকি রান্না করার কাজ সারিবেন
কম্পিউটার নিয়ে?

ওসব তাঁদের ব্যাপার!
সিলেট গেলে,
যত্ন পেলে,
নেই অভিযোগ এই
আমি এক ক্ষ্যাপার!

ইয়ে,
মানে–সাঈদ ভাইয়ের বিয়ে
অবাক করা ঘটনা,
নাকি স্রেফ রটনা,
বুঝতে হলে বুঝতে হবে,
সিলেট শহর গিয়ে।

www.nagorikpathagar.org

সেরা মানুষের জীবন

[রাসূল (সা.) কে নিবেদিত]

বেদনায় তুমি আরো বেগবান হয়ে
এগিয়ে গিয়েছো বিজয়ের দিকে জানি
পাথারের মতো সমস্ত কিছু সয়ে
গেছ, তবু নাওনি হতাশা মানি।

কতো গালি গেছে তোমার ওপরে বয়ে
কতো বিদ্রুপ তোমাকে হেনেছে তীর;
কভু তবু তুমি আদৌ যাওনি ক্ষয়ে
বরং ভেঙেছো আঁধারের জিন্‌জির্‌।

অশেষ জুলুম-মৃত্যুর সংশয়ে
চেয়েছে তোমাকে
করে দিতে ঘরছাড়া;
তোমাকে চেয়েছে পরাজয়ে পরাজয়ে
সবশেষ করে
করে দিতে সবহারা।

তারপরো তুমি চরম ধৈর্য ধরে–
সেরা মানুষের জীবন গিয়েছো গড়ে।

আজো তাই তুমি
সিরাজাম মুনীরা
মরুভাস্কর– অশেষ আলোর
অথৈ বন্যাধারা।

www.nagorikpathagar.org

তুমি

একটি নমনীয় যন্ত্রণা অথবা
একটি কোমল বিরহের নাম তুমি
না–
বরং একটি সর্বভুক ভালোবাসার অক্টোপাস
বিশাল সমুদ্রগর্ভে আমি এখন
কেমন যেনো সসীম হয়ে আছি ॥

সব রকমের শব্দ এবং সঙ্গীত
আজকে কেবল নতজানু তোমার শব্দমালার কাছে
না হয় নরম আহ্বানের কাছে।
একবার বাংলাদেশের প্রান্তদেশে
একটি বদ্বীপ দেখে
সৌন্দর্যবোধ আমার মধ্যে
প্রচণ্ড ক্ষুধার মতো মনে হয়েছিলো
এখন তুমি আমার নাফ নদীর ক্ষুধার মতো
যেমন টেকনাফে সুনীল সীমাহীনতা ॥

আমি যখন ছাত্র থাকি
কেবল তোমার দৃষ্টিগুলোই তখন পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা
অক্ষরের পর অক্ষর
হাত যখন একটির পর একটি বই খোঁজে;
তখন তোমার হাত বদলের শব্দ পেয়ে থমকে দাঁড়াই
(শুধু তোমার সুনীল চিঠিগুলোই
হাইলের মতো আমার পেছনে আছে)

www.nagorikpathagar.org

আমি এবং তুমি
এই ধরনের যুক্ত অক্ষর আছে বলেই
ধীরে ধীরে জন্ম নিচ্ছে একটি নিরন্তর ইতিহাস
একটি চাঁদ আর একটি সূর্য যেমন
প্রতিদিন সর্বোত্তম উপমা
আগে খুব বেশি বুক কাঁপতো না
যেমন আজকাল কাঁপে
বুকের এই টিপটিপ শব্দের মধ্যে
কেবল তোমারই অরন্তুদ উচ্চারণ নাকি
এ এক ধরনের শঙ্কিত ভালোবাসা
না একাকীত্বের সময় না কাটার
ধারালো চাবুক ॥

www.nagorikpathagar.org

সজাগ থাকার রাত্রিদিন

এক.

আজ জনতার জেগে থাকবার সজাগ থাকার রাত্রিদিন
মুক্ত-স্বাধীন-স্বদেশ ভূমি যে ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন
সচেতনতার অনেক অনেক দরকার বড় তাই এখন
সব বিভেদের শিকড় কাটার মূল উঠানোর এলো লগন।

বাঁচাতেই হবে শাহ মাখদুম শাহ জালালের পুণ্যভূমি
অশেষ গাজী ও শহীদ যেখানে অনন্তকাল রয়েছে ঘুমি
সব বর্গীর হাত থেকে আজ বাঁচাতেই হবে দেশমাতারে
ঐক্যবদ্ধ হতেই হবে যে দাঁড়াতেই হবে এককাতারে।

যেথা আগুন মসজিদ আর ঈমানের চির দৃঢ় বাঁধন
যেথা জীবনের প্রতি জীবনের সুন্দরতম উঁচু আসন
যেথা মানুষের জাত-পাত নেই, ভেদাভেদ নেই- এক সদাই
সকলে মিলেই বাংলাদেশী ও বাংলাদেশের লোক সবাই।

অনন্তকাল যেখানে তুমুল লড়াই করেছে বাংলাদেশ
যুদ্ধ করেছে অকাতরে ঢেলে বুকের রক্তবিন্দু শেষ
আজকে সেখানে নজর পড়েছে আবার ঘৃণ্য হায়নাদের
অশুভ শক্তি ধেয়ে ধেয়ে আসে-দানবীয় খুন গায় যাদের।

আজ জনতার জেগে থাকবার সজাগ থাকার রাত্রিদিন
মুক্ত-স্বাধীন-স্বদেশ ভূমি যে ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন
সচেতনতার অনেক অনেক দরকার বড় তাই এখন
সব বিভেদের শিকড় কাটার মূল উঠানোর এলো লগন।

www.nagorikpathagar.org

দুই.

যখন এ-দেশ ক্রমাগতভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যায়
সমৃদ্ধির সকল আকাশ ছোঁয়ার জন্য হাত বাড়ায়
বিকশিত হয় গণতন্ত্রের সকল জরুরি প্রতিষ্ঠান
অর্থনীতির সকল শাখাই উজ্জীবনের গাইছে গান-

তখন এখানে নানা ছলনার আশ্রয়ে নামে শত্রু ঘোর
একযোগে কাটে ফসলের ঘরে অসংখ্য সিঁদ-সিঁদেল চোর
কুমীরের মতো মায়াকান্নার মাধ্যমে আসে গুপ্তচর
লক্ষ্য তাদের একটাই যেনো হানাহানি করি পরস্পর।

হানাহানি করে ধূমায়িত করি চলার পথের সকল দিক
যেনো ভুলে যাই আরো ভুলে যাই সকল কাজের দিন তারিখ
মূল জায়গার বদলে দৃষ্টি রাখি যেন ঠিক অন্যখানে
পরগাছা হতে মুক্তিও খুঁজি, গোলামীর খুঁজি অন্যমানে।

শকুনেরা যতো এই সময়েই মাটির ওপরে ফেলেছে ছায়া
আগ্রাসনের পাঁয়তারা করে শাণিয়ে শাণিয়ে রুদ্রকায়া
এক আল্লায় বিশ্বাসীদের কোন্ দেশ অভিযুক্ত নয়
বাংলাদেশের ভবিষ্যত তো তাই আশংকামুক্ত নয়।

এখন সময় সাবধানতার- সতর্কতার সমূহ ক্ষণ
এখন সময় লর্ড ক্লাইভদের সকল পর্দা উন্মোচন
করার এবং স্বদেশপ্রেমের অসীম শক্তি জাগিয়ে তোলা
দুঃস্বপ্নের সকল রজনী প্রবল ক্ষুব্ধ ঘৃণায় ভোলা।

আজ জনতার জেগে থাকবার সজাগ থাকার রাত্রিদিন
মুক্ত-স্বাধীন-স্বদেশ ভূমি যে ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন
সচেতনতার অনেক অনেক দরকার বড় তাই এখন
সব বিভেদের শিকড় কাটার মূল উঠানোর এলো লগন।

www.nagorikpathagar.org

তিন.

কোরান বিরোধী সে-হোক যারাই চায় না আড়ালে গণশাসন
গণতন্ত্রের ধারায় তাহলে ন্যায়ের জয়ের হবে কারণ
কেননা তখন স্বাভাবিকভাবে লাভবান হবে মুসলমান
ক্ষমতায় যাবে মানবিকতার মুক্তি সনদ আল কোরান।

সারাবিশ্বের মুসলমানের দেশগুলো ওই সাক্ষ্য বয়
মুক্ত-স্বাধীন-সার্বভৌম এ-দেশ তো তার বাইরে নয়
তাই যাবতীয় কূট-কৌশল ধরার আগেই ধরতে হবে
জেনে বুঝে সব ঝুট-ঝামেলার মূল সমাধান করতে হবে।

বাংলাদেশের ভাবনা শুধুই ভাবলে এখন চলছে না যে
সারা পৃথিবীর জটিলতা নিয়ে না-ভাবলে ফল ফলছে না যে
যতো তাড়াতাড়ি পদ্মা-মেঘনা পশ্চিমাদের ভাবিয়ে দিলো
তার চেয়ে আরো তড়িৎ গতিতে সামনে চলার কথাই ছিলো।

তবু সেই সব চেতনায় আজ সর্বক্ষেত্রে বাড়াও গতি
ঝেড়ে ফেলে দাও জীবনের যতো আলস্য-ভীরু-অসম্মতি
যদি তা না হয়- পিছিয়ে পড়ার বেদনা হৃদয়ে পোহাতে হবে
শুরু থেকে ফের সামনে চলার সকল রসদ জোগাতে হবে।

স্বজাতির দিন ফিরাতে চায় না সত্যি যে-জাতি একেবারেই
সে-জাতি ডুববে আঁধারে আদৌ নিঃসন্দেহে বারেবারেই
তাই আজ যদি সর্ববিজয় অর্জনে দৃঢ় পাও বাড়াই
সে-পায়ের গতি ঠেকানোর মতো কোনো শক্তির সাধ্য নাই।

আজ জনতার জেগে থাকবার সজাগ থাকার রাত্রিদিন
মুক্ত-স্বাধীন-স্বদেশ ভূমি যে ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন
সচেতনতার অনেক অনেক দরকার বড় তাই এখন
সব বিভেদের শিকড় কাটার মূল উঠানোর এলো লগন।

www.nagorikpathagar.org

চার.

বিজয়ের গাঢ় সম্ভাবনার আলো জ্বলতেই ইনসাফের
এই দেশে ফের নিত্য জয়ের আভাস পেয়েই ইসলামের
ক্ষেপে গেছে যারা তারাই মূলত চায় সারাদেশে অস্থিরতা
অশান্তি চায়, দুর্গতি চায়, চায় যে চরম অরাজকতা।

পরাশক্তির হস্তক্ষেপ বেড়েই চলেছে ক্রমাগত
খাল-কেটে-আনা কুমীরেরা দিন-অনু-দিন বাড়ছে ততো
চলছে দেদার ওদের বেনিয়া কর্মকাণ্ড প্রকাশ্যে যে
দেশীয় দালাল আগের চেয়েও ওদের সংগে সহাস্যে যে।

ফিলিস্তিনের আজকে যে-দশা সে-দশাই চায় এই দেশের
মানবাধিকার, মানবিকতার দুশমন যতো বক-বেশের
মৃত্তিকা-নদী-প্রকৃতির সব শত্রুদের আজ দিন-রাতের
ভাবনা কেবল দেশ-প্রেম আর ঈমানের ভিত উৎখাতের।

বোঝাপড়া করা সময়ের সাথে ঝুঁকিও এসেছে আগের মতো
সাহসের মতো ইতিহাস তাই গড়লো প্রাচীর সমুন্নত
আলোর সাক্ষী হবার প্রহরে তাই অপলক যাত্রী এলো
দেশজুড়ে তাই প্রহরার দিন, সজাগ থাকার রাত্রী এলো।

ঐক্যের দিন ডাকে সংহত ডাকে ঈমানের অঙ্গীকার
ডাকে জনতার অনাগত দিন- চির বিপ্লবী ভঙ্গীমার
উপলব্ধির বিকল্প নেই, নেই বিকল্প উদ্যোগের
এবং যে-ভাবে শেষ হয়ে যায় জাতিসত্তার দুর্ভোগের।

আজ জনতার জেগে থাকবার সজাগ থাকার রাত্রিদিন
মুক্ত-স্বাধীন-স্বদেশ ভূমি যে ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন
সচেতনতার অনেক অনেক দরকার বড় তাই এখন
সব বিভেদের শিকড় কাটার মূল উঠানোর এলো লগন।

www.nagorikpathagar.org

লাশখেকো

বাংলাদেশের সর্বনাশের সুযোগ খোঁজে ভারত
লাশখেকো এক পাখির মতো চেষ্টা করে তাবৎ।

নির্বাচনের বিষয় নিয়ে যখন বাংলাদেশ
ব্যস্ত ভীষণ ঠিক তখনই সীমান্তে নির্দেশ
ঐ ভারতের– 'চালাও গুলি, জ্বালিয়ে করো শেষ–
সে-দেশ, যে-দেশ জুড়ে নিবিড় সবুজ পরিবেশ;
মাথা উঁচু করছে যে-দেশ, স্বাধীন থাকতে চায়–
কুড়াল মারো সেই দেশেরই শক্ত সবল পায়।'

মনমোহনরা ভেবেছো কি? ভেবেছো কি আজ?
অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে সাজিয়ে রণসাজ
দেশটা আমার করবে দখল দাপট দেখায়ে?
মাছ না-পেয়ে ছিপে দাঁতাল কামড় হাঁকায়ে?

রামমোহনরা নাও শুনে নাও, সে গুড়ে আজ বালি–
নির্বাচনের পক্ষে সবাই দিচ্ছে যে হাত তালি।
তোমরা যাদের ভোদাই ভাবো, মানুষ ভাবো না!
তারা এখন অনেক ত্যাদোড়, অনেক সেয়ানা!
ইট্‌টা মারলে পাটকেল খাবে, চড় মারলে থাপ্পড়;
শ্মশান যদি দেখাও তবে, দেখবে কিন্তু গোর।

www.nagorikpathagar.org

বগুড়ার সীমাহীন মানুষ

কিছু কিছু সীমাহীন মানুষ
এবং কিছু কিছু মানুষের রক্তের মধ্যে
ইতিহাস কথা কয়
অথবা কিছু কিছু মানুষের মধ্যে
জেগে ওঠে ভূগোল
বস্তুত কিছু কিছু সীমাহীন মানুষ
ভূগোলের মতো ভার বয়
ভার বয় নীলিমার ভেতরের অন্য এক নীলিমার
ভার বয় অন্যান্য অমিমাংসিত গ্রহাবলির।

এবং এইভাবে একটি মানুষের গভীর থেকে
বেরিয়ে আসে অসংখ্য মানুষ
অর্থাৎ মানুষের সাহস
অথবা সাহসের মতো অগ্নিকাণ্ড
অগ্নিকাণ্ডের মতো দাউ দাউ কোনো কর্মসূচি।

দাউ দাউ কর্মসূচি মানেই চিরকালের শহীদ আবদুল মালেক
অথবা আবদুল মালেকের অভিজ্ঞান
ঠিক যেখানে
অপরাজিত থেকে যায় পৃথিবী কিম্বা বগুড়ার অবিসংবাদিত সন্তানেরা।

অর্থাৎ এখন পৃথিবী অথবা সারাবাংলার সীমাহীন মানুষ মানেই
শহীদ আবদুল মালেক এবং সারাবাংলা অথবা
বগুড়ার সীমাহীন মানুষ মানেই
আনিস পাশা
আজিজুল হক কলেজের অতলান্ত এক শহীদ।

www.nagorikpathagar.org

চিকিৎসা

অনেক রক্তের জোয়ার ভাটার পর আমি
ডাক্তার মুকিতের ডাঙায় উঠে দাঁড়ালাম
অসহায়
বিব্রত
বিধ্বস্ত
তারপর মুঠো মুঠো নিরাময়ের মধ্যে
মুখ গুঁজে শুয়ে থাকলো
বোবা কান্নার মতো
তরজমাহীন ব্যথা
বিস্তারিত বেদনার খরগোশ।

অর্থাৎ চিকিৎসার গোটা অর্থই এখন দাঁড়িয়েছে
একবোঝা ইনজেকশন, অপারেশনের তোড়জোড়
ক্ষমাহীন পর্যবেক্ষণ এবং মাঝে মাঝে
কাটা-ছেঁড়ার মতো তৎপরতা
হায়! আমার কোনো ডানা নেই
যেনো জন্ম হয়েছিলো বিছানায় পড়ে পড়ে
কালান্তরের কঙ্কাল গোনার জন্য ॥

মাবুদ! চিকিৎসার সমুদয় দায়িত্ব তুমিই নাও
আমি আর পারছি না॥

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

ধৈর্যের গান

[অগ্রন্থিত]

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

ধৈর্যের গান

www.nagorikpathagar.org

প্রসঙ্গ কথা

'ধৈর্যের গান' গীতিকবিতার পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া যায় কবি আহমদ বাসিরের নিকট। পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে কবি আহমদ বাসির জানান, ২০০০ ও ২০০১ সাল জুড়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, স্মারক-সংকলন ও ক্যাসেট থেকে কবি মতিউর রহমান মল্লিকের গান, কবিতা ও ছড়াগুলো উদ্ধারের তৎপরতা চালানো হয়। আহমদ বাসিরের সঙ্গে এই তৎপরতায় যুক্ত ছিলেন কবি আফসার নিজাম, কবি রেদওয়ানুল হক। সেই সময় তাদের পক্ষে কবির 'অনবরত বৃক্ষের গান' কাব্যগ্রন্থ এবং 'রঙিন মেঘের পালকি' কিশোরকাব্য প্রকাশ করা সম্ভব হলেও গানের বই প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

এই পাণ্ডুলিপির শেষ গান দু'টি নতুন সংগ্রহ থেকে সংযুক্ত করা হলো। পাণ্ডুলিপিটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন মোমিন উদ্দীন খালেদ।

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

হে করুণার আধার খোদা/ ৬১
আমিতো আমার চেয়ে তোমাকে/ ৬২
যার কাছে প্রিয় বেশী/ ৬৩
তোমাকে স্মরণ করতে দেখেছি/ ৬৪
শহীদ হবার ভাগ্য সবার/ ৬৬
এক শহীদের রক্ত হতে/ ৬৭
পূর্ণ মানুষ হতে হলে/ ৬৮
যার যা খুশি/ ৬৯
ঈদের দিনের গান/ ৭০
এই দু'টি চোখ দিয়েছো বলে/ ৭২
রসূল আমার পথ যে দেখান/ ৭৩
পৃথিবীতে যতো পড়ে শহীদের খুন/ ৭৪
আল্লাহ যদি বিজয়ই দেন/ ৭৫
মানুষের গান/ ৭৬
আনুগত্য/ ৭৭
যখনি গভীর হয় রাতের আঁধার/ ৭৮
ফুলের সুবাস/ ৭৯
আমার গোনাহ অথৈ তবু/ ৮০
হতাশার কথা তুমি বলো না/ ৮১
আমার দেশের তরে/ ৮২
কাজের মানুষ/ ৮৪
ধৈর্যের গান/ ৮৫
আমাদেরই নাফরমানি/ ৮৬
আমরা গান লিখি/ ৮৮
খানজাহানের পুণ্যভূমি/ ৮৯

www.nagorikpathagar.org

আবুল কাশেম পাঠান/ ৯০
এসো না আজ সবাই মিলে ঐক্য গড়ি/ ৯১
পাষাণ পাষাণ মন পাথর পাথর জন / ৯২
কিশোর কচি শীষ মোহাম্মদ/ ৯৩
চোখ জুড়ানো গাছের সারি/ ৯৪
কিছু কিছু/ ৯৬
শীত সকালেও শীত রাত্রেও/ ৯৭
শীত যেনো চাবুক আজ/ ৯৮
আয় শীতে যাই গাঁয়/ ৯৯
এমন গজব কেউ কখনো/ ১০০
পাপ ছাড়ে না/ ১০১
কষ্ট করো/ ১০২
একদিন তোমার কিছুই রবে না/ ১০৩

www.nagorikpathagar.org

হে করুণার আধার খোদা

হে করুণার আধার খোদা
আমায় তুমি গভীরভাবে
তোমায় আরো জানার সুযোগ দাও
তোমার কোরআন তোমার রাসূল
আরও আরও সঠিকভাবে
মানার সুযোগ দাও।।

যার ওপরে রহম করো তুমি
সাত সাগরে মেশে যে তার সকল মরুভূমি
তেমনি করে স্রোত বিহীন
জীবনে মোর পুণ্যের জোয়ার
আনার সুযোগ দাও।।

শহীদি যে অমোঘ পাওয়া
জীবন দিয়ে অর্থ দিয়ে
জেহাদ করে পায়গো মুজাহিদীন
সেই পথে হে করো গো বিলীন
আমায় আল্লাহ্ করো গো বিলীন।

পথের কাঙ্গাল এই আমাকে প্রভু
মোস্তাকিমের পথ দেখাও হে দুর্বিপাকে তবু
মুছতে আমার সকল আঁধার
তোমার আলোর তুলি ওগো
টানার সুযোগ দাও।।

www.nagorikpathagar.org

আমিতো আমার চেয়ে তোমাকে

আমিতো আমার চেয়ে তোমাকে
ভালোবেসে বেসে সারা হতে চাই
পৃথিবীর সবকিছু হারালেও
তোমাকে কভুও যেনো না হারাই।।

আর কারো প্রেমে যেনো ডুবে না মরি
যায় যদি ভেঙে যাক জীবনও তরী
বিপদের সব ঝুঁকি নিয়ে
তোমার আলোয় আমি
পুড়ে হব ছাই।।

তোমাকে পেলেই পাবে আল্লা'তালা
এইভাবে গাঁথা হবে জয়েরও মালা

আর কোনো দ্বিধা যেনো না থাকে মনে
আল কোরআনে যে তুমি আছ গোপনে।
জীবন্ত এই আজো হে প্রিয়
তাই শুধু তোমারই
ভালোবাসা চাই।।

www.nagorikpathagar.org

যার কাছে প্রিয় বেশী

যার কাছে প্রিয় বেশী জীবন–জগৎ
কি করে সে আল্লার প্রেমিক হবে
কি করে সে চিরদিন
হেসে হেসে অমলিন
দ্বীন কায়েমের কাজে যুক্ত রবে।।

লালসার কাছে যার লেখা দাসখত
ইচ্ছের কাছে যার বন্দীদশা
অন্তর জুড়ে যার শুধু সংশয়
হোক না সে যতোবড় প্রতিথযশা
মিথ্যার আঁধিয়ার
তবু তার চারিধার
তার মত হতভাগা কে আর ভবে।।

অন্ধ কখনো আলো দেখে না
দেখে না সে সামনে ও পিছনে
বধির বোঝে না কোনো কথা যে
শব্দের সুর ও ধ্বনি জীবনে

আলেয়ারে আলো যার ভাবাই স্বভাব
কি করে সে বলো দেখি চিনবে আলো
বিবেকের আঘাতে যে জাগে না আদৌ
কি করে সে আপনার বুঝবে ভালো
কি করে সে সত্যের
সত্যের পক্ষের
সবচেয়ে উজ্জ্বল কথাটি কবে।।

www.nagorikpathagar.org

তোমাকে স্মরণ করতে দেখেছি

তোমাকে স্মরণ করতে দেখেছি
পোশাকে পরিচ্ছদে
সভা ও সম্মেলনে
ভাষণে সম্ভাষণে
মিছিলে আন্দোলনে
কথা আর প্রণোদনে
সাজানো গোছানো
জসনে জুলুসে
জমকালো জনপদে।

তোমাকে স্মরণ করতে দেখেছি
নানা রঙ পোস্টারে
ব্যানার এবং লিফলেটে
দুধ সাদা অফসেটে
দেয়ালের মাথা পেটে
ভেতরে বাইরে গেটে
মজনুর মতো তোমার প্রেমে
লুফে নিয়ে দেশটারে।

তোমাকে স্মরণ করতে দেখেছি
মাদরাসা মক্তবে
ভার্সিটি স্কুলে
শহরে নগর মূলে
মাঠে বাটে নদী কূলে
সরাসরি সুর তুলে
আবেগে জড়ানো দোদুল গন্ধ
ভক্তি ও বিক্ষোভে।

www.nagorikpathagar.org

তোমাকে স্মরণ-করতে দেখেছি
বাণী ও বিবৃতিতে
ধারে এবং অনেক দূরে
নানা রঙে নানা সুরে।.

বিশেষও সংখ্যা জুড়ে
শত্রু ও বন্ধুরে
রঙে রঙে আঁকা বহু মুদ্রণ
পর্বে ও কিস্তিতে।

তোমাকে স্মরণ করতে দেখি না
কেবল প্রতিটি কাজে
প্রতি ভাবনায় প্রতি চিন্তায়
প্রতি চেতনার মাঝে।

www.nagorikpathagar.org

শহীদ হবার ভাগ্য

শহীদ হবার ভাগ্য সবার
হয় নারে ভাই হয় নারে
জীবন দেয়ার সময় কালে
সব হারানোর শোক কপালে
সয় না সবার সয় নারে।।

মানুষের মুক্তির সংগ্রামে চিরদিন
অকাতর দিয়ে যায় কলিজার সব ঋণ
সকল কিছু ত্যাগ করে সে
চায় না কিছু বিনিময়ে
চায় না কিছু চায়নারে।।

ঈমানের সম্বল আছে যার বহুগুণ
বুকে থাকে কোরআনের কুসুমিত ফালগুন
খোদার ডাকে সেইতো কেবল
দুই নয়নে নামিয়ে বাদল
ধরে শাহাদাতের বায়নারে।।

www.nagorikpathagar.org

এক শহীদের রক্ত হতে

এক শহীদের রক্ত হতে
ইতিহাসের শিক্ষা মতে
অসংখ্য বীর জন্ম নেবে জানি
এইভাবে যেই কোন একদিন
আনবে বিজয়-তুলনা বিহীন
বুকের রক্ত আর চোখের পানি।।

কত মানুষ আসে যায়রে
কত মানুষ মরে
ক'জন বলো অশ্রু ঝরায়
তাদের স্মরণ করে।

কিন্তু জীবন বিলালো যে
দ্বীন কায়েমে চিরতরে
তারেই ভালোবাসে
তাদের পরানখানি।।

শহীদেরা সত্যের সাক্ষ্য
সত্যের অমর পথ আঁকিয়ে তারা
চিরসত্য চিনতে তারা
জনগণের অন্তরে দেয় নাড়া।

খোদার রাহে যে শহীদ হয়
জীবন বিলায় সে
তারে চির কবরবাসী
মৃত বলে না যে।

সে যে চিরকালের জীবন
জয় করেছে সকল মরণ
পেয়ে খোদার
অশেষ মেহেরবানী।।

www.nagorikpathagar.org

পূর্ণ মানুষ হতে হলে

পূর্ণ মানুষ হতে হলে
আল-কোরানের পথে চলো
মানবতার শ্রেষ্ঠ ফসল
আর রাসূলের মতে চলো।।

এই পথে ভাই চলে যারা
সবার সেরা হয় যে তারা;
তাদের আলোয় আঁধার ধরা
করে শুধু ঝলোমলো।।

আল-কোরানের পরশ পেলে
অসীম শক্তি সাহস মেলে;
পার হওয়া যায় সাত সাগর আর
তের নদী টলোমলো।।

www.nagorikpathagar.org

যার যা খুশি

যার যা খুশি সে তাই করুক
সকাল–সন্ধ্যা–সাঁঝে
সারাটাক্ষণ লেগে রবো
আমি দ্বীনের কাজে।।

দু-দিনের এই দুনিয়া ভাই
এখন আছি তখন তো নাই
তাইতো সময় যতোটা পাই
কাটাতে চাই পুণ্য মাঝে।।

আমার হিসেব শেষ অবধি
আমার দিতেই হবে,
আমার বোঝা কেউ নেবে না
আমার নিতেই হবে।

থাকতে সময় তাইতো আমি
ব্যস্ত রবো দিবস যামি
আখেরাতের তুলতে ফসল
মোটেই দেরি করবো না যে।।

www.nagorikpathagar.org

ঈদের দিনের গান

পৃথিবীর মাঝে নিজেকে এবার
আকাশের মত ছড়িয়ে দাও;
মানুষের কাছে, পৃথিবীর কাছে
প্রকৃতির মত গান শোনাও–
আজকে ঈদের দিন
আজকে খুশির দিন।।

নিজের গণ্ডি পেরিয়ে এসো গো আজ
'আমরা মানুষ' সবাই তোলো আওয়াজ
ভেদাভেদ ভুলে,
হাতে-হাত তুলে,
একে-অপরের পাশে দাঁড়াও–
আজকে ঈদের দিন
মহামুক্তির দিন।।

সিয়াম সাধনা, কিয়াম সাধনা
সব অন্যায় থেকে বাঁচাবার জন্য;
সেই সাধনার পটভূমিকায়
কোরানের জ্ঞান সবচেয়ে বড় পণ্য।

আল কোরআনের আলো নিয়ে তুমি তাই
বলো "ভাইয়ে-ভাইয়ে কোনো শত্রুতা নাই"।
আজ থেকে হেসে
কোলাকুলি শেষে
চির ঐক্যের কোরাস গাও–
আজকে ঈদের দিন
মহামিলনের দিন।।

www.nagorikpathagar.org

জঠর জ্বালার যন্ত্রণা তুমি
সারা রমজানে বুঝতে পেরেছো জানি,
কারো ইফতার করানোর মাঝে
কেনো যে পুণ্য তাওতো বুঝেছো মানি।

তাই দারিদ্র পুরোপুরি বিমোচনে
মনোযোগ দাও দ্বীনের আন্দোলনে;
জাকাতের টাকা,
নিয়ে প্রিয় সখা,
গরিবের ঘরে পৌঁছে যাও–
আজকে ঈদের দিন
কাছে টানবার দিন।।

এক সাথে তুমি তারাবী পড়েছো
খোদাকে ডেকেছো গায়ে-গায়ে মিলে-মিশে;
ঈদের নামাজও পড়েছো জামাতে
সকল দ্বন্দ্ব দুই পায়ে দলে-পিষে।

ঐক্যবদ্ধভাবে তাই আজ থেকে
ঈদের চেতনা সকল বিভাগে মেখে;
জুলুমের দিন,
করিতে বিলীন
জেহাদ করার শপথ নাও–
আজকে ঈদের দিন
শপথ নেবার দিন।।

www.nagorikpathagar.org

এই দু'টি চোখ দিয়েছো বলে

এই দু'টি চোখ দিয়েছো বলে
দেখি যে কতোই অপরূপ
নয়নাভিরাম ক্ষেত খামারে
জুড়াই জ্বালা বিধূর অধুপ।।

ঐ নিসর্গের বাঁকে বাঁকে
মন যে আমার পড়ে থাকে
তোমার কারুকাজেরও মেলায়
আনন্দে মোর ভরে যে বুক।।

তোমার দেয়া চোখের শোকর
জানাবো তার ভাষা কই?
যতই ভাবি ততোই যেনো
পলকহারা চেয়ে রই।

তোমার সৃষ্টি ওগো রহিম
দিগ-দিগন্তে অশেষ অসীম
ফুল-ফসলের অতুল শোভায়
বাকহারা হই-রই যে চুপ।।

www.nagorikpathagar.org

রসূল আমার পথ যে দেখান

রসূল আমার পথ যে দেখান–
দয়াময়ের পথ
তাঁর যারা হয় অনুসারী–
পায় তারা নাজাত।।

হেদায়েতের দিকে ডাকেন তিনি কঠোর শ্রমে;
সবার ভাগ্যের দরজা খোলে তাঁর অনুসরণে।
তাঁর আদর্শের প্রতীক সে-পায়
অশেষ নেয়ামত।।

কঠিন বিপদ–আপদ যখন করে পেরেশান;
তাঁরই কাছে যায় যে পাওয়া সহজ সমাধান।

ভ্রান্ত-উম্মতের লাগি তাঁর বড়ই কষ্ট প্রাণে
চান যে তিনি, চলুক তারা, আসল লক্ষ্য পানে;
পাক তারা সব সত্য–সরল
সঠিক হেদায়াত।।

['রসূল (সঃ) কবি' হাস্‌সান বিন সাবিত (রা.)-র একটি কবিতার ভাব অবলম্বনে।]

www.nagorikpathagar.org

পৃথিবীতে যতো পড়ে শহীদের খুন

পৃথিবীতে যতো পড়ে শহীদের খুন–
ছাড়িয়ে ছড়িয়ে যায়
জানা থেকে অজানায়
সবদিকে, সব খানে
সব মনে, সব প্রাণে
জেহাদের ততোই আগুন।

শহীদেরা ঝড় তোলে চেতনায়
নিশ্চিত বিজয়ের স্বপ্ন দেখায়;
নিদাঘের বুক চিরে
বেদনার তীরে–তীরে
জনগণ–মন জুড়ে
গানে–গানে সুরে–সুরে
আনে যে ফাগুন।।

শহীদেরা মরে না তো, বাঁচিয়ে রাখে
বিবেকের সকল খামার;
শহীদেরা সবুজাভ উৎসাহ চিরদিন–চিরকাল
তোমার আমার জানি এবং সবার।

শহীদেরা কাণ্ডারী জনতার–
জনতা সাগরে তাই ঢেউ ওঠে দুর্বার;
সেই ঢেউ বান হয়
বাঁধভাঙ্গা গান হয়
সেই গান ডেকে বলে–
'সব ভয়–ভীতি দলে
জাগুন জাগুন'।।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ যদি বিজয়ই দেন

আল্লাহ যদি বিজয়ই দেন
কে পারে তা ঠেকাতে
আর পরাজয় দিলে তিনি
বাধা দিবেন কে তাতে।।

তাই ভরসা করে তারা
আল্লা'র ওপর; মোমিন যারা–
ভেঙে সকল বাধার কারা
তাঁরই পথে আত্মহারা
সন্দেহ নেই যে তাতে।।

আল্লা'র দেয়া বিজয় পেতে
খাঁটি মোমিন হতে হয়
খাঁটি মোমিন নয় যে বন্ধু
হবেই যে তার পরাজয়।

এই দুনিয়ার সবচে বড়–
হোক সে নারী, হোক সে নর–
যার ভয়ে সব জড়োসড়ো
সে–ও অতি ক্ষুদ্রতর
খোদার অসীম কুদ্‌রাতে।।

www.nagorikpathagar.org

মানুষের গান

যদি চাও ভালো পরিণাম
তবে দাও মানুষের দাম।।

মানুষ খোদার সেরা সৃষ্টি
মানুষের দিকে দাও দৃষ্টি
মানুষের মুক্তির দাও আঞ্জাম।।

মানুষ দুঃখ পেলে
কাঁদে মানবতা
মানুষ বন্দী হলে
আসে দানবতা।

মানুষের নেই কোনো তুল্য-
তাই দাও মানুষের মূল্য
শান্তিতে ভরে যাবে জাহান তামাম।।

www.nagorikpathagar.org

আনুগত্য

এক আল্লা'র তুমি অনুগত হয়ে যাও
তাহলেই লাগবে না আর কারো মতে
বাতিলের ধ্বজাধারী আর কারো পথে
মাথা নতো করে দেয়া
দুই কাঁধে তুলে নেয়া
তিমিরধর্মী কোনো তাগুতের তাও।।

হও যদি শেষ নবী-রসূলের দেয়া নীতি–রসমের
খাদহীন স্বর্ণের মতো খাঁটি উম্মত
মেনে চলো আজীবন দ্বিধাহীন অন্তরে অন্তরে
অক্ষরে অক্ষরে তাঁরই সব সুন্নত
তাহলেই পারবে না কোনো শয়তান
বেদায়াত-শিরকের দিকে দিতে টান
লাগবে না জীবনেও
লাগবে না মরণেও
ভ্রান্ত-পূজারী-শঠ-ভণ্ডের বাও।।

এক আল্লা'র ভয়ে সর্বদা ভীত হলে
আর কারো ভয় করা লাগে নাতো
কোনো দিন কোনো কাজে ভাই
সমস্ত দুনিয়ায় আর কারো প্রভু বলে
অবনত মস্তকে কুর্নিশ করা কভু
লাগে না তো কোনোদিন জানে তা সবাই।

সময় থাকতে তুমি সব দিক বাদ দিয়ে সরাসরি
খুঁজে নাও কোরানের শাশ্বত বিধানই
বোজর্গ-দরবেশ-মহাজন বাদ দিয়ে একেবারে
খুঁজে নাও হাদীসের অনুপম মীযানই
আসহাবে রাসূলের ঈমানের মতো
আমলের বুনিয়াদ করো উন্নত
ঘুরবে না দ্বারে দ্বার
ঠকবে না বারে বার
পৃথিবীর দিকে দিকে যেদিকেই ধাও।।

www.nagorikpathagar.org

যখনি গভীর হয় রাতের আঁধার

যখনি গভীর হয় রাতের আঁধার
সবপথ জুড়ে নামে তমসা
তখনি আকাশ শেষে সম্ভাবনার
আলোর বলয় দোলে সহসা।।

হায়নার আনাগোনা দেখ না যতোই
জালিমের উদ্ধত কালো হইচই
হোক আরো কুৎসিত উৎসব অনুচিত
কোনো ভয় নেই খোদা ভরসা।।

পিশাচের উচ্ছ্বাস-উল্লাস যদি
ক্রমাগত বেড়ে গিয়ে থাকে খুব
মনে রেখো জনতার ক্ষোভ-বিক্ষোভ
থাকবে না বেশী দিন নিশ্চুপ।

সূর্যের উজ্জ্বল ওঠার মতোই
মুক্তির দিন আসে নিশ্চিত ঐ
দিন আসে সত্যের সত্যের বিজয়ের
ন্যায় ও সাম্যের নিয়ে পসরা।।

www.nagorikpathagar.org

ফুলের সুভাস

ফুলের সুভাস সেতো– সব মানুষেরে
ডেকে ডেকে যায়
পৃথিবীর প্রান্তে– সকল দিগন্তে
সুভাস ছড়ায়।।

সব ফুলে ঘ্রাণ নেই সবাই জানে
সুবাসিত ফুলই সাড়া জাগায় প্রাণে
মানুষেরও মাঝে যারা সুবাস বিলায়
পৃথিবী তাদেরই চায়।।

নকল ফুলে ফুলে ভরে গেছে দুনিয়া
আসল ফুলের কদর বাড়ে তাই শুনিয়া

ফুল হতে হলে লাগে ফুলের কুঁড়ি
ফুটবার আগে তাই চাই ফুলকুঁড়ি
সুভাস ছড়াবো বলে দূর সীমানায়।।

www.nagorikpathagar.org

আমার গোনাহ অথৈ তবু

আমার গোনাহ অথৈ তবু
ওগো দয়াল অশেষ মেহেরবান
দ্বিধা আর দ্বন্দ্বে চাই না যা তাও
ইচ্ছে করেই তুমিই করো দান।।

যখন কোনো পথ থাকে না
থাকে নাকো সহায়;
মুখ থুবড়েই পড়ে আমার
সকল প্রয়াস যে হায়–
ঠিক তখনই, ঠিক সেখানে
অবাক করে দাও হে তোমার
উপহারের সমান অফুরান।।

আমার অক্ষমতা প্রভু
তোমার চেয়ে কে বেশি আর জানে
তবু তোমার পাই যে ক্ষমা
সব'চে স্নেহের টানে।

বয়স যতোই বাড়ে আমার
ফুরায় যতই সময়
ততোই দেখি এই দুনিয়ায়
বন্ধু তো কেউ নয়
সেদিনও তুমিই বন্ধু রবে
যেদিন শেষ হবে রে আমার
সাধের পরান পাখির গান।।

www.nagorikpathagar.org

হতাশার কথা তুমি বলো না

হতাশার কথা তুমি বলো না
হতাশার আগুনে নিজেও জ্বলো না
তুমি জ্বলো না।।

আশার কুসুম তুমি যতোটা পারো
চারিদিকে রাশি রাশি ফোটাও আরো
ভালো করে জেনে রেখো
হতাশার মানে হলো ছলনা।।

আঁধারের মাঝখানে আলোরই মতো
পরিবেশ করে তোল আলোকিত

জীবনকে গড়ে তোলো স্বপ্ন দেখে
অনন্ত বিজয়ের সুবাস মেখে
বুঝে শুনে তুমি ওগো
বিনাশের পথে কভু চলো না।।

www.nagorikpathagar.org

আমার দেশের তরে

আমার দেশের তরে আমার এ-মন
সারাবেলা সারাক্ষণ শুধুই কাঁদে
অনেক নিবিড় করে
গভীর মায়ার ডোরে
নাকি সে আমায় শুধুই বাঁধে।।

লোকালয়ে দেখবো না
অনাহারী মানুষের মুখ
দেখবো না শিশুদের
অসহায় দৃষ্টির দুখ-
মুক্তির সেইদিন
পাবো কিনা কোনোদিন
ব্যথার সেতার তা-ই সাধে।।

আমার মাটির বুকে
জালিমের পদাঘাত আর
পড়তে থাকবে হায়
প্রতিদিন কতো বারবার?
দেশের দশের 'কাল'
পাও দেবে কতোকাল
শত্রুর পেতে রাখা ফাঁদে।।

প্রতিটি মানুষ পাবে
শিক্ষার সম-অধিকার
মুছে যাবে পাশবিক
কালোছায়া যতো হিংসার
মিলনের সেই গান
গাবো কবে অবিরাম
হাতে-হাত প্রতি কাঁধ-কাঁধে।।

www.nagorikpathagar.org

আমার নদীরা কবে
খুঁজে পাবে গতি বহমান
পদ্মার বুক কবে
ক্রমাগত হবে ধাবমান?
শত্রুর মায়াজাল:
অযাচিত জঞ্জাল-
ছুঁড়ে ফেলে আগুনের খাদে।।

www.nagorikpathagar.org

কাজের মানুষ

কাজের মানুষ কাজের ভেতর
নিত্য নতুন আনন্দ পায়
কাজ ছাড়া তার যায় না সময়
গুনগুনিয়ে গানও সে গায়-
আপন মনের মাধুরী মিশায়।।

আসল বন্ধু ব্যস্ততা তার
সময় কোথায় বিবাদ করার?
নিন্দাতে তার থোড়াই কেয়ার
পরচর্চায় আসে কিবা যায়।।

কাজের মানুষ কাজের সাথেই
কেবল থাকে দিনানুদিন লগ্ন
কেবল থাকে কাজের মাঝেই
অষ্টপ্রহর গভীরভাবে মগ্ন।

আলস্য তার জাত-দুশমন
অজুহাতের মূলোৎপাটন
করে করে তার তো সাধন
পৌঁছে যাওয়া জয়ের ঠিকানায়।।

www.nagorikpathagar.org

ধৈর্যের গান

ধৈর্য মানেই বৃক্ষের বীজ
গোপনে গোপনে বোনা
যে-বীজ একদা মহীরুহ হয়
দখিনা বাতাস করে সঞ্চয়
করে সম্ভব মাটি ও ছায়ায়
আকাশের গান শোনা।।

ধৈর্যের পথে আসে জীবনের
অমিত সম্ভাবনা
আশার দু'চোখে এঁকে দিয়ে যায়
বিজয়ের অঞ্জনা;
কোনো শুভক্ষণে ধুয়ে-মুছে ফেলে
জীবনের লাঞ্ছনা।।

পৃথিবীতে যতো এলো মহাজন
সকলেই ছিলো প্রতীক
ধৈর্যধারণ করার বেলায়
ধৈর্যধারীর অধিক।

ধৈর্য সে দেয় ঠাণ্ডা মেজাজ
চিন্তার গতিধারা
সুরাহা করার শত উপাদান–
সাম্যের ধ্রুবতারা;
'যে-সহে সে-রহে' এই মহাগুণ
আনে যে সম্মাননা।।

www.nagorikpathagar.org

আমাদেরই নাফরমানি

আমাদেরই নাফরমানি
পাপের ফলে হায়
বন্যা এলো গজব হয়ে প্রভু
হাত তুলেছি মাফ করে দাও তবু।।

ধীরে ধীরে আসলো ধেয়ে
স্রোতের অজগর
ফেললো গিলে সমস্ত দেশ
সকল বাড়িঘর।
কোটি কোটি মানুষ যেথায়
অথৈ বানে দিশা না পায়
খায় যে হাবুডুবু।।

বেঈমানির চরম সীমায়
পৌঁছে গেলে যা হয় অবশেষে
ভয়াবহ মুসিবতের
রাত ঘনিয়ে আসে সর্বশেষে।

তেমনি মুসিবতের বানে
উজাড় শহর গ্রাম
ক্ষুধার জ্বালায় মরছে ধুঁকে
আদমের সন্তান।
রোগে ওষুধ পথ্য না পাই
সেবা দেবার সাধ্যও নাই
সবই নিবু নিবু।।

www.nagorikpathagar.org

জাতিশুদ্ধ মরার আগে
সেই চেতনা দাওগো দয়াময়
তোমার হুকুম তরক করার
পরিণাম তো মোটেই ভালো নয়।

তাইতো তওবা করছি সবাই
হে আমাদের রব
করবো না আর শিরক্ কুফরী
বাতিলের উৎসব
এবার মহাবন্যা ফেরাও
গজব থেকে
পরিত্রাণ দাও
হে প্রকৃতির প্রভু।।

www.nagorikpathagar.org

আমরা গান লিখি

আমরা গান লিখি
সুর করি আল্লারই জন্য
আল্লারই গান গেয়ে গান গেয়ে
আমরা সবাই ধন্য।।

আমাদের কথায় আছে
কোরানের আহবান
মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে
আমাদের কণ্ঠের সংগ্রাম
সাম্যের গান গাই গান গাই
আমরা সত্যের সৈন্য।।

আমরা তাই গাহি
তাই চাহি যাতে আছে পুণ্য
জেহাদের গান গাই গান গাই
হই না কারোর পণ্য।।

আমাদের পথে আছে
তাগুতের বাধা-ভয়
সমাজের শান্তির স্বার্থে
তবু হই দুর্দম দুর্জয়
ঈমানের গান গাই গান গাই
চাই না কিছুই অন্য।।

www.nagorikpathagar.org

খানজাহানের পুণ্যভূমি

খানজাহানের পুণ্যভূমি খলিফাতাবাদ
সাত আকাশের সূর্য আমার সাত আকাশের চাঁদ।।

এইখানে সেই ষাট গম্বুজ কতো কীর্তি আর–
মন ভুলানো হাজার দীঘি মসজিদও হাজার।
আমি যতোই ভাবি সেসব কথা ততই বাড়ে স্বাদ
খানজাহানের পুণ্যভূমি খলিফাতাবাদ।।

মাঠের পরে মাঠ পেরিয়ে নদীর পরে নদী
সুন্দরবনের শিয়র দিয়ে বইছে নিরবধি–
আমি পাইনি কোথাও এমন মাটি এমন মায়ার ফাঁদ
খানজাহানের পুণ্যভূমি খলিফাতাবাদ।।

আল্লাহর ওলী লাখো লাখো, লাখো মুজাহিদ
জীবন দিয়ে গড়লো হেথা দ্বীন কায়েমের ভিত
আমি যতোই ভাবি সেই ইতিহাস অশ্রু ভাঙে বাঁধ।।

খানজাহানের পুণ্যভূমি সোনার বাগেরহাট
সাত আকাশের সূর্য আমার সাত আকাশে চাঁদ।

www.nagorikpathagar.org

আবুল কাশেম পাঠান

আবুল কাশেম পাঠান
করেছে জীবন দান
কোরআনের পথে আর
রাসূলের পথে-তাই
চিরদিন রবে অম্লান।।

রক্তে রক্তে ঐ
পূব আকাশের বুক লাল না হলে
উঠতো না সূর্য
হাসতো না প্রভাত
উজ্জ্বল উচ্ছল ঝলোমলে
খানজাহানের দেশে
কাশেম এক আকাশ আজ
সৌরভে গৌরবে সূর্য মহান।

কাশেম এক ইতিহাস
কাশেম এক প্রেরণা
কালজয়ী চিরজয়ী সেনাপতি
প্রতিবাদে প্রতিরোধে
জেহাদের উজ্জ্বল
শহীদের স্বপ্নীল ধ্রুব জ্যোতি।।

রূপসার তীরে তীরে
জনতার মিছিল ঐ এগিয়ে চলে
চেতনার শিখা হয়ে
জালিমের সব বাধা দলে দলে।
এক কাশেম ঐ দেখো
লাখো লাখো কাশেম হয়ে
সম্মুখে হয় আগুয়ান।।

www.nagorikpathagar.org

এসো না আজ সবাই মিলে ঐক্য গড়ি

এসো না আজ সবাই মিলে ঐক্য গড়ি–
আলো, আলো, আলোর জন্য লড়াই করি।।

আঁধার দেখে কেউ পাবো না ভয়
সকল বাধা করবো মোরা জয়;
নদীর গতির মতো এসো
সত্য ন্যায়ের রাস্তা ধরি।।

এসো না ভাই সকল কালো, সব অশুভ রুখি;
রাত্রি পোহাক–সোনালি দিন দশ দিকে দিক উঁকি।

ত্যাগের বিপুল বিশাল মোহনায়–
হোক না জমা শহীদি সঞ্চয়;
তবু চলার তীব্র নেশায়
হেরার পথে ভাসাই তরী।।

www.nagorikpathagar.org

পাষাণ পাষাণ মন পাথর পাথর জন

পাষাণ পাষাণ মন পাথর পাথর জন
পাল্টাতে পারে এ শাহাদাৎ
আকড় আলোকহীন আঁধার আঁধার দিন
পাল্টাতে পারে এ শাহাদাৎ।।

রক্তের এই নদী চিরদিন চিরকাল গতিময়
রক্তের এই স্রোত কারো কাছে কোনদিন মানে নাকো পরাজয়
অলস অলস ঘুম মরণ মরণ ধুম
ভাঙাতে পারে এ শাহাদাৎ।।

শাহাদাৎ এনে দেয় অনিঃশেষ মর্যাদা শহীদের
আল্লাহর পথে ছাড়া এই মান সম্মান মেলে নাকো কোন জন মানুষের

এই সেরা কুরবানি গড়ে তোলে জিহাদের ময়দান
যার ফলে গোটা জাতি গেয়ে ওঠে কুরআনের কাঙ্ক্ষিত জয়গান
মলিন মলিন দেশ গৌরবে সবই শেষ
রাঙাতে পারে এ শাহাদাৎ

www.nagorikpathagar.org

কিশোর কচি শীষ মোহাম্মদ

কিশোর কচি শীষ মোহাম্মদ
ছোট্ট ছেলে শীষ মোহাম্মদ
সেই সাথে তার বন্ধুরাও
কতো ভাগ্যবান
আল কোরানের জন্য যারা
করলো জীবন দান।।

আল কোরআনের শহীদ হওয়া
সহজ তো নয় সবাই জানে
সহজতো নয় অকাতরে
সব বিলানো তাহারই সম্মানে
সেই আলোকে শীষ মোহাম্মদ
পাতায় পাতায় ইতিহাসের
অনন্তকাল রইবে যে অম্লান।।

কিশোরকণ্ঠ শীষ মোহাম্মদ
সবুজ শহীদ শীষ মোহাম্মদ
সেই সাথে তার
সংগীরাও সবার চেতনায়
আল কোরআনের সংগ্রামে
আজ দীপ্ত প্রেরণায়।

তার রুধিরের বদলা নেবে
বীর জনতা দ্বীনের বিজয় এনে
বদলা নেবে মানবতা
সুশীল সমাজ শত্রু গেছে জেনে
জেনে গেছে নাস্তিকতা
জেনে গেছে স্বৈরাচারও
দ্বিতীয়বার নেই যে পরিত্রাণ।।

www.nagorikpathagar.org

চোখ জুড়ানো গাছের সারি

চোখ জুড়ানো গাছের সারি
ছবির মত ঘর ও বাড়ি
তার ওপরে নানান মেঘের খেয়া
আর কারো নয়
আর কারো নয়
সব তোমারই দেয়া প্রভু সব তোমারই দেয়া।।

আবার মেঘের পারে
নীল মাখা এক আকাশ
যেথায় মনের পাখির কেবল
উড়াল দেবার সাধ
হারিয়ে যাবার তৃষ্ণা অথৈ
অসীম উদাস আভাস
আর বিনীত ভাবের–দেয়া নেয়া–
সব তোমারি দেয়া প্রভু সব তোমারই দেয়া।।

পিউকাহাপিউ পাখির গীতি
নিবিড় বনের পরম প্রীতি
তার ভেতরে অনন্ত হাতছানি
আর কেউ নয়
আর কেউ নয়
তোমার সাথেই গভীর জানাজানি।

আবার সাগরজুড়ে
নিত্য নানান খেলা
সকাল দুপুর সাঁঝের বেলা
নতুন রূপের মেলা
সাঁতরাতে চায় যেথায় আকুল
মনপবনের ভেলা
আর মোহিত মুগ্ধ মাতাল হিয়া।।

www.nagorikpathagar.org

আবার সুন্দরবনে
কেওড়া গাছের ভীড়ে
বাঘ–হরিণ আর বনমোরগের নীড়ে
কিম্বা গেও গোলের পাতার
ছন্দ দোদুল তীরে
যার নিকটে স্বপ্ন ছড়ায় কেয়া।।

www.nagorikpathagar.org

কিছু কিছু

[মনিরউদ্দিন ইউসুফ স্মরণে]

কিছু কিছু মানুষের পদছাপ
চিরদিন রয়
জানি অক্ষয়
সূর্যের মতো পূত নিষ্পাপ।।

সেইসব মানুষের জন্য
জীবনের ঘোচে দশাদৈন্য
পৃথিবীর দেহ থেকে তাইতো
মুছে যায় হীনতার অভিশাপ।।

কিছু কিছু সবুজের বনোতল
শত ঘাতে প্রতিঘাতে অবিকল।

কিছু কিছু পুষ্পের গন্ধ
মন করে সুঘ্রাণে অন্ধ
ঝরেও ঝরে না তার পাপড়ি
ধরে রাখে ফাগুনের উত্তাপ।।

www.nagorikpathagar.org

শীত সকালেও শীত রাত্রেও

শীত সকালেও শীত রাত্রেও
শীত যে সারাবেলা
শীতের সঙ্গে চারদিকে ঐ
ঘোর কুয়াশার খেলা।।

শীতের ভয়ে সূর্যটাও ভীষণ জড়সড়
দিনদুপুরেও প্রতাপটা তার নয়তো খরতর
তাইতো বুঝি হিমেল হাওয়ায়
কনকনে শীত ঠিক বয়ে যায়
পাতায়–পাতায় নিশির শিশির
বসায় শীতের মেলা।।

পত্র ঝরার দিন এলো গো
এই বনে ঐ বনে,
মর্মর–অবাক–ছন্দ এলো
এই মনে ঐ মনে।

রোদ পোহাবার ধুম পড়েছে পাড়ায় পাড়ায় আজি
এক ধামাতে গুড়–মুড়ি তাই সবাই খেতে রাজি
মুরুব্বি, সবার বড়
খোকন সোনা ছোট্ট– কারো
শীতের পিঠেয় রসের পিঠেয়
নেই তো অবহেলা।।

www.nagorikpathagar.org

শীত যেনো চাবুক আজ

শীত যেনো চাবুক আজ
শীত যেনো অস্ত্র,
সেই শীত ঠেকাবার
দুখীদের বাঁচাবার
নেই শীত বস্ত্র।।

ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপে বস্তির পিচ্চি
কেউতো বলে না তারে–কম্বল দিচ্ছি
সাব্বাস সাব্বাস
সোয়েটার নিয়ে যাস
বলে নাতো হেসে কোনো
বড় লোক মস্ত।।

শীত এলে বোঝা যায়
কার দয়া কতোটা
কার আছে মানবতা
স্নেহ–মায়া–মমতা।

ফুটপাতে পড়ে আছে খালি গায় পঙ্গু
নেই কি রে কেউ তার দরদী ও বন্ধু
এই শীতে গরিবের
সবহারা নিঃস্বের
দিকে দিবে বাড়িয়ে যে
মোবারক দস্ত।।

www.nagorikpathagar.org

আয় শীতে যাই গাঁয়

আয় শীতে যাই গাঁয়
শুকনো-শীতল পথ ধরে আয়
হাঁটবো পায়ে পায়।।

খেজুর গাছের টসটসে রস খাবো গো
এক সাথে সব মামার বাড়ি যাবো গো
চড়বো তখন ছোট্ট খালের
ছোট্ট ডিংগি নায়।।

আয় শীতে যাই
গায়ের বাড়ি ঘরে
কয়েকটা দিন কাটবে না হয়
পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে।

সহজ-সরল মানুষ আপন করবো গো
পল্লীগানের সুরে গলা ভরবো গো
দেখবো ধানের ক্ষেতে বাতাস
কেমন করে ধায়।।

www.nagorikpathagar.org

এমন গজব কেউ কখনো

এমন গজব কেউ কখনো
দেখে নাইরে ভাই
আল্লা' তালার লীলা কারো
বোঝার সাধ্য নাই।।

বৃষ্টিবিহীন ঝড়ের সাথে
ক্ষুব্ধ আগুন বইলো রাতে
লতাপাতাও সেই আগুনে
পুড়ে হইলো ছাই।।

গাছগাছালীর ওপর দিয়ে
আগ্রাসী ঢেউ যায় গড়িয়ে
জীব-জানোয়ার মানুষ কেহ
পাইলো না রেহাই।।

লাশ আসে হায়! লাশ ভেসে যায়
উপকূলের জোয়ার ভাটায়-
হাহাকার আর আহাজারি
কান পাতিলেই পাই।।

ক্ষুধার জ্বালা মহামারী-
আমরা যে আর সইতে না'রি
আল্লাহ তুমিই মদদ করো
তোমার সহায় চাই।।

www.nagorikpathagar.org

পাপ ছাড়ে না

পাপ ছাড়ে না বাপেরে
সেজন কেবল মাপ পেয়ে যায়
পাপে ভরা এই দুনিয়ায়
যে জন জ্বলে-পুড়েই মরে
পাপের অনুতাপেরে।।

পাপকে যে পাপ মনে করলো না
সেই তো মহাপাপী
সকল পাপই দুই চোখে তার
করছে দাপাদাপি;
যেমন করে দাপাদাপি
যেমন করে লাফালাফি
মিথ্যা-বাতিল মতে-পথে
পথভ্রষ্ট কাফেরে।।

মাকাল ফলের রঙের মতোন পাপের গায়ের রঙ
হায়! তারো চেয়ে অধিক রঙিন পাপের রঙ বরং।

পাপীর জীবন সুখের হয় না
কাল জানে সে কথা
সেই পাপী পাপ করে তবু
নিত্য যথা-তথা
অবশেষে পাপের পাত্র
পরিপূর্ণ হলে মাত্র
ধ্বংস তারে করেই ছাড়ে
অভিশপ্ত শাপেরে।।

www.nagorikpathagar.org

কষ্ট করো

কষ্ট করো কষ্ট করো
কষ্ট করো সবাই
নইলে কিন্তু নিঠুর কালের
হাতে হবে জবাই।।

করতে চায় না কষ্ট যারা
আসল খাঁটি অলস তারা
অবশ তাদের বিবেক–বুদ্ধি;
বিবেচনাও নাই।।

কষ্ট করো লেখায় পড়ায়
কষ্ট করো জীবন গড়ায়
ধরায় টিকে থাকতে হলে
কষ্ট করা চাই।।

কষ্ট ছাড়া মানুষ কোনো
হয় না মহান–মহৎ শোনো
যেনো এসব বলছে কোরান
কান পাতলেই পাই।।

www.nagorikpathagar.org

একদিন তোমার কিছুই রবে না

একদিন তোমার কিছুই রবে না
সকল মায়ার বাঁধন কেটে– যেতেই হবে জানি
সেইদিন তোমার পোশাক হবে কাফন
বন্ধু–বান্ধব–আপনজনের ঝরবে চোখের পানি।।

সময় থাকতে তাইতো তুমি
এমন পথে যাও এগিয়ে
যে পথ মুক্তির দিগ–দিগন্ত
দিনের মতো দেয় দেখিয়ে
দেয় শিখিয়ে সত্যিকারের সফলতার পন্থা
দেয় চিনিয়ে কোনটা সত্য
কিসে কল্যাণ সন্নিহিত
দেয় বুঝিয়ে কোনটা মিথ্যা
কোনটা বাতিল অভিশপ্ত
সময় থাকতে তাইতো তুমি নাও চিনে নাও
এসো চিনে নাও আসল হন্তা এবং তোমার শত্রু
নইলে সেদিন উপায় থাকবে না
যেদিন তুমি দেখবে তোমার আমলনামা খানি।।

সারা বছর লেখাপড়া
করলে রেজাল্ট ভালো হবে
জ্ঞান সাধনায় থাকলে লেগে
অন্ধকারের আলো হবে
আলোয় আলোয় ভরবে তোমার সকল ভুবন প্রান্ত
তেমনি যদি কোরান পড়ো
সেই আলোকে জীবন গড়ো এবং জেহাদ লড়াই করো

সমাজ গড়ো, রাষ্ট্র গড়ো
তবেই তুমি পরকালে বদলা পাবে অশেষ অতলান্ত
নয়তো কোনো স্বস্তি পাবে না
অশান্তি সব তোমায় নিয়ে করবে টানাটানি।।

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

গানের খাতা

[অগ্রন্থিত]

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

প্রসঙ্গ কথা

কবির ইচ্ছে ছিলো 'গানের খাতা' নামে একটি গীতিকবিতার বই করার। তাঁর সেই ইচ্ছার ফসল গানের খাতা পাণ্ডুলিপিটি। এই পাণ্ডুলিপিতে কবির বিভিন্ন গানের খাতায় লেখা বিচিত্র গানগুলোকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন স্মারক সংকলন থেকেও বেশ কিছু গীতিকবিতা সংগ্রহ করে এই পাণ্ডুলিপির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই পাণ্ডুলিপির অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর বিষয় বৈচিত্র্য। কতোরকম বিষয় নিয়ে যে কবি অসাধারণ সব গীতিকবিতা লিখে গেছেন, এই পাণ্ডুলিপির লেখাগুলো পাঠ করে তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। পাণ্ডুলিপিটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন মনিরুজ্জামান।

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

ঈমান এনেছি এই/ ১১১
অবিচল থাকো, সংযত থাকো/ ১১৩
ভালো কাজ করলেই ভালো ফলাফল/ ১১৪
সকল কষ্টে সে ছিলো আমার/ ১১৫
বিশ্বাসী লোক/ ১১৬
সবটুকু জেনে দাও ফতোয়া/ ১১৭
মানুষ হিসেবে যারা অধম/ ১১৮
বদলেছে ভাই/ ১১৯
পবিত্রতার পরশ ছড়ায়ে/ ১২০
ভাগ্যের যতো বন্ধ দরজা/ ১২২
রেজেক যেমন বন্টন হয়/ ১২৩
কাজ-প্রিয়-লোক/ ১২৪
পদবী এবং অর্থ যাদের/ ১২৫
নিয়ম-নীতি/ ১২৬
অপসংস্কৃতি/ ১২৭
আবার উঠেছে শোর/ ১২৮
দাওয়াত পেলে যাওয়াই ভালো/ ১২৯
একদিন অপরাধী শাস্তি পাবেই/ ১৩০
ভালোমন্দ যাচাই করতে পারে যে/ ১৩১
ঈদ মোবারক, ঈদ মোবারক/ ১৩২
নামাজ পড়া যেমন ফরজ/ ১৩৩
সেহরী খাওয়ার সময় ওঠার স্বভাব/ ১৩৪
নয় নয় নয় কোন কল্পনা/ ১৩৫
পাঁচ বেলা এই ঢাকার শহর/ ১৩৬
আটাশে অক্টোবরের কাহিনী/ ১৩৭

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী ব্যাংকের গান/ ১৩৮
তোমরা যারা বন্ধু ছিলে/ ১৩৯
যে পারো সে সান্ত্বনা দাও/ ১৪০
জীবন দিলেন শহীদ হলেন/ ১৪১
বিশ্বের নেতা/ ১৪২
গা'র জোরে নিয়ে যাবে সবকিছু/ ১৪৩
দৈনিক সংগ্রাম/ ১৪৫
ইহুদীরা সময়ের শত্রু/ ১৪৬
ফারাক্কা বাঁধ দিয়েছিলো যারা/ ১৪৭
গানের শহর প্রাণের শহর/ ১৪৮
এতো যে হিংসা এতো বিদ্বেষ/ ১৪৯
মনের পর্দা হলেই তবে/ ১৫০
গণতন্ত্রের সংজ্ঞায় রাজনৈতিক/ ১৫১
কিশোরকণ্ঠ/ ১৫২
কাজের কাজী-১/ ১৫৩
কাজের কাজী-২/ ১৫৪
পাখিও ডাকতে ডাকতে/ ১৫৫

www.nagorikpathagar.org

ঈমান এনেছি এই

ঈমান এনেছি এই-
এতোটুকু বললেই
ছাড় পাওয়া যাবে নারে
ছাড় পাওয়া যাবে না।

নিশ্চয় ঈমানের
পরীক্ষা এখানের
নিশ্চিত দিতে হবে
সব ঝুঁকি নিতে হবেঃ
নইলে বন্ধু ওগো
পার পাওয়া যাবে নারে
পার পাওয়া যাবে না।

সময়ের ইতিহাস খুলে দেখো এখনি
পড়ে দেখো কালের খাতা
ঈমান নিয়েছে কেউ যথাযথ যখনি
নোয়ায়েছে আপন মাথাঃ
মুক্তির মহাসুখে
আল্লা'র সম্মুখে;
সংগ্রাম ও ধৈর্যের
চির ঐশ্বর্যের
পথে থেকে অবিচল চলতেই হয়েছে যে
তার আজীবন
ক্ষণ-অনুক্ষণ।

www.nagorikpathagar.org

ঈমান এনেছি এই-
এতোটুকু স্বীকারেই
যাবে না যাবে না পাওয়া
জান্নাতে প্রবেশের ছাড়পত্র;
আল্লা'র পথে লড়া
সবরের পথ ধরা
ছাড়া কভু মিলবে না
আহা কভু মিলবে না
পরকালে মুক্তির কোনো দানসত্র।

মাটিতে গর্ত করে পুতে রাখা কেউ কেউ
হলো দেখো করাত-চেরা
অঙ্গের সন্ধিতে আঁচড়ানো কেউ হলো
লৌহের চিরুনী-ছেঁড়া;
ঈমানের কারণেই
এই পথে চারণেই:
মিথ্যা ও সত্যের
চূড়ান্ত দ্বন্দ্বের
মাঝ থেকে কে কাফের? কে মোমিন? বাছাইয়ের
এই আয়োজন
নয় অকারণ।

www.nagorikpathagar.org

অবিচল থাকো, সংযত থাকো

অবিচল থাকো, সংযত থাকো
দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকো
তারপর তুমি জীবন জয়ের
সোনালি স্বপ্ন আঁকো।।

বুদ্ধি ও মেধা বিবেচনা করে
শান্ত চিত্তে অবিরত লড়ে
ভবিষ্যতের তীব্র নেশায়
নির্ভাবনায় পার হয়ে যায়
বর্তমানের সাঁকো।।

পাহাড়ের আছে অটল থাকার
দীপ্ত অঙ্গীকার
ঝড়ে-ঝঞ্ঝায় তাই সে অনড়
দৃপ্ত ভঙ্গী তার।

খুদীকে তোমার আরো তুলে ধরো
জ্ঞানের পৃথিবী উদ্ভব করো;
সব বিপত্তি মাড়াবার তরে
আল্লা' তালার মদদের পরে
পূর্ণ ভরসা রাখো।।

www.nagorikpathagar.org

ভালো কাজ করলেই ভালো ফলাফল

ভালো কাজ করলেই ভালো ফলাফল
মন্দ কাজের ফল মন্দ
দ্বন্দ্বের পরিণাম দ্বন্দ্ব শুধুই
বোঝে তাতো বোবা-কানা-অন্ধ।।

ভালো মন সর্বদা ভালো ভাবনায়
মশগুল থাকে ভালো সম্ভাবনায়
ভালো ফুল ছড়াবেই চারিদিকে ওগো
মনমাতানোর মতো গন্ধ।।

ভালো কাজে আল্লা'র মদদ মেলে
মেলে তাঁর রহমত সীমাহীন
ভালো কাজ অক্ষয় অম্লান আহা
ইহকালে, পরকালে চিরদিন।

সবচেয়ে ভালো কাজ আল্লার পথে
লড়াই চালিয়ে যাওয়া তাঁরই শপথে
তবেই অন্যসব ভালো কাজগুলো
পাবে আরো গতি পাবে ছন্দ।।

www.nagorikpathagar.org

সকল কষ্টে সে ছিলো আমার

সকল কষ্টে সে ছিলো আমার স্বচ্ছ-সুশীল জ্ঞাতি;
সে ছিলো আমার আদরের ভাই, প্রিয় সংগ্রামী সাথী।।

সে ছিলো কোমল কবিতার মতো গান
সে ছিলো উদার প্রকৃতির মতো প্রাণ
সে ছিলো আমার কলিজার ধন, হৃদয়ের মাতামাতি।।

সে ছিলো আমার বিপ্লবী সুর, জেহাদের দুই হাত;
হাতে-হাত বেঁধে, পায়ে-পায়ে চলা পোস্টার ভরা রাত।

সে ছিলো দীপ্ত মিছিলের মতো গতি
সে ছিলো সাহস প্রেরণার সম্মতি
সে ছিলো অশেষ সম্ভাবনার অবিরাম সুখ্যাতি।।

www.nagorikpathagar.org

বিশ্বাসী লোক

সত্যিকারের বিশ্বাসী লোক
চিনতেই যদি চাও?
তাহলে দেখো না বাইরের বেশ-ভূষা
কথোপকথন সংলাপ দিলকুশা
বরং কি কাজ করে তার দিকে
গভীর দুচোখে তাকাও।।

কুরআনের পথ তার পথ কিনা দেখো
রসূলের মত তার মত কিনা দেখো
তার চলাফেরা আলোকে কি ঘেরা?
সত্যকে দিয়ে যাচাও।।

মাকাল ফলের বাইরে দারুণ
রঙ্গের সমাহার
ভেতরে বিকট দুর্গন্ধের
বিচিত্র সমাচার!

বৃক্ষ তোমার নাম কি বলো না-
'ফলে পরিচয়, নয়কো ছলনা।'
এই প্রবাদের নেই হেরফের-
বুকের ভেতরে আঁকাও।।

www.nagorikpathagar.org

সবটুকু জেনে দাও ফতোয়া

সবটুকু জেনে দাও ফতোয়া
সবকথা শুনে দাও সমাধান
তার আগে হও খাঁটি মুক্ত মানুষ-
উদার-উর্ধ্বতম ক্ষমা-গত-প্রাণ।।

আগে-পরে ভাবে না তো মূর্খ-
অন্ধের কাজ নয় পথ দেখানো;
উগ্রই অকারণে যুদ্ধ বাঁধায়;
যায় না তারে কভু ঠেকানো।
বিবেকের কাজ হলো পরিবেশ বোঝা-
বুঝে-শুনে তারপরে নির্দেশ দান।।

ভেবে নাও আগে-ভাগে বন্ধু
আর নাও ভালো পরামর্শ
এ-ভাবেই কাজ করো নিত্য
নিশ্চয়ই হবে উৎকর্ষ।

উদ্ধত মানুষেরা কিন্তু
পক্ষের মানুষের পক্ষে
চোখ বুজে রায় দিয়ে কেবলি
আপনারে করে যায় রক্ষে;
কানকথা শুনে-শুনে গোজামিল দিয়ে
ইচ্ছে মতোন ছাড়ে রাজ-ফরমান।।

www.nagorikpathagar.org

মানুষ হিসেবে যারা অধম

মানুষ হিসেবে যারা অধম মানুষ–
ক্ষুদ্র-অকাট নিচু-অন্তর;
ষড়যন্ত্রের তারা মহাবিভীষণঃ
গোপনে চালায় খর-নীল-খঞ্জর।।

এরা থাকে আশেপাশে
নানাবিধ ছদ্মবেশে
এরা চালে কূট-চাল-
গুটি যতো মিষ্টি হেসে
ক্ষমতার মোহে বড় হিংস্র এরা
পয়সার লালসায় ভীষণ কাতর।।

বাইরে বাইরে যারা মানুষের মতো-
ভেতরে ভেতরে মহাশয়তান;
নিজের স্বার্থ ছাড়া বোঝে না কিছুই
নিজেরা নিজেরা গায় নিজেদের গান।

অন্যায় কাজে এরা
হয় না তো পিছপা কভু
যতোই লজ্জা দাও
পায় না তো লজ্জা তবু;
জোচ্চোর, বাটপার, বকধার্মিক
এদের কাছেই পায় খুব সমাদর।।

www.nagorikpathagar.org

বদলেছে ভাই

বদলেছে ভাই যুগের হাওয়াও
বদলেছে কলিকাল
তাই কি নিত্য চাটছে এখন
বিড়ালে বাঘের গাল।।

হাতি পড়ে গেছে হাবড়ে হায়রে
চামচিকে লাথি মারে
লেজ তুলে ভাগে বড় বড় ষাঁড়
ছাগল পড়েছে ঘাড়ে;
ঝড়ের সুযোগে পথের ঊর্ধ্বে
উঠেছেরে জঞ্জাল।।

বোবাও এখন বাঁচতে পারে না
শক্রর ধাওয়া থেকে
জিব নেই যার সেই বুঝি ভাই
সবকিছু দেখে চেখে।

সিংহ বিপদে বন্দি কি তাই
ফেউ হুংকার ছাড়ে?
নেউলের ঘরে ফাঁক পেয়ে সাপ
তৃপ্তির লেজ নাড়ে;
বৃক্ষ তাড়িয়ে মেঘ ছুঁতে চায়
শুকনো গাছের ডাল।।

www.nagorikpathagar.org

পবিত্রতার পরশ ছড়ায়ে

সাধনার মাস, শিক্ষার মাস
মাহে রমজান আসে
পবিত্রতার পরশ ছড়ায়ে
আকাশে-বাতাসে।।

মাহে রমজান কোরানের মাস
তার পথ ধরে চলা-অভ্যাস
গড়ে দিয়ে যায় আলোকের দূত
আভাসে আভাসে।।

না-খেয়ে থাকার সকল কষ্ট
যায় বোঝা যায় এ-মাসে পষ্ট-
কতো ব্যথা জমা গরিব-দুখীর
আবাসে আবাসে।।

মুক্তহস্তে দানের এ-মাহ্
পরম যত্নে দিলেন আল্লাহ
আকাশে আকাশে চাঁদ হয়ে তাই
সে-ভাসে, সে-ভাসে।।

দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ঘুচায়ে ভ্রান্তি
দেহ-মন জুড়ে অপার শান্তি
এনে দিয়ে যায় বিশেষ এ-মাসঃ
সকাশে সকাশে।।

মাহে রমজান ঐক্যের মাস
মানুষে মানুষে সখ্যের মাস
খোদার প্রেমের সোনালি রেখায়
আঁকা সে, আঁকা সে।।

www.nagorikpathagar.org

নয় নয় নয় কোনো কল্পনা,
রমজানে নিলে পরিকল্পনা,
সারা বছরের জীবন কাটবে
এ-চাষে সে-চাষে।।

ভোররাত্রের জাগা-অভ্যাস,
করতে চায় যে একাদশ মাস,
সব আলস্য-সেহরি খাওয়ার
নিয়মে সে নাশে।।

রমজানে যে গো থাকে বিলকুল,
এ-মাসের যতো কাজে মশগুল,
ঈদের সকালে-
তার চেয়ে বেশি
কে হাসে? কে হাসে।।

www.nagorikpathagar.org

ভাগ্যের যতো বন্ধ দরজা

ভাগ্যের যতো বন্ধ দরজা
খুলে যায় তদ্‌বীরে
তদবীর মানে সর্বপ্রয়াস
সারাদিনরাত ধরে।।

আল্লা' ভরসা বলে বসে থাকা
কষ্ট না-করে শুধু ছবি আঁকা
ঈমানদারের কাজ নয় কভু
-মানায় না তার তরে।।

অলস মানুষ বাহানা বানায়
কাজ না-করার ছলে;
দোষে তকদীরে ঢাকতে নিজেকে
ভাগ্যের দোষ বলে।

কর্মবীরের তরে তকদীর
কাজের প্রেরণা, চেতনা নিবিড়-
সতত কাজের ধারাবাহিকতা
আলোকিত অন্তরে।।

www.nagorikpathagar.org

রেজেক যেমন বণ্টন হয়

রেজেক যেমন বণ্টন হয়
বণ্টন হয় চরিত্র
আল্লা' তালার মদদ ছাড়া
হয় না তো কেউ পবিত্র।।

মানুষের মন পয়সা দিয়ে
যায় না করা জয়
জয়ের জন্যে লাগে অটল
চরিত্র নিশ্চয়
যার আছে ভাই চরিত্র সে
সকল লোকের মিত্র।।

সৎ চরিত্রের সংগে যদি
ঈমান থাকে ভাই
এই দুনিয়ায় কোথাও যে তার
কোনই জুড়ি নাই।

খাঁটি মানুষ হতে লাগে
মানবতার গুণ
প্রেম-পরিশ্রম-খোদাভীতি
শ্রেষ্ঠ তমদ্দুন
অন্যায় প্রতিরোধ করাটাই
আসল-জীবন-চিত্র।।

www.nagorikpathagar.org

কাজ-প্রিয়-লোক

কাজ-প্রিয়-লোক কাজ করে যায়
দেখায় না অজুহাত
কাজ আর কাজ সারাবেলা শুধু
নেই কোনো দিন-রাত।।

নীতিহীন লোক অভিযোগ নিয়ে
সারাক্ষণ থাকে ব্যস্ত
নিজের দায় সে অন্যের ঘাড়ে
কৌশলে করে ন্যস্ত;
মূলকাজ ফেলে রেখে দেয়া তার
অদ্ভুত খাস্‌লাত।।

কাজের মানুষ আনন্দ পায়
ছোট-বড় সব কাজে
সময় কোথায় তার করবার
দোষারোপ আজেবাজে।

অকাজের লোক গাছের, তলার
দুইটাই খেতে লুব্ধ
বাড়া ভাতে তার ছাই দিলে কেউ
হয়ে ওঠে খুব ক্ষুব্ধ;
স্বার্থপরেরা চায় টাকা-কড়ি
চায় না তো ইজ্জাত।।

www.nagorikpathagar.org

পদবী এবং অর্থ যাদের

পদবী এবং অর্থ যাদের
পাগলের চেয়ে করে পাগল
কি করে বাজাবে অবিরাম তারা
দিগ্বিজয়ের মাদল।।

নিজের স্বার্থ নিয়ে সারাক্ষণ
দুর্ভাবনায় থাকলে মগন
জাতির স্বার্থ দেখতে কখন
ছিঁড়বে লোভের আঁচল।।

মুখোশ পরেছে যে-সব মানুষ
লালসার মুখ ঢেকে
কতোটুকু পাবে ত্যাগের মহিমা
তাদের নিকট থেকে।

পানিঘোলা করে দিন-অনু-দিন
হতে চায় এরা সবুক্তগীন;
ধরা পড়ে পরে চিৎ হয়ে থাকে
বিষ খেয়ে মরা কাতল।।

www.nagorikpathagar.org

নিয়ম-নীতি

যে কোনো কাজ করতে গেলেই
লাগে নিয়ম-নীতি
সকল নীতির শ্রেষ্ঠনীতি
ইসলামী সংস্কৃতি।।

সংস্কৃতির মানে কিন্তু
কায়দা-কানুন রীতি
চিন্তা ভাবনা চলন বলন
কার্য-কর্ম-কৃতি
নিত্য যে দেয় বাঁচার মতো
বাঁচার অনুভূতি।।

যে-জাতির নেই সংস্কৃতি
তাহজীব-তমদ্দুন
অনেক আগেই লেগেছে তার
মন-মগজে ঘুণ।

সংস্কৃতির প্রতি যাদের
চরম অবহেলা
আন্দালুসের মুসলমানের
মতোই তাদের বেলা
ডুবে যাবে এবং হবে
ইতিহাসে স্মৃতি।।

www.nagorikpathagar.org

অপসংস্কৃতি

সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আজ অপসংস্কৃতি
অঘোষিত যুদ্ধ করে
অন্যায়ে উদ্বুদ্ধ করে
বাড়াচ্ছে দুষ্কৃতি।।

ক'জন বলো এই ব্যাপারে তবু সচেতন
জ্ঞানী-গুণী-আলিম-নেতা হউক না সে যেজন
কাউকে কি খুব ক্ষুব্ধ করে
জাত বাঁচাতে ক্রুদ্ধ করে
জাগায় অনুভূতি।।

সব চ্যানেলই বলতে গেলে ঈমান নষ্ট করার
কায়দা করে তরুণ সমাজ পথভ্রষ্ট করার
বলতে গেলে সব বিনোদন চরিত্র ধ্বংসের
তৎপরতায় লিপ্ত এখন মনুষ্য বংশের।

সব কথিত ভালো মানুষ ঘামায় না তো মাথা
গোটা জাতির সর্বনাশেও নেইতো তাদের ব্যথা
ব্যবসায়ীরা আরো উদাস
রাজনীতিকরা রাজনীতির দাস
কার আছে সুমতি।।

www.nagorikpathagar.org

আবার উঠেছে শোর

আবার উঠেছে শোর
এই ঘোর দুর্দিনে শোনো–
'নারায় তাকবীর
আল্লাহু আকবার'–
হারানো দিনের সেই
বিপ্লবী আহবান, জেহাদেরই শ্লোগান যেনো।।

আবার গর্জে ওঠে আল্লাহর
সিংহরা আজ
বাতিলের উৎখাতে দিকে দিকে
তোলে যে আওয়াজ;
মানবে না, মানবে না
তারা বাধা কারোর কোনো।।

তোমার ঘুমের ঘোর কাটুক এবার,
সময় এসেছে দেখো–
আল্লার শত্রুর কালো হাত, বিষদাঁত
চিরতরে উপড়ে ফেলার।

আবার জমেছে আজ জেহাদের
ময়দান যতো
শহীদের শর্তেও মুমীনেরা
সব সম্মত;
মানবে না, মানবে না
তারা বাধা কারোর কোনো।।

www.nagorikpathagar.org

দাওয়াত পেলে যাওয়াই ভালো

দাওয়াত পেলে যাওয়াই ভালো
দাওয়াত খাওয়া উচিত;
দাওয়াত বাড়ায় সম্প্রীতি আর
সম্পর্কের ভিত।।

দূরের মানুষ কাছে এনে দেয়
অনেক অনেক ভুলও ভেঙ্গে দেয়
ছিন্ন বুকের কোলাকুলি
দাওয়াত করায় খোলাখুলি
দেয় ফিরিয়ে মূল চেতনা-
হারানো সম্বিৎ।।

দাওয়াত দিলে রসূল ভীষণ
খুশি হয়ে যেতেন।
সাধ্যমত উপহারও
সংগে লয়ে যেতেন।

হিংসার আগুন দেয় নিভিয়ে দাওয়াত
সারিয়ে তোলে সব পুরনো আঘাত
একত্রিত হবার এ-পথ-
আল্লা'তালার অপার রহমত
আক্ল্‌মান্দরা দেয় না তো বাদ
এমন প্রেক্ষিত।।

www.nagorikpathagar.org

একদিন অপরাধী শাস্তি পাবেই

একদিন অপরাধী শাস্তি পাবেই
অভিশাপ তার পিছু ছাড়বে না
কালের কঠিন হাতে ধরা পড়বেই
কোনোভাবে বাঁচতে সে পারবে না।

জালিমেরা ভোগ করে কিছুদিন
কিছুদিন আয়েশে কাটায়
ধরা সরা মনে করে ক্ষমতার
অবৈধ শক্তি খাটায়।
তারপর ধীরে ধীরে আসবে প্রলয়
বিধির বিধান ধার ধারবে না।

হিতাহিত জ্ঞান বলে থাকে না কিছুই কোনো
উগ্র ও উদ্ধত অহংকারীর;
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয় গড়ে-তোলা সবকিছু
লেলিহান হিংস্রতা অত্যাচারীর।

তবু আছে চিরজয় সত্যের
ন্যায়ের রয়েছে চির উত্থান
অন্যায়-অবিচার চিরদিন
নিয়ে আসে পরাজিত পরিণাম;
কল্যাণ অবশেষে এগিয়ে যাবেই
পুণ্য সে কক্ষনো হারবে না।

www.nagorikpathagar.org

ভালো মন্দ যাচাই করতে পারে যে

ভালোমন্দ যাচাই করতে পারে যে
সেইতো আসল মানুষ
তার আছে যে হুঁশ
উন্নত এক জীবন গড়তে
সত্য-ন্যায়ের ঝাণ্ডা ধরতে
বীরের মতো পারে সে।।

কোনটা মিথ্যা কোনটা সত্য
কোনটা যে বিষ কোনটা পথ্য
বাছাই করতে পারলো যে-জন
মানুষ সে নয় যেমন তেমন
কখনো কি হারে সে।।

অন্ধকারের বন্ধ দুয়ার
নয় সে কভু আলোর জোয়ার
রাত্রি দিবস এক কভু নয়
নিত্য সবার বিবেকই কয়
ললিত ঝংকারে যে।।

সততা আর অসততা
কে বলেছে একই কথা
পাগল ছাড়া এমন বাণী
ছড়ায় না কেউ সবাই জানি
তারে কি বেতারে রে।।

www.nagorikpathagar.org

ঈদ মোবারক, ঈদ মোবারক

ঈদ মোবারক, ঈদ মোবারক
খুশির জোয়ার এলো;
সকল মনের স্বপ্নের গান
পাখি হয়ে উড়ে গেলো।।

আকাশে হেসেছে চন্দ্রকাকলী
বাতাসে বইছে সুখের কাকলি
কাজল-কাজল
পায়রার দল
বিমল বারতা পেলো।।

আজকে প্রাণের আনন্দময়
অবারিত উত্থান
ত্যাগের তিথিতে কল-কল্লোল
জীবনের সন্ধান।

ভুলেছে সকলে বিভেদের ভুল
ফুটেছে বিপুল বিনয়ের ফুল
লজ্জায় মুখ লুকালো সহসা
বেদনারা এলোমেলো।।

www.nagorikpathagar.org

নামাজ পড়া যেমন ফরজ

নামাজ পড়া যেমন ফরজ
রোজা রাখা যেমন ফরজ
তেমনি ফরজ
যাকাত দেয়া, ওশর দেয়া ভাই;
নইলে কিন্তু পরকালে
নাই নিস্তার নাই।।

যাকাত-ওশর দান নয় ভাই
দরিদ্রদের ন্যায্য অধিকার
যাকাত-ওশর আদায় হলো
নিজের প্রতি নিজের সুবিচার;
হিসেব করে যাকাত-ওশর
তাইতো দেয়া চাই।।

যাকাত-ওশর-আদায় করা
মালের হেফাজত
করার সকল দায়িত্ব নেন
রব্বুল ইজ্জত।

মাহে রমজান শেষ-না-হতেই
দাও যাকাত দাও ওশর ভাইরা সব
দুখির ঘরে নামবে তবে
সুখের বিহান আলোময় উৎসব
ফেরেস্তারাও তখন তোমার
গাইবেরে সাফাই।।

www.nagorikpathagar.org

সেহরী খাওয়ার সময় ওঠার স্বভাব

সেহরী খাওয়ার সময় ওঠার স্বভাব-
রোজার পরেও ধরে
রাখো যতন করে
পড়ালেখার জন্য তবে
ঠিক সময়ের ঘুচবেরে অভাব।।

ভোর-রাত্রের নীরবতা
জ্ঞান-সাধনার তরে
আল্লা' তালার খাস রহমত
খাস বান্দার পরে-
হোক না সে ভাই খুব সাধারণ
কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র কিংবা নবাব।।

সেহরী খাওয়ার সময় ওঠার
স্বভাব সারা বছর
ধরে রাখতে পারলে জীবন
হবে আলোর বহর।

ঘুম তাড়ানোর কষ্ট যেনো
সইতে তুমি পারো
সেই কারণেই সেহরী খাওয়ার
নিষ্ঠা বাড়াও আরো;
রোজা রেখে পড়ে-লেখে
অলসতার শয়তানরে দাও জবাব।।

www.nagorikpathagar.org

নয় নয় নয় কোন কল্পনা

নয় নয় নয় কোনো কল্পনা
রমজানে নিলে পরিকল্পনা
সারা বছরের জীবন কাটবে
এ-চাষে সে-চাষে।

ভোররাত্রের জাগা-অভ্যাস
করতে চায় যে একাদশ মাস
সব আলস্য–সেহরী খাওয়ার
নিয়মে–সে নাশে।

রমজানে যে গো থাকে বিলকুল
এ-মাসের যতো কাজে মশগুল
ঈদের সকালে–
তার চেয়ে বেশি
কে হাসে? কে হাসে?

www.nagorikpathagar.org

পাঁচ বেলা এই ঢাকার শহর

পাঁচ বেলা এই ঢাকার শহর
সত্যি নিত্য দিন
আকাশ জুড়ে বাতাস জুড়ে
বাজায় খুশির বীণ;
সমবেত কণ্ঠে হাজার
ঘর-বাড়ি আর ভরায় বাজার
মুক্ত মুয়াজ্জিন।।

নামাজীরা পাঁচবেলা মসজিদে
মিটায় কাজের ফাঁকে মনের ক্ষিদে
সকল প্রাণের মধ্যে আরাম
বয় তুলনাহীন।।

আমার পূর্বপুরুষেরা
ভরিয়ে ত্যাগের বহর
পবিত্রতার সাধ-সাধনায়
গড়েছেন এই শহর।

সেই শহরকে রক্ষা করার
তওফিক দাও আল্লা' তোমার
জ্ঞান-গরিমা-শক্তি-সাহস
দাওগো সীমাহীন।।

www.nagorikpathagar.org

আটাশে অক্টোবরের কাহিনী

আটাশে অক্টোবরের কাহিনী
চোখ খুলে দিয়ে গেছে
শত্রু চেনার সকল কুটিল
বাধা তুলে দিয়ে গেছে।।

সাহসে ভরা সে দিন
রবে চির অমলিন
বিশ্বাসী প্রাণে অনুপ্রেরণার
আগুন ছড়িয়ে গেছে।।

আটাশে অক্টোবরের কাহিনী তপ্ত রক্ত মাখা
তবুও সম্ভাবনার দীপ্র দীপ্ত স্বপ্ন আঁকা।

রাতকে করেছে দিন
ভীরুকেও ভয়হীন
আঁধার বিনাশী আলোর অশেষ
দিশারী গড়িয়ে গেছে।।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী ব্যাংকের গান

দেশের সেবায় ইসলামী ব্যাংক
দশের সেবায় ইসলামী ব্যাংক
অনন্য পুণ্যের কামনায় বাসনায়
স্বতন্ত্র সুন্দর
ইসলামী ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ।।

আঁধারের বুক চিরে আলোর বন্যা এনেছে
সীমাহীন লালসায় কঠিন আঘাত হেনেছে
সততার প্রোজ্জ্বল নীলিমার ঠিকানায়
অতন্দ্র অন্তর
ইসলামী ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ।।

মানুষের দরবারে ন্যায়ের প্রদীপ জ্বালালো
বিবেকের তুলি দিয়ে মুক্তির ছবি আঁকালো
পবিত্র অর্থের বর্ণিল বারতায়
অনিন্দ্য প্রান্তর
ইসলামী ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ।।

ইসলামী বিধানের অপার মহিমা দিয়েছে
নানাবিধ কুৎসিৎ কুৎসার ঝুঁকিও নিয়েছে
সাম্যের, শান্তির নির্মল আশ্বাসে
বিশ্বাসে ভাস্বর
ইসলামী ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ।।

www.nagorikpathagar.org

তোমরা যারা বন্ধু ছিলে

[শহীদ বেলাল স্মরণে-১]

তোমরা যারা বন্ধু ছিলে
শহীদ শেখ বেলালের
জাগো, উঠে দাঁড়াও, সাক্ষী
দাও, বেলালের কালের।।

বলো, বেলাল মুমিন ছিলো
ছিলো সে মুহসিন;
কায়েম করতে চাইতো সে যে
ধরায় খোদার দ্বীন
সে ছিলো জ্বলন্ত আগুন-
শত্রু পঙ্গপালের।।

এবং বলো- তোমরা যারা
শুনেছো তার গান;
আল কোরানের আনতে বিজয়
বিলিয়ে দেবো প্রাণ
বদলা নেবো তার রুধিরের
যা হয় হোক কপালের।।

আরো বলো- স্বপ্ন যে-সব
দেখতো বেলাল ভাই
বাস্তবায়ন করবো সে-সব
সন্দেহ নাই, নাই
ছড়িয়ে দেবো চতুর্দিকে
আলো নও হেলালের।।

www.nagorikpathagar.org

যে পারো সে সান্ত্বনা দাও

[শহীদ বেলাল স্মরণে-২]

যে পারো সে সান্ত্বনা দাও
যে পারো সে একটু বুঝাও
বেলাল ভাইয়ের আব্বা-আম্মাকে–
তাঁরা যেনো বুক ভাসিয়ে
আর কভু না কাঁদে।।

তারা যেনো অধিক শোকে
না হয় পাথর কভু
তাদের ছেলে শহীদ বলে
কবুল করো প্রভু
ধৈর্য ধরার তাওফিক দাও
ইস্‌তিকামাত সাথে।।

শহীদ ছেলের গর্বিত মা
পিতার সম্মানও
হে দয়াময় অসীম অপার
তাদের করো দানও
পুত্র শোকের দাও বিনিময়
দুনিয়া-আখেরাতে।।

পুত্রবধূ, ছেলে-মেয়ে
আত্মীয়দের তবু
সংগ্রামীদের অগ্রপথিক
দাও বানিয়ে প্রভু;
দাও সাড়া দাও হে রহমান
তাদের ব্যথার ডাকে।।

www.nagorikpathagar.org

জীবন দিলেন শহীদ হলেন

[শহীদ বেলাল স্মরণে-৩]

জীবন দিলেন শহীদ হলেন
মোদের বেলাল ভাই
শপথ নিলাম সকলকিছু
বিলিয়ে দিয়ে তাই-
দ্বীন কায়েমের করবো যে লড়াই।।

শহীদ বেলাল প্রথম শহীদ
সংস্কৃতির অঙ্গনে
যেমন শহীদ শহীদ মালেক
শিক্ষা আন্দোলনের
এ-কথাটা ভুলেও কভু
যাবে না ভোলাই।।

বেলাল ভাইয়ের লক্ষ্য ছিলো
আল কোরানের সমাজ প্রতিষ্ঠার
এই কাজে তার যুক্ত ছিলো
অবিরাম ও ক্লান্তিহীন নিষ্ঠার
এই আলোময় পথের পথিক
হতে চাই সবাই।।

এক বেলালের রক্ত থেকে
জন্ম নেবে লক্ষ বেলাল ভাই
দেশ-জনতা আওয়াজ তোলে
অভিশপ্ত খুনীর রক্ষা নাই
খোদার দ্বীনের শত্রুদের আয়
সব শিকড় উপড়াই।।

www.nagorikpathagar.org

বিশ্বের নেতা

বিশ্বের নেতা, বিপ্লবী এক, স্বাধীনতাপ্রিয় জ্ঞানী;
ঐতিহাসিক তাঁর পরিচয় আল্লামা আফগানী।।

সিপাহসালার তিমির বিনাশী সেই
একাকী দাঁড়িয়ে ঈমানী উল্লাসেই–
ঘোষণা দিলেন, 'এক হও যতো
স্বাধীনতা সংগ্রামী।।

এক হও যতো পীড়িত মজলুমান
জেগে ওঠো যতো এখনো মুসলমান
এই অবেলায় উন্মুখ করো
জেহাদী জিন্দেগানী।।

পশ্চিমা ধ্যান-ধারণা মতবাদ
করেছে কেবলই দুনিয়াকে বরবাদ
বর্বরতার এ-যে অভিশাপ–
কভু নয় কল্যাণী'।।

কোরানের জ্ঞানে সেই যুগে তিনি
পৃথিবী-শ্রেষ্ঠ-খ্যাতিমান।
যিনি একক, চিরনিরাপস
সত্যের সন্ধানী।।

চিরবিদ্রোহী, মনীষী বিরল
পরিণত, মহাপ্রজ্ঞা-প্রবল;
মানবিকতার উদ্ধার কাজে
অশেষ অগ্রগামী।।

www.nagorikpathagar.org

গা'র জোরে নিয়ে যাবে সবকিছু

গা'র জোরে নিয়ে যাবে সবকিছু
লুট-পাট করে খাবে সবকিছু
ওলট-পালট করতে চাইছে
তল্পীবাহীরা তাই
রুখবার কেউ নাই;
সর্বনাশের ঝন্‌ঝা বইছে
শন-শন-শাঁই-শাঁই।।

চোর জেগে জেগে সিঁদ কাটে হায়
সাধুরা মরণ ঘুমে
ঘরের মৌল মালিকরা আজ
অচেতন নিজ ভূমে
পাহারাদাররা নেশা করে বুঁদ-
নাই কারো আইঢাই।।

ওদিকে বিদেশী শকুনেরা ওড়ে
গলিত লাশের খোঁজে
শান্তির প্রিয় পারাবত যতো
শংকায় চোখ বোঁজে;
মানচিত্রের পাতা ছিঁড়ে করে
হায়নারা খাই খাই।।

মিথ্যাবাদের দাপট বেড়েছে
সত্যবাদীরা চুপ
দেশের পক্ষ দ্বিধাবিভক্ত-
খুঁড়ছে নিজেরা কূপ;
কি জানি কখন প্রিয় স্বাধীনতা
হয়ে যায় ছিনতাই।।

www.nagorikpathagar.org

জাগো যৌবন অমিত শক্তি
বাঁধনহারারা জাগো
বাংলাদেশের মুক্তিপাগল
আগলভাঙারা জাগো
শত্রুর চাল করি বানচালঃ
ঐক্যের গান গাই।।

www.nagorikpathagar.org

দৈনিক সংগ্রাম

দিন যতো যায় ততো
অভগ্ন অবিরাম
সংহত গতি পায় উদাত্ত সংগ্রাম
সংগ্রাম, সংগ্রাম, দৈনিক সংগ্রাম।।

সত্যের পক্ষের অনন্ত সত্র-
প্রত্যয়-প্রদিষ্ট এই মুখপত্র;
এই মহাউদ্যোগ
প্রবুদ্ধ যোগাযোগ
চিরায়ত চেতনার উপচিত আনজাম-
সংগ্রাম, সংগ্রাম, দৈনিক সংগ্রাম।।

মহাজনতার এই নিয়মিত আস্থা
প্রতিদিন সরাসরি সৎ-পরামর্শ
অথবা সে খবরের শেষ-তক-ভরসা
শেষ-তক-মূল-দিশা প্রাপ্তির হর্ষ।

শুধু এক দৈনিক নয় এ যে কখনো
বিপ্লবী সংগী এ সংগ্রামী স্বজনও;
জাতির এ ধ্রুব দিঠি
স্বদেশপ্রেমের চিঠি
কাঙ্ক্ষিত বিজয়ের বারতা আগাম-
সংগ্রাম, সংগ্রাম, দৈনিক সংগ্রাম।।

www.nagorikpathagar.org

ইহুদীরা সময়ের শত্রু

ইহুদীরা সময়ের শত্রু
ইহুদীরা প্রকৃতির দুশমন
ফসলের ক্ষেতে ওরা
পঙ্গপালের মতো সর্বধ্বংসী উল্লম্ফন
ইহুদীরা প্রকৃতির দুশমন।।

জীবনের গতিপথে ওরা প্রতিবন্ধক
সুস্থ সমাজ দেহে ওরা আনে ভয়াবহ
মারি আর মহামারি ভয়ানক
ওরা করে সংহার এই পৃথিবীর
যতো ফুল যতো পাখি অগণন।।

ইহুদীরা বিশ্বাস কেড়ে নেয়
বিশ্বাস কেড়ে নিয়ে
বিনিময়ে বিষনীল
বিষাক্ত নিঃশ্বাস ছেড়ে দেয়।

প্রগতির নামে ওরা ডেকে আনে দুর্গতি
ডেকে আনে জীবনের সর্ব বিনাশী বান
পোষে মনে দুরাত্মা দুর্মতি
দূষিতই করে ওরা বায়ুমণ্ডল
সবকিছু করে যায় লুণ্ঠন।।

www.nagorikpathagar.org

ফারাক্কা বাঁধ দিয়েছিলো যারা

ফারাক্কা বাঁধ দিয়েছিলো যারা
তারাই দিচ্ছে টিপাইমুখ;
কখনো সহ্য হয় না তাদের–
বাংলাদেশের শান্তি সুখ।।

যতোদিন গাছ-গাছালী থাকবে
মাঠ-ঘাট-বিল সবুজ বন–
ততোদিন ওরা চালিয়ে যাবেই
তামা বানানোর হীন-আচরণ!
গঙ্গাভক্ত পূজারীরা কভু
চাইবে না এখানে সোনা ফলুক।।

আমাদের নদী মরুভূমি হোক
ফসলশূন্য হোক খামার
অভাবে-অভাবে, মঙ্গায় হায়
হোক শেষ সব সবহারার–
আর চায় ওরা না খেয়ে, না খেয়ে–
দেশের সকল লোক মরুক।।

ভাতে ও পানিতে ওরা আমাদের
মারতে চাইছে নিত্যদিন
মূলত চাইছে অবশেষে প্রিয়
আজাদীও যেনো হয় বিলীন;
কলে-কৌশলে চাইছে কেবল
গোলাম বানিয়ে ভাঙতে বুক।।

www.nagorikpathagar.org

গানের শহর প্রাণের শহর

গানের শহর প্রাণের শহর
কুমিল্লা কুমিল্লা।।

সারা শহরজুড়ে আছে সবুজ নিবিড়তা
সবগুলো প্রাণ জুড়ে আছে অবুঝ নিবিড়তা
এদিক সেদিক যেথায় যাবে
মাঠে ঘাটে পুকুর পাবে
মিষ্টি শহর দিচ্ছে মিছিল
গ্রামের সাথে পাল্লা।।

এক–পা দু'পা এগিয়ে গেলে
সবুজ মাঠের দেখা মিলে
ময়নামতির পাহাড় মিলে
বাজারঘাটে কেবল শিশুর
ব্যস্ততা হই-হল্লা।।

www.nagorikpathagar.org

এতো যে হিংসা এতো বিদ্বেষ

এতো যে হিংসা এতো বিদ্বেষ
এতো পরশ্রীকাতরতা
দিকে দিকে এতো স্বার্থপরতা
এতো সন্দেহ প্রবণতা;
নাকি এইসব প্রলয় ধ্বংস
ঘটবার ঠিক পূর্ব অংশ
বিবেকবিহীন বিবেচনাহীন
ঘৃণ্য প্রগলভতা।।

পরচর্চার বন্যায় দেশ
ভেসে যায় রাতদিন
সৎ-চরিত্র হননের কাজ
চলেছে বিরামহীন;
অন্যকে খুব ছোট করবার
নিজের অহং তুলে ধরবার
চৌদিকে এতো কি যে ভয়ানক
মত্ত উন্মাদতা।।

ঔদ্ধত্যের দৃশ্য কেবল
বেড়েই চলেছে আজ দেখি
আচরণে ফুটে ওঠে বেয়াদবী–
বড়দের দাম নাই একি!

মিথ্যুকদের এতো যে দাপট
তারা যে ক্ষমতাধর–
বিষধর কালো গোখরা সাপের
চেয়েও ভয়ংকর;
শেষ করে দেয় ছোবলে-ছোবলে
অন্যকে তারা কোঁদলে-কোঁদলে।
ঘোর অপরাধ করাটাকে তারা
ভাবে যে দক্ষতা।।

www.nagorikpathagar.org

মনের পর্দা হলেই তবে

মনের পর্দা হলেই তবে
বাইরের পর্দা হয়
মন পবিত্র হলেই যে হয়
বাইরে পুতময়।।

যা ভালো তার সবই ভালো
আলোর আগা-গোড়াই আলো
প্রগতি নেই গতিও নেই
উলঙ্গপনায়।।

নারীর সেরা উপমা যে
আয়শা ফাতেমা
পর্দার চির অনুভূতি
পর্দার চেতনা।

গাছের শোভা পত্র যেমন
নারীর শোভা পর্দা তেমন
পর্দানশীন নারীরাই
নারীর আনে জয়।।

www.nagorikpathagar.org

গণতন্ত্রের সংজ্ঞায় রাজনৈতিক

গণতন্ত্রের ধারণায় জনগণ
শাসিত নয়তো–
শাসক যে আগুন।।

অথচ এখন জনগণ দাস–
পদসেবী জনগণ
সেবকেরা অধিনায়কের বেশে
পিষে চলে গণমন;
নির্বাক হয়ে পড়ে রয় দেশ
আতঙ্কে সারাক্ষণ।।

গণতন্ত্রের সংজ্ঞায় নাগরিক
মূলত রাজাই
দেশের মূল মালিক।

একনায়কের তাই শুধু ভয়–
নাগরিক অধিকার
ফিরে যদি পায় দেশের মানুষ
বিচার করবে তার;
তাই সে চায় না অবাধ-সুষ্ঠু–
গুণস্থ নির্বাচন।।

www.nagorikpathagar.org

কিশোরকণ্ঠ

কিশোরকণ্ঠ, কিশোরকণ্ঠ
কিশোরকণ্ঠ পত্রিকা–
গান-কবিতা-পদ্য দিয়ে
গল্প-ফিচার-গদ্য দিয়ে
তোমার-আমার সবার মনে
আনলো নিবিড় স্বস্তিকা।।

এমন কণ্ঠ কার আছে আর
এমন ভঙ্গী কার বা বলার
এমন করে কে আর তুলে
ধরে আসল সত্যি যা।।

কিশোরকণ্ঠ, কিশোরকণ্ঠ
আনলো যৌথ জাগরণ–
আনলো শিশু-কিশোর-মনে
নতুন স্বপ্ন-শিহরণ।

আশার আলো সবখানে আজ–
হাসবে আবার দেশ ও সমাজ
নৈতিকতার মুক্তধারায়;
নয় এ কেবল বক্তৃতা।।

www.nagorikpathagar.org

কাজের কাজী-১

কাজের সময় কাজীরে ভাই
কাজ ফুরালেই পাজী
ওই   পাজী হতে কাজের সময়
কয়জনে হয় রাজি।।

নিজে বাঁচলে বাপেরই নাম-
আজকাল এই তত্ত্বেরই দাম
তাইতো বাপের কে খোঁজ রাখে
তাইতো মাকে কে আর ডাকে
হোক না হাজী-গাজী।।

পারের সময় মাঝিরে ভাই
পারের সময় মাঝি
ওই   পারের পরেই পারের কড়ি
নিয়ে ধাপ্পাবাজি।

নিজের খেয়ে বনেরই মোষ
তাড়ানো আজ সত্যিই দোষ
তাইতো বনের মোষেরা সব
গাঁও-নগরে করে উৎসব-
ছাগল ধরছে বাজি।।

www.nagorikpathagar.org

কাজের কাজী-২

সত্যিকারের কাজের কাজীর
দোষ-বদনাম হবেই
অকর্মণ্য অভিযোগকারী
কেয়ামত তক রবেই।।

কাজের মানুষ কাজ করে যায়
অকাজের লোক দোষ ধরে যায়
আদিকাল থেকে এ-বদ রসুম
চালু যে রয়েছে ভবেই।।

দুর্ভাগাদের থাকে না কাজের কপাল
অলসতা নিয়ে পড়ে থাকে তারা-
ঘোচে না দুখের অকাল।

কাজের কাজীরা হয় যে অমর
চালিয়ে নিত্য কাজের সমর
যেখানে-সেখানে তবু নিন্দুক
যা-কিছু-কবার কবেই।।

www.nagorikpathagar.org

পাখিও ডাকতে ডাকতে

কোন কোন কণ্ঠস্বরে পাখিও
ডেকে ওঠে
কেঁদে ওঠে এক ঝাঁক বাতাসের ঢেউ
গেয়ে ওঠে অরণ্যের
হরিভাত পাতারা

কোন কোন কণ্ঠস্বর কি
নাফ নদীর নীরব বহতার মত
নির্জন কলরোলের মত
নিস্তব্ধ কথকতার মত
সন্ধ্যার অন্ধকারের উল্লাসের মত
নিগূঢ় আহ্বান রেখে যায়...
কোন কোন কণ্ঠস্বরে পাখিও
ডাকতে ডাকতে কেঁদে ওঠে...

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

সূর্য ওঠার আগে

[অগ্রন্থিত]

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

সূর্য ওঠার আগে

মতিউর রহমান মল্লিক

www.nagorikpathagar.org

প্রসঙ্গ কথা

কবি মতিউর রহমান মল্লিক ছোটদের উপযোগী গান-কবিতাও লিখেছেন প্রচুর। শিশু–কিশোরদের প্রতি তাঁর আলাদা দরদ লক্ষ্য করা যায়। 'সূর্য ওঠার আগে' পাণ্ডুলিপির গানগুলোতে সেটির প্রমাণ রেখেছেন। এ গানগুলো বিভিন্ন সংকলনে প্রকাশ পেয়েছে। তবে গ্রন্থ আকারে প্রকাশ পায়নি ইতোপূর্বে। এখানের অধিকাংশ গানে তিনি নৈতিকতার সবক দিয়েছেন। মিথ্যাবাদীর বন্ধু হতে নিষেধ করেছেন। কারো সাথে দেখা হলে সালাম দেওয়ার নসিহত করেছেন। মনের ভেতরের সকল কপটতা দূর করবার আহ্বান জানিয়েছেন সবার কাছে। অন্যের উপকার করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। ছোট্ট বন্ধুদেরকে নিজের কাজের প্রতি মনোযোগী ও আন্তরিক হবার ব্যাপারে বিশেষ তাগিদ দিয়েছেন। শিশুদের সৃজন ও মনন বিকাশের উপযোগী অসম্ভব সুন্দর সুন্দর কথামালা উপহার দিয়েছেন।

পাণ্ডুলিপিটি তৈরি করার ক্ষেত্রে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন কবি ইয়াসিন মাহমুদ। এটি কবির সুপরিকল্পিত পাণ্ডুলিপি না হলেও, কবির স্বপ্ন ছিলো ছোটদের গান নিয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রকাশের। কবির সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে উপযুক্ত গানগুলোকে একত্র করে পাণ্ডুলিপিটি প্রস্তুত করা হয়। পাণ্ডুলিপিটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন মোমিন উদ্দীন খালেদ।

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

কেউ ছুঁতে চায় তারার আলো/ ১৬৩
আয়রে আয় স্ব-বুঝ অবুঝ/ ১৬৪
আম্মা বলেন ঘর ছেড়ে তুই/ ১৬৫
মিথ্যাবাদীর বন্ধু হয়ো না/ ১৬৬
হঠাৎ শাপলা দেখে থমকে দাঁড়াই/ ১৬৭
দু'চোখ ভরে দেখি তবু তৃষ্ণা মেটে না/ ১৬৮
যে কোনো কাজ করো না ভাই/ ১৬৯
কারোর সাথে দেখা হলে/ ১৭০
মনের মধ্যে থাকে যদি/ ১৭১
সূর্য ওঠার আগে ওঠো/ ১৭২
পরের জন্যে করলে কিছু/ ১৭৩
নিয়ম মতো চলার ভেতর/ ১৭৪
গালি দিয়ে কথা-বার্তা বলে মুনাফিক/ ১৭৫
সাহস আছে বলেই আমি/ ১৭৬
নিজের দাঁতটা নিজেই মাজো/ ১৭৭
গাছের দিকে তাকাও যদি/ ১৭৮
বই পড়, বই পড়, বই পড়রে/ ১৭৯
খোটা দিয়ে কথা বলা ঠিক নয়/ ১৮০
চরিত্রবান মানুষ ছাড়া বন্ধু বাছাই করবে না/ ১৮১
পরীক্ষা হয় যতোই কঠিন/ ১৮২
খারাপ কথাটা না বলাটাও/ ১৮৩

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

কেউ ছুঁতে চায় তারার আলো

কেউ ছুঁতে চায় তারার আলো
কেউ ছুঁতে চায় চাঁদ
কারোর আবার মনের মধ্যে
মঙ্গল গ্রহের সাধ
আর আমার স্বপ্ন শুধু
সেই সোনার গাঁয় ঘুমিয়ে যেথায়
রাসূল মোহাম্মাদ।।

ও মেঘের নাও দাও কথা দাও
আমায় সঙ্গে নেবে
একটি বারে হেরার ধারে
সত্যি পৌঁছে দেবে
বয়ে শন শন হয়ে উন্মন
পেরিয়ে প্রাণপণ সকল বাঁধ।।

ও পুবাল বাও যাও নিয়ে যাও
কোন পাখির সাথে
দ্বীনের বন্ধু প্রাণের সিন্ধু
নবীর মদিনাতে
বয়ে শন শন হয়ে উন্মন
পেরিয়ে প্রাণপণ সকল বাধ।

ওগো পাখি নাওগো ডাকি
গানের সুরে সুরে
ভালোবেসে নবীর দেশে
হোক না যতই দূরে
হয়ে উচ্ছল উড়ে চঞ্চল
পেরিয়ে উত্তাল বিসম্বাদ।।

www.nagorikpathagar.org

আয়রে আয় স্ব-বুঝ অবুঝ

আয়রে আয় আয়রে আয়
দলে-দলে আয় স্বদলে আয়
আলোর অদল-বদলে আয়
স্ব-বুঝ অবুঝ সকলে আয়
আয় আয় আয়।।

পাখিরা প্রশাখা নাড়ালে আয়
ভ্রমর দু'হাত বাড়ালে আয়
ফুলের পাতার আড়ালে আয়।।

মাঠের প্রভাত বেলাতে আয়
ভোরের হাওয়ার খেলাতে আয়
প্রাণের মুক্ত মেলাতে আয়
আয় আয় আয়।।

আকাশের ডাকে সাড়া দিয়ে আয়
সিক্ত শিশিরে পাড়া দিয়ে আয়
সূর্য ওঠার তাড়া দিয়ে আয়।

দূর-দিগন্ত রাঙাতে আয়
উন্মন মন চাঙাতে আয়
জীবনের ঘুম ভাঙাতে আয়
আয় আয় আয়।।

www.nagorikpathagar.org

আম্মা বলেন ঘর ছেড়ে তুই

আম্মা বলেন ঘর ছেড়ে তুই
যাসনে ছেলে আর
আমি বলি খোদার পথে
হোক এ জীবন পার।।

নিজের জন্য করলি না তুই কিছু
আল্লাহ জানেন ঘুরিস কাদের পিছু
কী যে করিস কোথায় থাকিস
বুঝিনে কারবার।

যে পথ ধরে চলতে বলেন
আল্লাহ কাদের গনি
আপনি কি মা নিষেধ করেন
বলুন না আজ শুনি।।

আল কোরানের আহ্বানেও মা
ঘর ছেড়ে কি বাহির হবো না
চোখ মুছে মা চুপ করে যান
ফুরায় কথা তার
একটু পরে কেঁদে বলেন
হে খোদা নাও ভার।।

www.nagorikpathagar.org

মিথ্যাবাদীর বন্ধু হয়ো না

মিথ্যাবাদীর বন্ধু হয়ো না
হয়ো না সঙ্গী তার
তাহলে হায়রে তোমার জীবন
হয়ে যাবে ছারখার।।

সদাই মিথ্যা বলতে পারে যে
সব অন্যায় করতে পারে সে
ধীরে ধীরে তার শেষ হয়ে যায়
লেশটুকু লজ্জার।।

'বাঘে খেয়ে গেলো, বাঘে খেয়ে গেলো'
বলতো সে এক রাখাল
চিৎকার শুনে আসতো চাষীরা-
মিথ্যায় হতো নাকাল।

তারপর বাঘ আসলো যে-দিন
কেউতো এগিয়ে এলো না সে-দিন-
বাঘ খেলো তারে, শাস্তি পেলো সে
বানিয়ে মিথ্যা বলার।।

সকল পাপের উৎস মিথ্যা
সব খারাপের মূল
মিথ্যাবাদীরা নিশ্চিতভাবে
হারায় যে-দুই-কূল।

একটি মিথ্যা বললে তখন
হাজার বলার হয় প্রয়োজন;
এইভাবে শেষে শুরু হয়ে যায়
মিথ্যার কারবার।।

www.nagorikpathagar.org

হঠাৎ শাপলা দেখে থমকে দাঁড়াই

হঠাৎ শাপলা দেখে থমকে দাঁড়াই
প্রজাপতি উড়ে যায় দু'হাত বাড়াই।।

কাজল ঝিলের বুকে
কি যে খুঁজে মরি সুখে
কলমি ফুলের মুখে
আনমনা উদাসীন নিজেকে হারাই।।

এক ঝাঁক বক দূরে যেই দেখলাম
মনের পাতায় বুঝি গান লেখলাম।

চমকে সুনীলে দেখি
ছুটেছে মেঘেরা একি
ভাবি না করছে যে কি
একদম উড়ে যায় পাখনা ছাড়াই।।

www.nagorikpathagar.org

দু'চোখ ভরে দেখি তবু তৃষ্ণা মেটে না

দু'চোখ ভরে দেখি তবু তৃষ্ণা মেটে না
এই আমাদের আকাশ নদী
ক্ষেত খামার আর গাঁ।।

কোথাও টিয়ে ধানের মাঠে
হারালো হঠাৎ
পায়ের কাছে ঢেউয়ের দোলা
ছলাৎ ছলাৎ
মন্দ মৃদু হাওয়ার পরশ
জুড়ায় পরান গা।।

গুন টেনে যায় নায়ের মাঝি
কণ্ঠে ভাটিয়ালি
আস্তে ধীরে যেতে যেতে
চায় ফিরে বাওয়ালী।

চরের বুকে শালিক নামে
ঝাঁকের পরে ঝাঁক
সাদা বকের দল উড়ে যায়
বাঁক পেরিয়ে বাঁক
দ্বন্দ্ব ভুলে ছন্দ তোলে
ছোট্ট চোরেলা।।

www.nagorikpathagar.org

যে কোনো কাজ করো না ভাই

যে কোনো কাজ করো না ভাই
যে কোনো কাজ করো
তা যেনো হয় সবার চেয়ে
সবচেয়ে সুন্দর।।

হোক না সেটা পড়ালেখা
রঙের ভাষায় ছবি আঁকা
হোক না সেটা সামান্য কাজ
কিংবা মহত্তর।।

যেথায় তুমি থাকো না ভাই
কাছে কিবা দূরে
কাজের চিন্তা রাখবে মাথায়
মনের মুকুরে।

হোক না সেটা চড়ুই ভাতি
খেলা নিয়ে মাতামাতি
হোক না সেটা কাপড় কাঁচা
বাজার করাই ধরো।।

www.nagorikpathagar.org

কারোর সাথে দেখা হলে

কারোর সাথে দেখা হলে
মিষ্টি করে হেসো
হাত বাড়িয়ে সালাম দিয়ে
একটু ভালোবেসো।।

যারা গোমড়া মুখে রাস্তা চলে
তাদের মতো তুমি নাইবা হলে
মিশবে যখন কারোর সাথে
হৃদয় দিয়ে মেশো।।

যদি তোমার আচার–আচরণে
সদা আঘাত লাগে কারও মনে
ব্যর্থ তোমার জীবন-মরণ
শুরু এবং শেষও।।

www.nagorikpathagar.org

মনের মধ্যে থাকে যদি

মনের মধ্যে থাকে যদি
অহংকার এক কণা
মনে রেখো সে কখনো
বেহেশতে যাবে না।।

আগুন নিয়ে খেলা করা
যেমন ভালো নয়
অহংকারও ঠিক তেমনি
ভয়ংকরই হয়
অহংকারই ধ্বংসের মূল
জানে সকল জনা।।

যতোই দাপট দেখাক অহংকারী
আজ বাদে কাল শেষ হবে তার
সকল জারিজুরি।

আয় না রে তাই শপথ করি
বাঁচবো যতো দিন
মনের ভেতর রাখবো না ভাই
অহংকারীর চিন
করবো খতম অহংকারের
সকল সম্ভাবনা।।

www.nagorikpathagar.org

সূর্য ওঠার আগে ওঠো

সূর্য ওঠার আগে ওঠো
নইলে কিন্তু সূর্য ওঠা
দেখতে তুমি পাবে না
হরেক রকম ভোরের পাখির
প্রাণ খোলা গান কিচিরমিচির
আদৌ শোনা যাবে না।।

মুয়াজ্জিনের আযান দেয়া হলো
খোকা খুকু এবার দু'চোখ খোলো
আড়মোড়া দাও একটু বসে
কলমা পড়ে নাও হরষে
অযু করার আগে কিন্তু কিছুই তুমি খাবে না।।

ভোর বিহানে নামাজ পড়া কি যে
ভীষণ মজার নামাজ পড়ে নিজে
নাও চেখে নাও স্বাদ তুমি
ঝেড়ে ফেলে সব আলসেমি
কোরআন পড়ার আগে কিন্তু
কোনো গানই গাবে না।।

খুলিস না চোখ আরেকটু চোখ বোজ
ভোর বেলাতে কুমন্ত্রণা রোজ
শয়তানই দেয় কায়দা করে
নানান ছলে গায়ে পড়ে
তবু তুমি ঘুমে কিন্তু মোটেই থাকতে চাবে না।।

www.nagorikpathagar.org

পরের জন্যে করলে কিছু

পরের জন্যে করলে কিছু
নিজের জন্যে করা হয়
আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকে
যায় পাওয়া তার বিনিময়।।

গরিব দুখীর মায়ায় যদি কাঁদে তোমার মন
তোমার জন্যে অন্যেরও মন কাঁদবে রে তখন
তুমি হৃদয়হীন হলে যে পাবে না অন্য হৃদয়।।

আরেকজনের শোকের তাপে সঙ্গী হলে ঠিক
তোমার শোকের সঙ্গী পাবে এটাই স্বাভাবিক
তুমি সদয় হলে পাবে অপরকেও যে সদয়।।

অন্য কারো জন্য তুমি করলে মোনাজাত
তা অবিকল তোমার তরে তোমার তোলা হাত
পরের জন্য যা বিলাও তা সব তোমারি সঙ্গে রয়।

মুরব্বিদের কথা শুনলে তোমার কথা যে
একদিন ঠিকই তোমার কথা শুনবে সকলে
শিক্ষককে ভক্তি করলে আসল ভক্তি পাওয়া যায়।।

শ্রদ্ধা যদি করো তুমি অন্য সবাইকে
অন্যরা সব শ্রদ্ধা তখন করবে তোমাকে
অন্যের ভালো চাওয়া হলে নিজের ভালো চাওয়া হয়।।

www.nagorikpathagar.org

নিয়ম মতো চলার ভেতর

নিয়ম মতো চলার ভেতর লুকিয়ে আছে গতি
অনিয়মে লাভ কিছু নেই আছে কেবল ক্ষতি।।

নিয়ম মেনে চলে যারা অনেক বড় হয় যে তারা
জীবনটাকে নেয় গুছিয়ে তারই অসঙ্গতি।।

নিয়ম মতো সূর্য ওঠে নিয়ম মতো ডোবে
তাইতো দিনের দীপ্তি সে দেয় আলোরই গৌরবে।

জোয়ার ভাটা নিয়ম মানে তাই বয়ে যায় তীব্র টানে
তুমিও নিয়ম মেনে সদাই সব কাজে হও ব্রতী।।

www.nagorikpathagar.org

গালি দিয়ে কথা-বার্তা বলে মুনাফিক

গালি দিয়ে কথা-বার্তা বলে মুনাফিক
কথায় কথায়-গালি গালাজ করে যে দাম্ভিক।।

মানুষকে যে মানুষ ভাবে না
তারে তুমি ভদ্র পাবে না
হোক না সে ভাই পদস্থজন কারখানার মালিক।।

ধমক ছাড়া কয় না কথা যে
সত্যিকারের সঙ্গী পায় না সে
বদমেজাজের মানুষ কভু হয় না নান্দনিক।।

গোখরা সাপের মতোন স্বভাব যার
সুখের জীবন হয় না কভু তার
কারোর দোয়া পায় না সে যে সত্যি বাস্তবিক।।

www.nagorikpathagar.org

সাহস আছে বলেই আমি

সাহস আছে বলেই আমি
পাল্লা দিতে আসি
জয় পরাজয় আসল তো নয়
অংশ নেয়ার আনন্দে তাই
বাজাই মনের বাঁশি।।

সবাই কি আর লড়াই করতে জানে
লড়াই করার শক্তি রাখে প্রাণে?
ইচ্ছে আমায় ডাক দিয়ে যায়
স্বপ্ন রাশি রাশি।।

বনের বাঘে কম মানুষে করতে পারে আহার
মনের বাঘে অনেক মানুষ খেয়ে করে সাবাড়।

দ্বিধার মধ্যে পড়ে থাকে যারা
দ্বন্দ্ব এসে করবে তাদের সারা
তাইতো মুক্ত মনের পাখায়
উড়তে ভালোবাসি।।

www.nagorikpathagar.org

নিজের দাঁতটা নিজেই মাজো

নিজের দাঁতটা নিজেই মাজো
তুমি কি আর ছোট্ট আজও
নিজের ইচ্ছায় সুন্দর করে
করো সকল কাজও।।

নিজের খাবার নিজেই খাও
বলা যেনো লাগে না
ভুলে তুমি তা খেও না
যেটা তোমার ভাগে না।
নিজের পোশাক নিজেই পরো
সকল কায়দা রপ্ত করো
বিদ্যালয়ে যাবার আগে
নিজে নিজেই সাজো।।

নিজের ভালো নিজেই বোঝা চাই
ন্যায় সততা সঠিক পন্থা
চিরকালের উত্তম যা তা
দিনানুদিন কষ্ট করে
নিজেই খোঁজা চাই।

নিজের স্বভাব নিজেই গড়ো
আল কোরআনের আলোকে
মন্দ যা সব দূর করে দাও
গ্রহণ করো ভালোকে।
নিত্য আচার আচরণে
জাগাও আশা সবার মনে
তোমায় দেখে শিক্ষা নেবে
দুষ্ট ফেরেব্বাজও।।

www.nagorikpathagar.org

গাছের দিকে তাকাও যদি

গাছের দিকে তাকাও যদি
বাড়বে চোখের দীপ্তি
হৃদয়টা তরতাজা করার
বাড়বে অনুরক্তি।।

[তার] দেখো ফুলের রঙ
[তার] পাতার কাজ এবং
মহান শিল্পী খোদার প্রতি
বাড়বে বিমল ভক্তি।।

গাছের আছে প্রতিবেশীর
জন্য অশেষ মায়া
তাই সে বাড়ায় অসংখ্য হাত
ডালের মতো কায়া।

[তার] বেড়ে ওঠা দেখো
[তার] ধৈর্য ধরা শেখো
সারাজীবন যায় সয়ে সে
ঝড়-খরার বিরক্তি।।

www.nagorikpathagar.org

বই পড়, বই পড়, বই পড়রে

বই পড়, বই পড়, বই পড়রে
বই পড়ে জ্ঞানী হও
যোগ্য সম্মানী হও
বই পড়ে উন্নত জীবন গড়।।

বই হল জগতের সেরা বন্ধু
বই হল জীবনের শ্রেষ্ঠ সাথী
বই ভাঙে অন্ধ বন্ধ দুয়ার
বই জ্বেলে দেয় প্রাণে আলোর বাতি।

বই পড়া মানুষেরা দুঃখ মুছায়
গরিব ও ফকিরের অভাব ঘুঁচায়
বই পড়া মানুষেরা দুনিয়া চালায়
বুকে বুকে স্বপ্নের প্রদীপ জ্বালায়।

পড় আর পড় তুমি যত পার পড়
ন্যায়ের শিক্ষা নিয়ে আপনারে গড়
অথৈ যোগ্য হয়ে জগৎ বাঁচাও
সিংহ বাঘের পাল দু'হাতে নাচাও।

পড়বে যতই তুমি জানবে ততই
বাধা ভয়ে পার হবে বীরের মতই
তাই গিয়ে হাতে বই এখনি ধরো
করো নাকো নয়-ছয়-সাত-সতেরো।

মানুষ মানুষ হয় বই পড়ে পড়ে
বই পড়ে গড়ে সৎ জীবন চরিত
দেশের দশের তরে করে কল্যাণ
এবং সফল করে স্বপ্নচারী।

www.nagorikpathagar.org

খোটা দিয়ে কথা বলা ঠিক নয়

খোটা দিয়ে কথা বলা ঠিক নয়
খোটা দিয়ে কথা বলা মানুষের স্বভাবের
ভালো কোন দিক নয়।।

নিজের ভুলের খোঁজ রাখে না যে সাধারণ
অপরের ভুল ধরে বেড়ায় সে অকারণ
খোটা দেয়া লোকজন কারো সংশোধনের
তরে আন্তরিক নয়।।

উত্তম মানুষেরা খোটা দিয়ে কথা বলে না তো কখনো
যতো হোক রাগ তবু সামলিয়ে নেয় মুখ খুব তখনো।

খুঁতখুঁতে স্বভাবের কাজ হলো খুঁত ধরা
খিটখিটে মেজাজের ভাব খেপামি করা
যাই বলো তাই বলো মানসিক দিক থেকে
এরা স্বাভাবিক নয়।।

www.nagorikpathagar.org

চরিত্রবান মানুষ ছাড়া বন্ধু বাছাই করবে না

চরিত্রবান মানুষ ছাড়া বন্ধু বাছাই করবে না
আদর্শবান সঙ্গী ছাড়া এদিক ওদিক ঘুরবে না।।

সৎ সুন্দর সঙ্গ যেনো একটি গোলাপ বন
গোলাপ বনের হৃদয় জুড়ে ভ্রমর গুঞ্জরণ
তাইতো বলি অসৎ সাথীর সঙ্গে থেকে মরবে না।।

চোরের সাথে মিশলে চুরি করার স্বভাব হয়
নেশাখোরের বন্ধুদেরও নেশাখোরই কয়
মনের ভুলেও খারাপ লোকের পাল্লায় কভু পড়বে না।।

পুণ্যবানের সঙ্গে যদি কাটাও একটুক্ষণ
সাদামাটা শতাব্দী তার কাছে সাধারণ
মিথ্যাবাদীর মিষ্টি কথায় মোটেও কভু ভুলবে না।।

www.nagorikpathagar.org

পরীক্ষা হয় যতোই কঠিন

পরীক্ষা হয় যতোই কঠিন
পুরস্কার হয় ততোই মূল্যবান
দুঃখের দিন শেষ হলে তাই
গলা ছেড়ে গাই সবাই সুখের গান।।

পরিশ্রমীর ঘামের গন্ধ
রচনা করে নতুন ছন্দ
অলসতা আনে অপমান শুধু
জীবনকে করে ম্লান।।

পরীক্ষা দিলে যোগ্যতা বাড়ে
সংশয় ঠিক কমে যায়
থেমে থাকা নদী হঠাৎ যেনো গো
জোয়ারের গতি পায়।

কষ্ট করে না যে সব রত্ন
নেয় না নিজের মেধার যত্ন
অকালেই হায় ডুবে যায় তার
স্বপ্নের সাম্পান।।

www.nagorikpathagar.org

খারাপ কথাটা না বলাটাও

খারাপ কথাটা না বলাটাও
খারাপ কাজটা না করাটাও
বিরাট একটা সফলতা।
মিথ্যার পথে না চলাটাও
অন্যায় পথ না ধরাটাও
বিরাট কথা, বিরাট কথা, বিরাট কথা।।

খারাপ কাজটা করতে দারুণ স্বাদ লাগে
এই কাজে কেউ একটানা দিন রাত জাগে
কিন্তু খারাপ বর্জন করা
সৈনিকতা, সৈনিকতা, সৈনিকতা।।

খারাপ ব্যাপারে সদাসর্বদা
খারাপ চিন্তা কাজ করে,
খারাপ ভাবনা সবকিছুতেই
খামাখা কু-আন্দাজ করে।

মন্দ কাজের সঙ্গী হওয়া খুব সহজ
এমনি এমনি এসব কাজে বাড়ে গরজ
কিন্তু মন্দ ছাড়তে পারাটা
সাহসিকতা, সাহসিকতা, সাহসিকতা।।

[হযরত আলী (রা.) একটি বক্তব্য অবলম্বনে]

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

ভেজাল সমাচার

[অগ্রন্থিত]

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

ভেজাল সমাচার

মতিউর রহমান মল্লিক

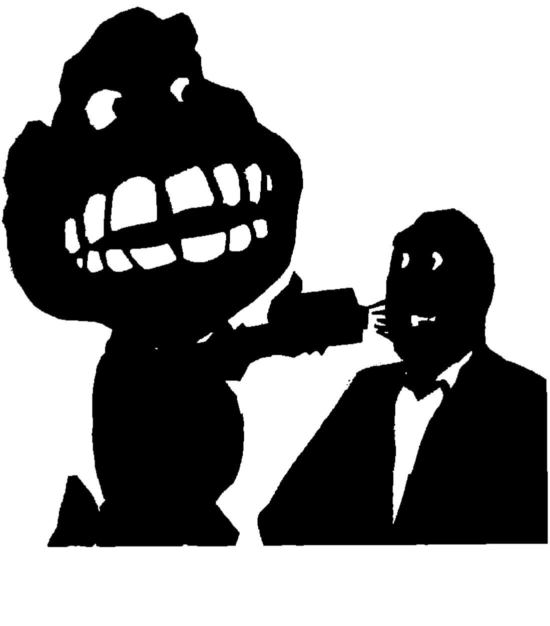

www.nagorikpathagar.org

প্রসঙ্গ কথা

'ভেজাল সমাচার' একটি অসাধারণ জননন্দিত ছড়া। এটি প্রথমে পাক্ষিক 'পালাবদল' পত্রিকায় ছাপা হয়। পরে এটি বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশ পায়। 'ভেজাল সমাচার'কে আবৃত্তির মাধ্যমে আরও জনপ্রিয় করে তোলেন কণ্ঠশিল্পী সাইফুল্লাহ মানছুর ও আবৃত্তি শিল্পী শরীফ বায়জীদ মাহমুদ। দু'জনের একটি আবৃত্তি অ্যালবামে এটি স্থান পায়। এই ছড়াকাব্যটিকে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশের পরিকল্পনা ছিলো কবির। কবি এই পরিকল্পিত গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন বাংলাদেশের গণমানুষের রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক নেতা অধ্যাপক গোলাম আযমকে। আমরা এটিকে রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করলাম। পাণ্ডুলিপিটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন আফসার নিজাম।

www.nagorikpathagar.org

ভেজাল সমাচার

সবকিছুতে ভেজাল এখন ভাই
ভেজাল ছাড়া আসল কিছু নাই।

ঘরের বেড়ায়, চালে ভেজাল
মানুষ-জনের চালে ভেজাল
জন্তু-পশুর খালে ভেজাল
ভেষজ গাছের ছালে ভেজাল
গানের সুরে তালে ভেজাল
চালে ভেজাল, ডালে ভেজাল
হরেক রকম মালে ভেজাল
নৌকা এবং পালে ভেজাল

যেদিক তাকাই কেবল ভেজাল পাই–
ভেজাল ছাড়া আসল কিছু নাই।

লোহার কাঁচির খাঁজে ভেজাল
শরম-ভরম-লাজে ভেজাল
প্রেম-প্রণয়ের মাঝে ভেজাল
শয্যা এবং সাজে ভেজাল
কথায় ভেজাল, কাজে ভেজাল
ভোট-ব্যালটের ভাঁজে ভেজাল
সবচেয়ে যা বাজে ভেজাল
নেত্রী-নেতার তাজে ভেজাল

ভেজাল ভেজাল ভেজাল যেদিক যাই–
ভেজাল ছাড়া অন্যকিছু নাই।

পেটে ভেজাল, অন্ত্রে ভেজাল
মাড়ির সংগে দন্তে ভেজাল
দেশ-বিদেশের যন্ত্রে ভেজাল
দরবেশ-সাধু-সন্তে ভেজাল
তাবিজ-তুমার-মন্ত্রে ভেজাল

www.nagorikpathagar.org

সর্ব পন্থা-পন্থে ভেজাল
শুরুর থেকে অন্তে ভেজাল
এবং গণতন্ত্রে ভেজাল

ভেজাল ভেজাল ভেজাল যেদিক চাই–
ভেজাল ছাড়া অসল কিছু নাই।

সকল কজা-কলে ভেজাল
বিগ্ বস্‌দের বলে ভেজাল
ওপর থেকে তলে ভেজাল
গুলিস্তানের ফলে ভেজাল
আর ওয়াসার জলে ভেজাল
এমন কি মূত-মলে ভেজাল
পার্টি এবং দলে ভেজাল
হরদম আহা চলে ভেজাল

ভেজাল ভেজাল ভেজাল যেদিক ধাই–
ভেজাল ছাড়া আসল কিছু নাই।

গোঁফও ভেজাল, গোসাঁই ভেজাল
গোস্ত ভেজাল, কশাই ভেজাল
তার দা-ছুরির ঘষাই ভেজাল

অনেক জমির চষাই ভেজাল
বহু ময়রার রসাই ভেজাল
মিয়া ভেজাল, মশাই ভেজাল
তাদের বৈঠক-বসাই ভেজাল
দেশের আসল দশাই ভেজাল

ভেজাল ভেজাল ভেজাল পরি-খাই–
ভেজাল ছাড়া আসল কিছু নাই।

কাঠ ভেজাল ও কাটক ভেজাল
চাটনি ভেজাল, চাটক ভেজাল

www.nagorikpathagar.org

মিষ্টি থেকে আ-টক ভেজাল
ঝাঁটা ভেজাল, ঝাটক ভেজাল
মামলা ভেজাল, আটক ভেজাল
লাল দালান ও ফাটক ভেজাল
নোভেল ভেজাল, নাটক ভেজাল
পাঠ্য ভেজাল, পাঠক ভেজাল

তাইরে নাইরে তাইরে নাইরে তাই-
ভেজাল ছাড়া আসল কিছু নাই।

কাঁচায় ভেজাল, পাকায় ভেজাল
সমষ্টি ও একায় ভেজাল
হোটেল-মেসে থাকায় ভেজাল
দু-চোখ দিয়ে দেখায় ভেজাল
শিক্ষা এবং শেখায় ভেজাল

সোজা এবং বাঁকায় ভেজাল
লেখক ভেজাল, লেখায় ভেজাল
বিশেষ করে ঢাকায় ভেজাল

চতুর্দিকে ভেজাল কয়লা-ছাই-
ভেজাল ছাড়া আসল কিছু নাই।

বাহারী ঘর-বাড়ি ভেজাল
ঠিলে-কলস-চাড়ি ভেজাল
যানবাহন ও গাড়ি ভেজাল
সাত-সমুদ্র পাড়ি ভেজাল
নরও ভেজাল, নারী ভেজাল
বয়স্ক চুল-দাড়ি ভেজাল
অভিমান ও আড়ি ভেজাল
লুঙ্গি ভেজাল, শাড়ি ভেজাল

এবং ভেজাল মাথা গোঁজার ঠাঁই-
ভেজাল ছাড়া আসল কিছু নাই।

www.nagorikpathagar.org

মেষ-ভেড়াদের ঊর্ণে ভেজাল
ধূর্ত লোকের বর্ণে ভেজাল
অসভ্যদের কর্ণে ভেজাল
রৌপ্যে ভেজাল, স্বর্ণে ভেজাল
কর্তা ভেজাল, কর্মে ভেজাল
জাতলোভীদের মর্মে ভেজাল
মীর জাফরের বর্মে ভেজাল
এনজিও-দের ধর্মে ভেজাল

ভেজাল ভেজাল ভেজাল ষাঁড় আর গাই–
ভেজাল ছাড়া আসল কিছু নাই।

তওবা-পস্তাপস্তি ভেজাল
জেরা-জবরদস্তি ভেজাল
রিং-এর ধস্তাধস্তি ভেজাল
বনের উপর গস্তি ভেজাল
ডোবার কাছে বস্তি ভেজাল
থানার বড় হস্তী ভেজাল
অফিস-বসের স্বস্তি ভেজাল
রাজনীতিতে দোস্তী ভেজাল

সবদিকে আজ ভেজাল মারছে ঘাই
ভেজাল ছাড়া আসল কিছু নাই।

তুলির আঁকা আর্টও ভেজাল
প্যান্ট-টাই-কোট-শার্টও ভেজাল
মেক্সিও স্কার্টও ভেজাল
ডাট এবং স্মার্টও ভেজাল
বেচাকেনার চার্টও ভেজাল
টোটাল ভেজাল, পার্টও ভেজাল
কোরাস ও কনসার্টও ভেজাল
রোড-পোল-কালভার্টও ভেজাল

www.nagorikpathagar.org

ভেজাল টাকা-কড়ি-পয়সা-পাই
ভেজাল ছাড়া আসল কিছু নাই।

ভুল মসলার ফেকার ভেজাল
ঋণের দায়ে ঠেকার ভেজাল
হামবড়া সব মেকার ভেজাল
এবং ডবল ডেকার ভেজাল
কর্মবিমুখ বেকার ভেজাল
সামলাবেন ভাই কে কার ভেজাল?
রেল-লাইনের চেকার ভেজাল
সরকার কেয়ারটেকার ভেজাল

ভেজাল হাওয়া বইছে রে শাঁই শাঁই-
ভেজাল ছাড়া আসল কিছু নাই।

নকশা করা খেতায় ভেজাল
ধোপ-দোরস্ত-কেতায় ভেজাল
এবং স্বাধীনচেতায় ভেজাল
এই আমাদের হেথায় ভেজাল
ওই তোমাদের সেথায় ভেজাল
[আগেও ছিলো যেথায় ভেজাল]
বিরাট বিরাট নেতায় ভেজাল
নির্বাচনে জেতায় ভেজাল

ভেজাল ভেজাল ভেজাল মোড়ল-চাঁই-
ভেজাল ছাড়া আসল কিছু নাই।

কোথাও জল-তরঙ্গ ভেজাল
বহু সাধুর অঙ্গ ভেজাল
বুদ্ধিজীবীর ঢংও ভেজাল

তাদের রস ও রঙ্গ ভেজাল
'র' 'সি আই' এর জংগ ভেজাল
পশ্চিমা সুড়ঙ্গ ভেজাল

www.nagorikpathagar.org

এবং জাতিসংঘ ভেজাল
তার সমস্ত অঙ্গ ভেজাল

ভেজাল ভেজাল ভেজাল বিশ্বটাই
ভেজাল ছাড়া আসল কিছু নাই।

বাজার করতে গেলে ভেজাল
বাজার করে এলে ভেজাল
যাবতীয় তেলে ভেজাল
বাইরে ভেজাল, জেলে ভেজাল

যেখানে যাই মেলে ভেজাল
একটা কিছু চেলে ভেজাল
মেয়ে ভেজাল, ছেলে ভেজাল
মূলত সব দেলে ভেজাল

এবং ভেজাল সংসারের আইঢাই
ভেজাল ছাড়া আসল কিছু নাই।

কেবল মানামানি ভেজাল
চামচার টানাটানি ভেজাল
অনেক জানাজানি ভেজাল
নিছক কানাকানি ভেজাল
সংবাদের চটকানি ভেজাল
বিদেশের আমদানী ভেজাল
স্বদেশের রফতানী ভেজাল

এবং ভেজাল ময়দা-আটার কাই
ভেজাল ছাড়া আসল কিছু নাই।

অনেক পেনের নিবই ভেজাল
অনেক পানের চিবি ভেজাল
কতেক পীরের জিভই ভেজাল
হঠাৎ টাকার ঢিবি ভেজাল
যাদুর হিবিজিবি ভেজাল
নারীবাদের বিবি ভেজাল

www.nagorikpathagar.org

চিড়িয়াখানার জীবই ভেজাল
এবং বুদ্ধিজীবী ভেজাল

চতুর্দিকে ধানাই আর পানাই–
ভেজাল ছাড়া আসল কিছু নাই।

বাদ্য ভেজাল, বাদক ভেজাল
হালাল খাদ্য খাদক ভেজাল
অনেক সাধু সাধক ভেজাল
বহু অভিভাবক ভেজাল
পত্রিকা সম্পাদক ভেজাল
গবেষক ও ভাবক ভেজাল
অসংখ্য উৎপাদক ভেজাল
অনেক বক্তা ভাষক ভেজাল

এবং ভেজাল শহুরে আর গাঁই–
ভেজাল ছাড়া আসল কিছু নাই।

কারোর আবার ব্যবসা ভেজাল
হাতের গড়া বাদশা ভেজাল
পাউন্ড-ডলার-পয়সা ভেজাল
ধনের গরম ভ্যাপসা ভেজাল
কলজে-পিত্ত-ফ্যাপসা ভেজাল
হৃদয় ও মন নকশা ভেজাল
নিজের তৈরি তেরসা ভেজাল
চামচা-চেলা-ঢ্যাপসা ভেজাল

এবং ভেজাল এদেরই খাই খাই–
ভেজাল ছাড়া আসল কিছু নাই।

বিশ্বব্যাঙ্কের অর্থে ভেজাল
দাতাগোষ্ঠীর শর্তে ভেজাল
প্রশ্নে ভেজাল, নর্থে ভেজাল
রাজনীতির আবর্তে ভেজাল
জজেরও সামর্থে ভেজাল
পৌরসভার গর্তে ভেজাল

www.nagorikpathagar.org

কোনটা আসল ধরতে ভেজাল
আসলে এই মর্তে ভেজাল

সবখানে যে ভেজালের হামলাই-
ভেজাল ছাড়া আসল কিছু নাই।

অনেক দামী মানুষ ভেজাল
তাদের অনুগামী ভেজাল
অনেকের কাজ-কামই ভেজাল
আবার কারো ঘামই ভেজাল

অনেক কিছুর দামই ভেজাল
বেশ পুলিশ-আসামী ভেজাল
অনেক বউয়ের স্বামী ভেজাল
এই যে দেখুন আমি ভেজাল

ভেজাল ভেজাল যা করি যাচাই-
ভেজাল ছাড়া আসল কিছু নাই।

ম্যাডাম ভেজাল, আপা ভেজাল
তাদের দারুণ চাপা ভেজাল
কেউ বলে ভাই জাপা ভেজাল
দাঁড়িপাল্লার মাপা ভেজাল
বাম বলয়ের বাঁ পা ভেজাল
টোপের পিঠে ভাপা ভেজাল
ঢের কাগজের ছাপা ভেজাল
চাঁদাবাজের চাপা ভেজাল

ভেজাল থেকে দায় হলো বাঁচাই-
ভেজাল ছাড়া আসল কিছু নাই।

তবু আজও আসল আছে, আছে মহান সত্য
সকল কিছুর উর্ধ্বে উঠি চাই তার আনুগত্য।
সবাই আগুন একটা কথায় হই গড়ে উদ্বুদ্ধ-
ভেজাল দিয়ে আরেক ভেজাল যায় না করা শুদ্ধ।

www.nagorikpathagar.org

উলুঘ খানজাহান ও
তাঁর খলিফাতাবাদ রাজ্য

[অগ্রন্থিত]

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

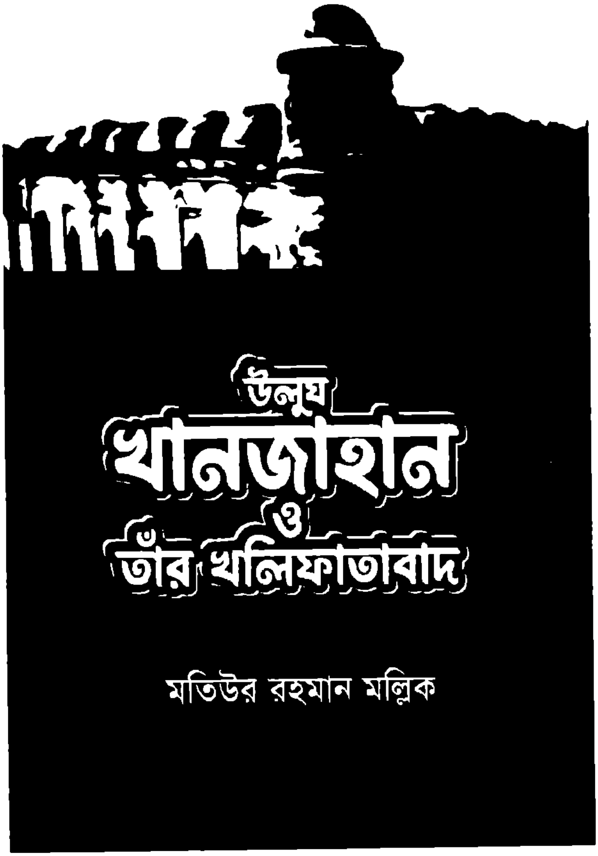

www.nagorikpathagar.org

প্রসঙ্গ কথা

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের জন্ম খানজাহান আলীর স্মৃতি বিজড়িত বাগেরহাটে। ঈসায়ী পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে এই মহান ইসলাম প্রচারক, সংস্কারক ও বিপ্লবী খানজাহান আলী বাংলার দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে বিশাল একটি ইসলামী রাজ্যের পত্তন ঘটান। ষাটগম্বুজ মসজিদ তাঁর মহান স্থাপত্যকীর্তি। কবি এই মহান সাধকের এক যোগ্যতম উত্তরসূরি। ফলে তাঁর গান-কবিতায় খানজাহান আলী প্রসঙ্গ নানাভাবে এসেছে। একটি গীতিকবিতায় তিনি লিখেছেন- 'খানজাহানের পুণ্যভূমি খলিফাতাবাদ/সাত আকাশের সূর্য আমার সাত আকাশের চাঁদ।'

সুগভীর উপলব্ধি ও প্রাণভরা ভালোবাসাই কেবল এ ধরনের পঙ্‌ক্তি সৃষ্টি করতে পারে। শুধু কাব্য-গানে নয়, এই মহান ব্যক্তিত্বকে সবিস্তারে তুলে ধরতে চেয়েছেন তিনি গদ্যেও। সেই তাগিদ থেকেই লেখা হয়েছে 'উলুঘ খানজাহান ও তাঁর খলিফাতাবাদ রাজ্য।' এই রচনাটি স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশের ইচ্ছে ছিলো কবির। আমরা এই পাণ্ডুলিপিটি রচনাবলী চতুর্থ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করলাম। পাণ্ডুলিপিটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন মনিরুজ্জামান।

www.nagorikpathagar.org

উলুঘ খানজাহান ও তাঁর খলিফাতাবাদ রাজ্য

প্রখ্যাত কবি আবুবকর সিদ্দিক বাগেরহাটের একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন তার 'বাগেরহাট' নামের কবিতায়–

বইয়ের শাদা কাগজে কালো হরফে অত সবুজ
আপনি পেতে পারেন না। ধারালো রূপসা পেরিয়ে
চলে যান আয়েশী ট্রেনে বা চামচিকে বাসে
বা বুড্ডা ট্যাকসি অথবা গুবরো পোকা স্কুটারে।
বাহিরদিয়া ফকিরহাট পেরুতেই চমকে উঠবেন
টাটকা সবুজ ঝাঁঝে। আপনাকে আত্মসমর্পণ
করতে হবে ঠিক যাত্রাপুর ছাড়িয়ে। বাঁ হাতে
ভৈরব নদী নিয়ে সবুজ অন্ধকার ভাঙতে ভাঙতে
ছিন্ন করতে করতে আপনি চলেছেন
নিরবধি নিবিড় আপনি বহমান
সুপুরী নারকেল কলা কেয়া জার্মানলতা শিটকি
শটি রয়না– সে অপরাহত অব্যাহত।
এ সবুজে চোখে ঘোর ধরে, মনে ঘুম নামে।
বিভূতি ব্যানার্জী কি এখানে এসেছেন এই
জলের আর সবুজের দেশে–
এখানে এলে আপনার যুগভ্রম
ঘটে যেতে পারে। হতে পারে আবেগ রমণে
রক্তজ্বর। এত থকথকে গাঢ়তা ধরে না
দুটিমাত্র চোখে। এই উদ্ভিদ প্রধান বাগেরহাট
এই জলে জলে একাকার দড়াটানা নদীর
আজন্ম ছলছল।

www.nagorikpathagar.org

এই চমৎকার গর্ব এবং গৌরবের প্রাণপুরুষ হযরত খানজাহান। বস্তুত খানজাহানের জীবন-সমুদ্র অতলস্পর্শী এবং দিগন্তহীন। আমরা তার অতলস্পর্শী জীবনের মাত্র দু'টি দিকই আলোচনায় এনেছি। একটি দিক হলো তাঁর জীবন সম্পর্কে, অন্যটি হলো তাঁর খলিফাতাবাদ রাজ্য সম্পর্কে। এবং প্রত্যেকটি আলোচনার স্বপক্ষে একাধিক গবেষকের উদ্ধৃতিও উপস্থাপন করেছি।

এক.

হযরত খানজাহান আলী (রহ.)–এর পরিপূর্ণ নাম "উলুঘ খানুল আজম খানজাহান"। এবং প্রকৃত নাম হলো 'খানজাহান'। 'উলুঘ' আর 'খানুল আজম' তার পদমর্যাদাজ্ঞাপক সম্মানসূচক উপাধি। উলুঘ তুর্কী শব্দ। অর্থ- নেতা, সরদার। এটা দলপতি ও শাসনকর্তাদের জন্য ব্যবহৃত হয়। খানুল আজম তুর্কী ভাষায় 'উলুঘ' শব্দের সমার্থবোধক। জনসাধারণের কাছে তিনি খানজাহান আলী, খাঞ্জালী পীর বা পীর খাঞ্জা, খানজাহান খান নামে বিখ্যাত। 'আলী' তার নামের শেষে অনেক পরে যুক্ত হয়েছে। মূলত নামের সাথে মিলের কারণে আলী যুক্ত হয়েছে।

খানজাহান আলীর প্রকৃত জন্ম তারিখ জানা যায় না। তাঁর মৃত্যু ২২ মতান্তরে ২৫ শে অক্টোবর ১৪৫৯ খ্রিষ্টাব্দে। প্রায় ৪০ বছর দক্ষিণ বঙ্গে ইসলাম প্রচার করেন তিনি। বঙ্গে আগমনের পূর্বে তিনি প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৪০ বছর। তিনি ৮০ বছর জীবিত ছিলেন। এই হিসাবে তার জন্ম সাল হয় ১৩৭৯ খ্রিষ্টাব্দ। মাজারে লিখিত শিলালিপি থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, তিনি তুরস্কের খাওয়ারিজিমে জন্মগ্রহণ করেন, যার বর্তমান নাম খিবা। খিবায় তিনি ছাড়াও অনেক মনীষীর জন্ম হয়েছে। এ কারণে এ স্থান পূর্ব থেকেই প্রসিদ্ধ। তার বাল্য নাম ছিলো কেশর খান বা কেশর খাঁ। তার পিতার নাম আকবর খাঁ এবং মাতার নাম আম্বিয়া বিবি। ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের বেশ পরে একেবারে চৌদ্দ শতকের শেষের দিকে খানজাহান বাল্যাবস্থায় পিতা–মাতার সাথে গৌড়ে আগমন করেন। তার পিতা ইতিহাসে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব নন। তবে তিনি জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। গৌড়ের নিকটবর্তী নবীপুরে তাঁর বাড়ি ছিলো। তিনি খানজাহানকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার অনেক পরে প্রখ্যাত ওলী হযরত নূর কুতুবুল আলমের মাদরাসায় পাঠান এবং এখানে অধ্যয়নরত অবস্থায় তার পিতা ইন্তিকাল করেন। মাতা আম্বিয়া বিবি তখন বহু কষ্টে তাঁকে লালন–পালন করতে থাকেন।

www.nagorikpathagar.org

একদা খানজাহান বাদশাহ হোসেন শাহের নজরে পড়েন। বাদশাহ তার বুদ্ধিমত্তা দেখে মুগ্ধ হন। তিনি তাকে তার মায়ের কাছে নিয়ে আসেন এবং মাকে অনেক বুঝিয়ে তাঁকে তার সাথে নিয়ে যেতে রাজী করিয়ে রাজ দরবারে নিয়ে আসেন। এখানে তিনি প্রতিপালিত হতে থাকেন। হোসেন শাহের মৃত্যুর পর রাজদরবারের লোকেরা তার সাথে বিদ্রুপাত্মক আচরণ করতে থাকে। এমন কি তাঁর মাতার জন্য নির্ধারিত বেতন-ভাতা পর্যন্ত রাজদরবার কর্তৃক বন্ধ করে দেওয়া হয়। এইসব ঘটনা খানজাহান তাঁর ওস্তাদ নূর কুতুবুল- আলমকে অবহিত করেন। ওস্তাদ তাঁর কষ্ট অনুধাবন করেন এবং জৌনপুরের প্রতাপশালী সুলতান ইব্রাহীম শর্কির কাছে পত্রসহ পাঠিয়ে দেন। পত্রে তিনি খানজাহানের সৎচরিত্র ও প্রতিভার কথা উল্লেখ করেন।

ইব্রাহীম শর্কি হযরত নূর-কুতুবুল আলমকে খুব শ্রদ্ধা করতেন এবং তার প্রতিটি পরামর্শ ও নির্দেশের খুবই গুরুত্ব দিতেন। ফলে চিঠি পাওয়া মাত্রই তিনি খানজাহানকে একজন সাধারণ সৈনিক পদে নিয়োগ দান করেন। এখান থেকেই তার সৈনিক জীবন শুরু হয়।

সৈনিক খানজাহান অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন এবং একজন সাধারণ সৈনিক থেকে প্রধান সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। খানজাহান যখন জৌনপুরের প্রধান সেনাপতি তখন গৌড়ের সামাজিক এবং ধর্মীয় অবস্থা ছিলো বড়ই করুণ। এ সময় গৌড়ের শাসনকর্তা ছিলেন রাজা গণেশ। গণেশ ক্ষমতায় এসে মুসলমানদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার নির্যাতন শুরু করেন। গণেশের অত্যাচারের মাত্রা চরমে পৌছালে বিশিষ্ট ওলী হযরত নূর কুতুবুল আলম জৌনপুরের শাসনকর্তা ইব্রাহীম শর্কির নিকট পত্র লেখেন এবং ইসলাম রক্ষার জন্য গণেশকে দমন করার উদাত্ত আহ্বান জানান। ওলীর পত্র পেয়ে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহীম শর্কি প্রধান সেনাপতি খান জাহানের নেতৃত্বে বিপুল সংখ্যক সৈন্যকে রাজা গণেশের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। রাজা গণেশ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সুলতানের কাছে প্রাণভিক্ষা করেন। হযরত নূর কুতুবুল-আলমের পরামর্শে সুলতান তার প্রাণভিক্ষা দেন।

যুদ্ধ শেষে খানজাহান গৌড়ে তার ওস্তাদ নূর কুতুবুল-আলমের নিকট কিছুদিন থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করে সুলতান শর্কির কাছে ছুটির আবেদন করেন। সুলতান তার ছুটি মঞ্জুর করেন। খানজাহান তাঁর ওস্তাদের কাছে ফিরে যান। ওস্তাদ খুব স্নেহ করতেন তাঁকে, ফলে তাঁকে কাছে পেয়ে নূর কুতুবুল-আলম খুব খুশি হন। ওস্তাদ খানজাহানকে কামালিয়াত ও বেলায়ত সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করেন। পরবর্তীতে সুলতান ইব্রাহীম শর্কি তাঁকে বারবার চাকরিতে ফিরে আসার আহ্বান জানালেও তিনি আর জৌনপুরে ফিরে না যেয়ে চাকরি থেকে ইস্তফা দেন। এখানেই তার সৈনিক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

www.nagorikpathagar.org

হযরত নূর কতুবুল আলম খানজাহান আলীর সততা ও নিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে নিজের মেয়ের সঙ্গে খানজাহানের বিয়ে দেন। কিছুদিন দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেন খানজাহান। কিন্তু চারদিকে ইসলামের দুঃসময় দেখে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। স্ত্রীকে শ্বশুরের খেদমতে রেখে ইসলাম রক্ষা, সমাজসেবা ও ইসলামের প্রচারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন।

খানজাহান ঠিক কতো খ্রিষ্টাব্দে দক্ষিণবঙ্গে আগমন করেন তা জানা যায় না। তবে তিনি যে গৌড়ের সুলতান জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ শাহের (১৪১৮-৩২ খ্রিষ্টাব্দ) সময় দক্ষিণবঙ্গে আগমন করেন এটা অনুমান করা যায়। যতদূর জানা যায়, তিনি নদী পথে দক্ষিণবঙ্গে আগমন করেন। সে ব্যাপারে অনেকটা নিশ্চিত হওয়া যায়। তিনি গৌড় হতে পদ্মা নদী দিয়ে কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের নিকটবর্তী ভৈরব নদী হয়ে মেহেরপুর থেকে চুয়াডাঙ্গায় আসেন। চুয়াডাঙ্গা থেকে ঝিনাইদহ এবং ঝিনাইদহ থেকে যশোরের বারোবাজারে উপনীত হন। এ সময় দক্ষিণবঙ্গে আগমনের একমাত্র পথ ছিল ভৈরব নদী। দক্ষিণবঙ্গে আগমনের সময় খানজাহান আলী বিভিন্ন স্থানে থেকে ইসলাম প্রচার ও জনসেবামূলক কাজ করেন। খানজাহান আলী ১১জন ওলীসহ সর্বপ্রথম দক্ষিণবঙ্গের বারোবাজারে অবস্থান গ্রহণ করেন। এবং এখান থেকেই তাঁর দক্ষিণবঙ্গ জয়ের অগ্রযাত্রা শুরু হয়।

দুই.

হযরত খানজাহান আলী দক্ষিণবঙ্গের এক অবিস্মরণীয় নাম। ইসলাম প্রচারক এবং এ অঞ্চল আবাদকারী হিসাবে তিনি সারাদেশের মানুষের মনে সুপ্রতিষ্ঠিত। তবে তাঁকে ঘিরে অস্পষ্টতার অন্ত নেই। তাঁর প্রকৃত পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এমন কি তাঁর প্রকৃত নামটি কি ছিল তা-ই আজো জানা যায়নি। আমরা তাঁকে পীর খানজাহান আলী বলে জানি। তবে তা তাঁর প্রকৃত নাম নয়। এখনও পর্যন্ত তাঁর সম্পর্কে তথ্য উদ্ধারের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উৎস হল তাঁর মাজার গাত্রে খোদিত শিলালিপি। তাতে তাঁর যে নাম পাওয়া যায় তাহলো "উলুঘ খানের আজম খানজাহান"। "উলুঘ" তুর্কী শব্দ। সম্ভবত এটা ছিলো তাঁর উপাধি। আর 'খানজাহান'ও কোনো নাম নয় – তা একটা উপাধি মাত্র।

সুলতানী আমলে সেনাপতিরা সম্রাট কর্তৃক এ উপাধিতে ভূষিত হতেন। সে যুগে এ শ্রেণির বেশ কয়েকজন "খানজাহান" উপাধিধারী ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিলো বলে জানা যায়। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, দিল্লী ও বাংলার বেশ কয়েকজন সেনাপতি ছিলেন উপাধিধারী। আমাদের আলোচ্য খানজাহানও হয়তো কোনো সুলতান দ্বারা খানজাহান উপাধিযুক্ত হয়ে থাকবেন। "আলী" শব্দটি তাঁর নামের

www.nagorikpathagar.org

অংশ নয়, পরবর্তীতে যুক্তশব্দ বা শব্দাংশ মাত্র। এটা মনে হয় 'আলাইহে' শব্দের বিকৃত রূপ। কারণ তাঁর সমাধিগাত্রের লিপিতে খানেল আজম খানজাহান বাক্যের সঙ্গে 'আলাইহের রাহমাতো' কথাটি লিখিত আছে। এটা তাঁর নামের অংশ নয়। এর অর্থ তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। তাই অজ্ঞতাবশতঃ এই 'আলাইহে' শব্দ থেকে 'আলী' শব্দটা এসেছে বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। এ থেকে তিনি পরিচিত হয়ে গেছেন 'খানজাহান আলী' নামে। আর অজ্ঞতার কারণে এ ধরনের নাম বিকৃতি ইতিহাসে কোনো নতুন ঘটনা নয়।

শুধু নাম নয় – তাঁর পরিচয়ও বেশ অস্পষ্ট। তিনি কে ছিলেন, কোথা থেকে আসেন তার কিছুই জানা যায় না। পুরো বিষয়টিই রহস্যাবৃত। তাঁর অসংখ্য কীর্তিরাজির মধ্যে বসবাস করে আমরা তাঁর সম্পর্কে প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এ বিষয়ে কিছু আলোচনা যে হয়নি এমন নয়। তবে তাঁকে নিয়ে নির্ভরযোগ্য কোনো অখণ্ড গবেষণামূলক গ্রন্থ এখনও লিখিত হয়নি। পর্যাপ্ত তথ্য উৎস না থাকার কারণেই সম্ভবত পেশাদার ঐতিহাসিকেরা এ বিষয়ে কম গুরুত্ব দিয়েছেন বলে আমার ধারণা। পূর্বেই বলেছি একমাত্র মাজারলিপি ছাড়া কিছুই পাওয়া যায়নি। তারপর এ বিষয়ে চালানোও হয়নি ব্যাপক কোনো অনুসন্ধান। এ পর্যন্ত তাঁর নামাঙ্কিত কোন মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়নি। এ বিষয়ে অনুসন্ধানও চালানো হয়েছে খুব কম। তাঁর মাজারের অন্তর্গৃহে এমন কিছু শিলালিপি আছে যার পাঠোদ্ধার করার ব্যবস্থা হলে হয়তো তা দিতে পারতো নতুন পথের সন্ধান। তবে এর মধ্যে কিছু কিছু ইতিহাসবিদ (কখনও কখনও প্রসঙ্গক্রমে) এর প্রতি কমবেশি আলোকপাত করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সতীশচন্দ্র মিত্র, এ এফ এম আবদুল জলীল, গৌরদাস বসাক, মোঃ নুরুল ইসলাম, মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, ব্লকম্যান, এল এস এম ওমালি, ডাব্লু ডাব্লু হান্টার, এল আর ফকাস, জেমস ওয়েস্টল্যান্ড, পশুপতি ভট্টাচার্য, সৈয়দ ওমর ফারুক প্রমুখ। এরা এদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে খানজাহান আলীর প্রকৃত পরিচয় উদ্ধারে সচেষ্ট হয়েছেন। এ বিষয়ে প্রধান প্রশ্ন খানজাহান কে ছিলেন? কোথা থেকে আসেন? দিল্লী না গৌড়? না জৌনপুর? সংখ্যাতাত্ত্বিক জরিপে দেখা যায়, জৌনপুরের সমর্থকই বেশি। তারপর দিল্লীর ও অবশেষে গৌড়ের। এ প্রসঙ্গে সতীশচন্দ্র মিত্র এবং এ এফ এম আব্দুল জলীলের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে তাদের অভিমত যে সর্বাংশে গৃহীত হয়েছে একথা বলা যেতে পারে না।

সতীশচন্দ্রের মতে শর্কি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা খানজাহান এবং আমাদের খানজাহান একই ব্যক্তি। তবে এ বক্তব্য ঠিক নয়। আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, তারা ভিন্ন লোক। এ এফ এম আবদুল জলীলের মতে, বাগেরহাটের খানজাহান ফিরোজ শাহ তোঘলকের মন্ত্রী খান-ই জাহান মকবুলের পৌত্র। তবে এ বিষয়ে তিনিও জোরালো তথ্য প্রমাণ উপস্থিত করতে পারেননি। তিনি এ

www.nagorikpathagar.org

মন্তব্য করেছেন অনেক খানি অনুমানের ওপর নির্ভর করে। তবে পূর্বেই বলেছি এক্ষেত্রে সমস্যা যে নেই তা নয়। তা হলো প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাব।এ কারণে তাদের পক্ষে জোরালো পাথুরে প্রমাণ উপস্থাপনের সুযোগ কোথায়? তবে তিনি যে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

তাঁর পুরানো কর্মস্থল নিশ্চয়ই ছিলো দিল্লী বা গৌড়ের রাজদরবার। সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন তিনি কেনো রাজদরবারের সম্মানজনক রাজকীয় পদ তথা নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে অনিশ্চয়তাপূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী পথে পা বাড়ালেন? এর একটা কারণ হতে পারে, তা হলো তিনি হয়তো রাজদরবারের ভয়াবহ ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ, জোর-জুলুম, রক্তপাত প্রভৃতি দর্শনে সংসারধর্মে বীতশ্রদ্ধ হয়ে নির্জন স্থানে থেকে ধর্মপ্রচার ও মানবসেবায় আত্মনিয়োগ করার মানসে কোনো উপযুক্ত স্থানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছিলেন।

তা না হলে তিনি হয়তো দক্ষিণবঙ্গের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য রাজধানী থেকে প্রেরিত হয়েছিলেন। এই শেষোক্ত ধারণাটিকে আমার কাছে সবচেয়ে বেশি যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

এ বিষয়ে আমার একটা নিজস্ব মতামত থাকা স্বাভাবিক। যতদূর অনুমান, তিনি হয়তো ছিলেন খানজাহান বা মন্ত্রী। অর্থাৎ তিনি "খান আল আজম খানজাহান" এবং "উলুঘ খানজাহান" উভয় উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। পূর্বেই বলেছি খানজাহান কোনো নাম নয় – উপাধিমাত্র। সুলতানী আমলে বাংলার সুলতানগণ প্রায়ই থাকতেন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। সুলতানের হাতেই সর্ব ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকতো। তবে রাজ্যে আর যে সব মর্যাদাসম্পন্ন কর্মচারী থাকতেন তাদের মধ্যে একজন হলেন উজীর বা মন্ত্রী। পঞ্চদশ শতকের দিকে সুলতানী আমলে প্রধান উজীর ও অন্যান্য উজীরদের বলা হতো খানজাহান। গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের প্রধান উজীরের উপাধি ছিল "খান আল আজম খানজাহান"। সুলতান নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহের প্রধান উজীর ছিলেন "উলুঘ খানজাহান" উপাধিধারী। শিলালিপি থেকে জানা যায় বাগেরহাটের খানজাহানের নাম ছিল "উলুঘ খানেল আজম খানজাহান"।

এখন প্রশ্ন ওঠে, ১৪৫৯ সালে মৃত্যুবরণকারী একই ব্যক্তি "খান আল আজম খানজাহান" এবং "উলুঘ খানজাহান" এই দুই উপাধিতে ভূষিত হলেন কেমন করে? উত্তরে বলা যায়, তিনি হয়তো ছিলেন গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের প্রধান উজীর। পরে গণেশের চক্রান্তে গিয়াসউদ্দিন নিহত হলে তিনি (বাগেরহাটের খানজাহান) হয়তো পান্ডুয়া থেকে দক্ষিণবঙ্গে পালিয়ে আসেন। পরে নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করলে তিনি খানজাহানকে "উলুঘ খানজাহান" উপাধিতে ভূষিত করেন। অর্থাৎ তিনি সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের

www.nagorikpathagar.org

সেনাধ্যক্ষ হিসাবে জীবন শুরু করে নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহের প্রধান উজীর হিসাবে মৃত্যুবরণ করেন। তবে এ সবই অনুমান মাত্র– এর সমর্থনে কোনো পাথুরে প্রমাণ হাজির করার উপায় নেই।

যে ভাবেই হোক তাঁর আগমন ইতিহাসের এক ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা। সঙ্গে সঙ্গে তা এ অঞ্চলের জন্য আশির্বাদস্বরূপ। পূর্বেই বলেছি, এ অঞ্চল আবাদ ও ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিলো অসামান্য। কথিত আছে, তিনি ৬০ হাজার সৈন্য এবং ৩৬০ জন আওলিয়া সঙ্গে নিয়ে এ অঞ্চলে আগমন করেন। অবশ্য এটা একটা কিংবদন্তি। তাঁর সাথে ঠিক এতো সঙ্গীসাথী না থাকলেও তিনি যে প্রচুর সংখ্যক সৈন্য ও সহচর নিয়ে এ অঞ্চলে আসেন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাঁর সহচরদের মধ্যে যে সব ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়, তারা হলেন গরিব শাহ, বাহরাম শাহ, বুড়ো খাঁ, ফতে খাঁ, পীর খাঁ, মীর খাঁ, চা খাঁ, এক্তিয়ার খাঁ, বক্তার খাঁ, আলম খাঁ, আনোয়ার খাঁ, শাহাদাত খাঁ, শের খাঁ, বাহাদুর খাঁ, দরিয়া খাঁ, দিদার খাঁ প্রমুখ। আর ছিলো প্রচুর সৈন্য–সামন্ত। বাগেরহাটের পথে তিনি যতো এগিয়েছেন, অনুসারীর সংখ্যা ধীরে ধীরে ততো বেড়েছে। তাঁর আগমনের সময় এ অঞ্চলের অবস্থা ঠিক কেমন ছিল জানা যায় না। তবে এটা ঠিক যে তখন এ অঞ্চলসহ সারাদেশের অবস্থা ছিল অত্যন্ত অরাজকতাপূর্ণ। তখন গৌড়ের শাসনের বাইরে চলে গেছে অনেক অঞ্চল। বিশেষ করে দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে ছিলো না কোনো সুস্পষ্ট রাজশক্তির প্রভাব। এমন এক দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে বাগেরহাটের পথে অগ্রসর হন তিনি। তবে বাগেরহাটেই যে তাঁকে পৌছাতে হবে এমন কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা হয়তো প্রথমে তাঁর ছিলো না। ঘটনাক্রমে তাঁকে বহুপথ ঘুরে এ বাগেরহাটে পৌছাতে হয় এবং স্থায়ী আস্তানা গাড়তে হয়। তাঁকে সম্ভবত বাগেরহাটে এসে পৌঁছাতে বেশ কটি যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। এতে অনুমান করা হয়, তাঁকে হয়তো সেই অরাজকতাপূর্ণ পরিবশে এ অঞ্চলকে মুসলমান শাসকদের অধীনে আনার জন্যই প্রেরণ করা হয়।

দিল্লী থেকে এলেও তিনি পরে হয়তো বাংলার শাসকদের আনুকূল্য লাভ করেন এবং তাদের নির্দেশে এ অঞ্চল নিজের করায়ত্ব করে গৌড় সুলতানদের অধীনে থেকে এ অঞ্চলের স্থানীয় শাসনকর্তা হিসাবে বাকী জীবন কাটান। তবে পূর্বেই বলেছি এ সবই অনুমান–মাত্র। উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে কোনো কথা বলা যাবে না।

এবার তাঁর যাত্রাপথের বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলা যেতে পারে। পরিচয় রহস্যাবৃত হলেও তাঁর যাত্রাপথ এবং কর্মতৎপরতার বিষয় বেশ স্পষ্ট। তাঁকে সম্ভবত গঙ্গাপার হয়ে নদীয়ার মধ্য দিয়ে ভৈরবের কূল ধরে বারোবাজারে উপনীত হতে হয়। বর্তমান যশোর থেকে ১১ মাইল উত্তরে যশোর–ঢাকা সড়কের পাশে এ

www.nagorikpathagar.org

বারোবাজার অবস্থিত। কথিত আছে এখানে তিনি ১২ জন সহচর আওলিয়াসহ অবস্থান করেন বলে এর নাম হয় বারোবাজার। তবে এটাও একটা কিংবদন্তি যার সত্যাসত্য যাচাই করার উপায় নেই। অনেকের মতে হিন্দু ও বৌদ্ধ আমলেও এখানে একটা বর্ধিষ্ণু শহর ছিল। সতীশচন্দ্র মিত্রের মতে খ্রিষ্টিয় প্রথম শতাব্দীতে লিখিত গ্রীক ইতিহাস পেরিপ্লাসে বর্ণিত গঙ্গারিডি রাজ্যের রাজধানী এ বারোবাজারেই অবস্থিত ছিল। তবে খানজাহান যখন আসেন তখন তা ধ্বংসস্তুপ মাত্র। খানজাহান পৌছাবার পরই এখানে ব্যাপক জনবসতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইসলাম প্রচারের সূচনা ঘটে। প্রচুর সংখ্যক মানুষ তাঁর কাছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। খানজাহান এখানে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। এখানে তিনি বেশ কয়েকটা দীঘি খনন ও মসজিদ নির্মাণ করেন বলে জানা যায়। বারোবাজারে যে এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটি রয়েছে তা তাঁর দ্বারা নির্মিত হয়েছিলো বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। কয়েকটা দীঘিও তার কীর্তির কথা ঘোষণা করছে।

এরপর তিনি আরো দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে আস্তানা গাড়েন যশোরের মুড়লী নামক স্থানে। মুড়লী বর্তমানে যশোর শহরের উপকণ্ঠে খুলনা–সাতক্ষীরা এবং ঢাকা–খুলনা সড়কের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। তিনিই এর নাম "মুড়লী কসবা" রাখেন বলে কথিত আছে। কসবা ফার্সি শব্দ। অর্থ– শহর। খানজাহান প্রতিষ্ঠিত কসবা বলে পরিচিত তিনটি শহরের সন্ধান পাওয়া যায়। এ গুলো হল কসবা, পয়োগ্রাম কসবা এবং হাবেলী কসবা। এই কসবা তাঁর কীর্তির সাক্ষ্যবাহী। এটাও নাকি একটা প্রাচীন শহর। বৌদ্ধ যুগে এটা একটা বর্ধিষ্ণু জনপদ ছিলো বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এখানেও খানজাহান দীর্ঘদিন অবস্থান করেননি। তিনি আরও বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রে বেরিয়ে পড়ার উদ্দেশ্যে মুড়লী ছেড়ে দক্ষিণের পথে অগ্রসর হতে থাকেন।

এখান থেকে খানজাহানের বাহিনী তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। তাঁর নিজের নেতৃত্বে একটা দল ভৈরবের তীর ধরে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়। দ্বিতীয় দল কপোতাক্ষের গতিপথ ধরে সোজা দক্ষিণে সুন্দরবনের দিকে চলে যায়। আর তৃতীয় দল মুড়লীতে থেকে যায়। মুড়লীতে থেকে যাওয়া বাহিনীর নেতৃত্বে থাকেন বাহরাম শাহ ও গরিব শাহ। এখানে এ বাহরাম শাহ ও গরিব শাহের মাজার রয়েছে। গরিব শাহের মাজারের ওপর একটি স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে। কপোতাক্ষের তীর ধরে যে দল অগ্রসর হয় তার নেতৃত্বে ছিলেন বুড়ো খান ও তার ছেলে ফতে খান। এ দল দক্ষিণে বেদকাশী পর্যন্ত অগ্রসর হয়। ঐ সময় এ স্থান ছিলো জঙ্গলাকীর্ণ, সুন্দরবনের অংশ। তাদের হাতেই এ অঞ্চলের আবাদ ঘটে এবং জনপদের সূচনা হয়। এখানে তারা বহু জলাশয় খনন এবং অনেক রাস্তাঘাট ও মসজিদ নির্মাণ করেন বলে জানা যায়। বিদ্যানন্দকাঠিতে

www.nagorikpathagar.org

তাদের খোদিত একটা মস্তবড় দীঘি রয়েছে। এখানে এখনও বৎসরে একবার খানজাহানের নামে বিরাট মেলা বসে। বুড়ো খান অতিশয় কর্মনিষ্ঠ ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন। তিনি ঐ সময় সুদূর বেদকাশী থেকে তৎকালের দুর্গম পথ অতিক্রম করে খানজাহানের সাক্ষাৎ লাভের জন্য বাগেরহাট আসতেন বলে কথিত আছে। বাগেরহাটে বুড়ো খাঁর নামে একটা দীঘি রয়েছে। খানজাহানের দরবারে তার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিলো বলে শোনা যায়। বুড়ো খাঁর জনৈক সহচরের নাম ছিল খালাশ খাঁ। তাঁর নামেও বেদকাশীতে একটা বড় দীঘি রয়েছে। ভৈরবের তীর ধরে অগ্রসরমান প্রধান বাহিনীর নেতৃত্ব দেন স্বয়ং খানজাহান। তাঁর দল আরো দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে পয়োগ্রাম কসবা নামক স্থানে পৌছায়। এর আগে তিনি যশোর শহর থেকে চার মাইল পূর্ব-দক্ষিণ কোণে অবস্থিত রামনগর গ্রামে একটা বিরাট দীঘি খনন করেন বলে কথিত আছে। এ দীঘি বর্তমানে শাহবাটির দীঘি নামে পরিচিত। বর্তমানে আর এক কারণে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে এই দীঘি। তা এখন পিকনিক কর্ণার নামে যশোর, খুলনা অঞ্চলে প্রসিদ্ধ বনভোজন কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

শাহবাটি দীঘি খননের পর খানজাহান সিঙ্গিয়া, শেখহাটি প্রভৃতি স্থান ঘুরে সদলবলে পয়োগ্রাম কসবায় চলে আসেন। তিনি এখানে সর্বপ্রথম আস্তানা যে স্থানে গাড়েন সে স্থানের নাম হয় খাঞ্জেপুর। এখনও তা ঐ নামেই টিকে আছে। পরে সেখানে তিনি সাময়িকভাবে অবস্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অতি দ্রুত মসজিদ, অট্টালিকা তৈরি করে স্থানটিকে জমজমাট করে তোলেন। সেখানে তাঁর আবাস, দরবারগৃহ প্রভৃতি নির্মিত হয়েছিলো বলেও শোনা যায়। পয়োগ্রাম কসবার প্রসিদ্ধি মূলত খানজাহানকে কেন্দ্র করেই। স্থানটির এ নামটি তাঁর দেয়া।

তবে এখানেও তিনি বেশিদিন অবস্থান করেননি। এখানকার শাসনভার তার প্রিয় শিষ্য মোহাম্মদ তাহেরের হাতে ন্যস্ত করে তিনি আবার পথে বেরিয়ে পড়েন। উদ্দেশ্য আরও নিরিবিলি নিশ্চিত আশ্রয় খুঁজে নেয়া। এই পয়োগ্রাম কসবাতেই পীরালী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। এখানেই দক্ষিণ ডিহি এবং উত্তর ডিহি নামক গ্রামের অস্তিত্ব রয়েছে। এই দক্ষিণ ডিহিতেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মাতুলালয় ও শ্বশুর বাড়ি ছিল।

পয়োগ্রাম থেকে খানজাহান যখন বের হন তখন সম্ভবত তাঁর কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিলো না। চলার পথে একস্থানে তিনি ভৈরব নদী অতিক্রম করে উত্তর দিকে অগ্রসর হন। যেখানে তিনি নদী অতিক্রম করেন তা আজো "পারঘাট" নামে পরিচিত। ঐ পথে কিছুদূর এগিয়ে তিনি আবার প্রত্যাবর্তন করেন এবং নদীর উত্তর পাড় ধরে অগ্রসর হন। অনেকে বলেন তিনি সম্ভবত নড়াইলের দিকে যেতে চেয়েছিলেন। তবে পথে দুর্গম চাঁদের বিল পড়ায় তিনি আবার ফিরে আসেন। অতঃপর বাসুড়ি শুভরাড়া, সিদ্ধিরপাশা, দিঘলিয়া, সেনহাটি, চন্দনীমহল হয়ে

www.nagorikpathagar.org

আতাই নদী অতিক্রম করে তিনি সেনেরবাজারের কাছে উপনীত হন। বাসুড়ী শুভরাড়া প্রভৃতি স্থানে তাঁর অনেক কীর্তি ছড়িয়ে রয়েছে। এখানে তিনি কিছুদিন অবস্থান করেন বলেও শোনা যায়। শুধু বাসুড়ি শুভরাড়া নয়– তাঁর চলার পথে অসংখ্য কীর্তি ছড়িয়ে রয়েছে। এসব কীর্তিকে খাঞ্জেলি বা খাঞ্জেখাঁর কীর্তি বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। বলা হয় রাস্তা বা জলাশয় খনন করতে করতেই তিনি এগিয়ে যেতেন। পথিমধ্যে খানজাহান ও তাঁর অনুচরবর্গ যখন বিশ্রাম নিতেন বা আহরাদির জন্য সময় কাটাতেন তখন তাঁর কর্মী বা সৈন্য–সামন্তরা স্থানীয়দের সঙ্গে নিয়ে বড় বড় দীঘি বা পুকুর খনন করে ফেলতেন। পূর্বেই খানজাহানের সেনেরবাজারে উপনীত হওয়ার কথা বলেছি। সেনেরাজার তখন সম্ভবত লোকালয়ের শেষ সীমানা ছিলো। এর দক্ষিণ দিক তথা ভৈরব নদীর এ পাড় তখন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিলো। এখন যেখানে মহানগরী খুলনা তখন সে স্থান পরিপূর্ণ রূপে জঙ্গলাকীর্ণ ছিলো। এই স্থান থেকেই সুন্দরবনের আরম্ভ ছিলো।

সেনেরবাজারের নিকটে এসে খানজাহান তাঁর বাহিনী নিয়ে ভৈরব নদী অতিক্রম করেন। তারপর এর দক্ষিণ তীরের তালিমপুর, শ্রীরামপুর, নৈহাটি, সামন্তসেনা, বাহিরদিয়া, আট্টাকা, সাতসৈয়ার মধ্যদিয়ে ব্রাহ্মণ রাংদিয়াতে উপনীত হন। এরপর তিনি মধুদিয়া, জাদরা এবং বাদোখালির বিলের উত্তর পাশ দিয়ে অগ্রসর হয়ে বাগেরহাটের কাছে প্রাচীন ভৈরবের তীরে সুন্দরঘোনা নামক স্থানে উপনীত হন। এরপর তিনি এখানে স্থায়ীভাবে বাকী জীবন কাটানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তখন সম্ভবত বাগেরহাট নামকরণ করা হয়নি। তিনি অবস্থান গ্রহণের পর এ স্থানের নাম হয় বারাকপুর। সম্ভবত এখানে খানজাহানের সৈন্যরা প্রথম আস্তানা গাড়ে বলেই এর নাম হয়ে যায় বারাকপুর। ব্যারাক অর্থ শিবির। এই স্থানে এখনও মজে যাওয়া প্রাচীন ভৈরবের চিহ্ন বর্তমান। এ ভৈরব নদী তখন সুন্দরঘোনার উত্তর পর্যন্ত এসে পূর্ব দিকে প্রবাহিত ছিল। নদী পাশে থাকাতেই সম্ভবত এ স্থানকে তার নিজের প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাপনের উপযোগী বলে মনে হয়েছিল। তবে সে নদীর অস্তিত্ব এখন আর নেই। নদী মজে যাওয়ার পর সেখানে গ্রামের পত্তন হয়। মরা নদীর ওপর গ্রামের পত্তন হয় বলে এর নাম মরগা বলে কথিত আছে।

তিন.

Kahan-al-Azam Khan Jahan or Ulugh Khan Jahan is a legendary name in the history of Bangladesh. A person of obscure parentage, he was probably a representative of Gaur, the Seat of the Government of Bengal during the independent Sultanate. He is reputed to be the son of Alaul Huq and the brother of Nur-Qutub-

www.nagorikpathagar.org

ul-Alam, the saint. His real name is Azam Kha. His presence in Bagerhat coincides with the rule of Nasiruddin Mahmud Shah (1442-1459 A.D) of Gaur. The date of the demise of Khan Jahan is 24th, October 1459 A.D. He was married but had no offspring. He was born on Bangladeshi soil but his ancestry is either Turkish or Arab.

He is said to have been the commander-in-cheif of the armed forces deployed in the coastal area of Bangladesh. The Sultan of Bengal at that time had continuous warfare and confrontation with the Hindu kings of Orisssa. King Kapilendra Deva (1434-1470 A.D) of the Surya dynasty of Orissa was the contemporary of Sultan Nasiruddin Mahmud Shah of Gaur. Naval warfare was prevalent at that time in Bengal.

The area of Khan Jahan, so far as we know, is from Jhenidah to Jessore, Satkhira, Khulna, Bagerhat, Barisal, Patuakhali, Mymensingh and Dhaka. It is very interesting that though the history of the man is not clearly known, his works are very remarkable. The monuments and istes associated with the name of Khan Jahan are as follow : 1. Singdaha Auliya Mosque, Jhenidah; 2. Satgaachiya Gayebana Mosque, Jhenidah; 3.Gorar Mosque, Jhenidah; 4. Tomb of Garib Shah, Jessore, 5. Tomp of Burhanuddin Shah, Jessore; 6. Shubharada Mosque, Abhoynagar, Jessore; 7. Mosque of Arashnagar, Dumuriya, Khulna; 8. Masjidkur Mosque, Koyra, Khulna; 9. Shait Gumbad Mosque, Bagerhat; 10. Tomb of Khan Jahan, Bagerhat; 11. Tomb of pir Ali, Bagerhat; 12. Mosque near the Tomb of Khan Jahan, Bagerhat; 13. Reza Khoda Mosque, Bagerhat; 14. Nine Domed Mosque, Bagerhat; 15. Zinda Pir comnplex, Bagerhat; 16. Rana Vijoypur Mosque, Bagerhat; 17. Singar Mosque, Bagerhat; 18. Bibi Begni's Mosque, Bagerhat; 19. Chunakhola Mosque, Bagerhat; 20. Ten Domed Mosque, Bagerhat; 21. Kasba Mosque, Barisal; 22. Masjidbariya Mosque; Patuakhali; 23. Mosque of Ghagra, Mymenshingh and 24. A Mosque in Dhaka city etc.

Thus the works associated with Khan Jahan cover a vast area of southern Bangladesh. Khan Jahan is said to have built roads from Jessore to Satkhira and from Jessore to Bagerhat through Murali Kasba, Paygram kasba, Dighaliïa and Senhati. He also made many streets in Bagerhat. There are many tanks all over this area dug by

www.nagorikpathagar.org

himself or his followers. There was a gateway at that time created after his name in Dhaka city. It was located in front of the above mentioned mosque. Thus his area further extends to the east. It is to be mentioned here that the monuments of Khan Jahan do not contain any date of their construction.

(খান-আল-আজম খাঁ জাহান অথবা উলুঘ খানজাহান বাংলাদেশের ইতিহাসে এক প্রসিদ্ধ নাম। তার বংশ পরিচয় সম্পর্কে স্পষ্ট জানা যায়নি। ধারণা করা হয় তিনি তৎকালীন বাংলার স্বাধীন সালতানাত গৌড় রাজ্যের প্রতিনিধি ছিলেন। এ-ব্যাপারে প্রসিদ্ধি আছে যে তিনি আলাওল পুত্র এবং সাধক নূর-কুতুব-উল-আলম এর ভাই। তাঁর প্রকৃত নাম আজম খান। বাগেরহাটে তার উপস্থিতি ছিলো গৌড়ের নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ (১৪৪২-১৪৫৯) খ্রীঃ এর সমসাময়িককালে। খানজাহানের (রহ.) ইন্তিকালের তারিখ ২৪ অক্টোবর ১৪৫৯ খ্রীঃ। তিনি বিবাহিত ছিলেন কিন্তু কোনো সন্তান-সন্ততি ছিলো না। তিনি এদেশেই জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু তার পূর্বপুরুষরা ছিল তুর্কী অথবা আরবি।

কথিত আছে, তিনি বাংলাদেশের উপকূলবর্তী বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চীফ ছিলেন। সে সময় বাংলার সুলতান উড়িষ্যার হিন্দু রাজার সাথে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। উড়িষ্যার সূর্য রাজবংশের রাজা কপিলেন্দ্র দেব (১৪৩৪-১৪৭০ খ্রীঃ) গৌড়ের সুলতান মাহমুদ শাহের সমসাময়িক ছিলেন। আর সে সময় ব্যাপক নৌযুদ্ধ সংগঠিত হতো।)

চার.

যে সকল মহাপুরুষ অলী ও আওলিয়া দুনিয়াতে এসে নিজের সাধনা বলে আল্লার নৈকট্য লাভ করেছেন ও তাঁদের কর্ম ও কীর্তি বলে দুনিয়ায় চির অমর হয়ে আছেন হযরত পীর খানজাহান আলাইহের রহমাত তাঁদের মধ্যে অন্যতম। প্রায় ছয়শত বৎসর পূর্বে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু মহাকালের আকাশে ধ্রুত তারার মত উজ্জ্বল তাঁর শত শত কীর্তিরাজীর মধ্যে তিনি আজও বেঁচে আছেন ও ভবিষ্যতেও বেঁচে থাকবেন। আল্লাহ বলেন, "আল অলিও লায়ামুতু"- আল্লার অলি কখনও মরে না। তাই তিনি জিন্দা ও তাঁর বিস্ময় সৃষ্টিকারী কীর্তির মধ্য দিয়ে মানুষের অন্তরে শ্রদ্ধার পাত্র হয়েও তিনি জিন্দা। তিনি একজন আওলিয়া ছিলেন বলে মানুষ তাঁর মাজার জিয়ারত করলে ফায়দা হাসিল হয় বলে, হাজার

www.nagorikpathagar.org

হাজার মানুষ ভক্তিসহকারে নেকি হাসিলের উদ্দেশ্যে নেক বাসনাপূর্ণ হওয়ার মানসে, বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার আশায়, আজও তার রওজা মোবারকে এসে হাজির হয়।

তিনি যে শুধুমাত্র একজন আউলিয়া ছিলেন ও ইসলামের খেদমত করেছেন মাত্র তাই নয়, তিনি একজন দূরদর্শী শাসক, ধর্মপ্রচারক ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন মহামানবও ছিলেন। তিনি এই অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা ও সমুদ্র উপকূলজুড়ে ডাকাতি, খুন ও রাহাজানির অবসান ঘটিয়ে একটি শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং সকল শ্রেণীর জনগণের কল্যাণের জন্য আত্মনিয়োগ করে তাঁদের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আউলিয়া হিসাবে সর্বশক্তিমান আল্লার দরবারে তাঁর কত বড় স্থান ছিল একথা আমরা সঠিকভাবে বলতে না পারলেও তাঁর কর্ম ও কীর্তি অবলোকন করে এ কথা আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, তিনি আল্লার সৃষ্টি মানুষকে ভালোবেসে, স্নেহ দিয়ে তাদের সার্বিক কল্যাণে আত্মনিয়োগ করে, এ দেশে জীবন ধারণে সাচ্ছন্দ এনে দিয়ে, মানুষের মনের মানুষ ও মাথার মুকুট হয়েছিলেন।

তাঁর শতশত কীর্তি মহাকালের নিষ্ঠুর আঘাতে যদিও আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে তবুও তাঁর সমস্ত স্মৃতিচিহ্ন মুছে ফেলা মহাকালের পক্ষে আজও সম্ভব হয়নি। যদিও পরবর্তীকালে কিছু সংখ্যক লোভী ও হিংসুক মানুষের হস্তক্ষেপের ফলে তাঁর অনেক কীর্তির চিহ্নও নেই, তবুও মানুষের মনে আজও তাঁর স্মৃতি অমর হয়ে রয়েছে। বাগেরহাটের কাড়াপাড়ার তৎকালীন প্রতাপশালী হিন্দু জমিদার বাবু উপাকান্ত রায় ও শ্রীকান্ত রায় মরগা গ্রামের পালপাড়ার ছয় গম্বুজবিশিষ্ট বৃহৎ মসজিদটি ভেঙ্গে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে পার্শ্ববর্তী বাগমারা গ্রামে পুরানো ইটের ঐতিহ্য সৃষ্টির মানসে তাদের একটি কাছারী বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন।

স্থানীয় খোন্দকার বংশের কেউ কেউ লোভের বশবর্তী হয়ে সোনাবিবির বাড়ির দেওয়াল ও তার ইটগুলি বিক্রি করেছেন। কেউ কেউ আবার মূল বাড়িটি ভেঙ্গে তার ইট দিয়ে রাস্তা তৈরি করিয়েছেন। শুধুমাত্র কাড়াপাড়ার এই দুই হিন্দু জমিদারই নয়, বনগ্রাম ও নড়াইলের অন্যান্য জমিদারবৃন্দ মিলেও চেষ্টা করেছেন পুরানো মুসলিম ইতিহাসের উপাদানকে ভেঙ্গে ধূলিসাৎ করে দিতে। তারা মিথ্যা প্রবাদের সৃষ্টি করে, স্বপ্নে দেখার অজুহাতে ইসলামের এই প্রতিনিধির নামে কলঙ্ক লেপন করতে চেষ্টা করে এবং তার মাজার ও মসজিদকে হিন্দুদের দুর্বল বাধাকে উপেক্ষা করে তারা তাঁর নির্মিত সুন্দর সুন্দর বহু মসজিদ ভেঙ্গে ফেলেছেন। অপূর্ব মডেলে প্রস্তুত তাঁর বাড়িটিকে ভেঙ্গে একটা মুসলিম পর্দানশীন বাড়ির ঐতিহ্যকে তারা নষ্ট করেছেন। অবশেষে অপারগ হয়ে তারা প্রচার করেছেন যে,

www.nagorikpathagar.org

হযরত খানজাহান আলী (রহ.) হিন্দুদের মন্দির ভেঙ্গে রাতারাতি এইসব মসজিদ তৈরি করেছেন। এত কীর্তি ধ্বংসের পরেও মহাকালের বুকে আজও তাঁর যা কিছু সৃষ্টি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাই-ই চিরকাল মানুষের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করবে। সেই সময়ে অর্থাৎ ছয়শত বৎসর পূর্বে মানুষের খাবার পানির অভাব দূর করতে তিনি যে শত শত দীঘি খনন করেছিলেন, আজও সেই দীঘির সুমিষ্ট পানি পান করে এ দেশের নর-নারী জীবন ধারণ করছে।

পাঁচ.

যে দেশ থেকেই হোক, যে শতকে এ-দেশে তিনি আগমন করেছিলেন। সে শতকে এ-দেশের অবস্থা ছিলো বড়ই করুণ। বাংলায় মুসলমান শাসকদের তখন একটা অধঃপতনের সময়। যদিও অনেক মুসলমান বাদশাহ গৌড়ে বাদশাহী করেছেন কিন্তু যে কারণেই হোক বঙ্গের সকল অঞ্চলে ইসলাম তখনও যথোচিত বিস্তার লাভ করেনি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সমস্ত বাগ্ধি অঞ্চল ছিলো সম্পূর্ণ ইসলাম বহির্ভূত একটি অঞ্চল। ফলে এই অঞ্চল হতেই মুসলিম বিদ্বেষের আগুন পরবর্তীকালে দানা বেঁধে উঠতে থাকে। স্বাভাবিক নিয়মেই এই প্রশ্ন এসে যায় যে, এই অঞ্চলের নিম্নশ্রেণির দুর্বল অমুসলমানগণের এইরূপ ধ্যান-ধারণার পৃষ্ঠপোষকতা কে করতেন? সেন রাজাদের প্রচলিত কৌলিণ্যবাদ ও বৌদ্ধ বিতাড়নের পরেও এমন কোনো প্রতিনিধি ছিলেন, যার ছত্রছায়ায় তারা লালিত-পালিত হতে থাকে? ইসলামের এইরূপ প্রতিদ্বন্দী কে ছিলেন? যিনি ইসলামের প্রচারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিলেন, যার ফলে এ দেশের ইসলাম প্রচার শুরু হয়েছিলো?

ইতিহাসের পাতায় দেখা যায়, ইসলামকে বাংলার বুক থেকে মুছে ফেলার মানসে ইসলামের প্রতিদ্বন্দী হিসাবে খাড়া হয়েছিলেন একমাত্র "রাজা কান"। ১৪০০ শতকের শেষের দিকে গৌড়ের রাজা ছিলেন রাজা গণেশ এবং ইনিই রাজা কান বলে পরিচিত ছিলেন। যদিও অনেক ইতিহাস-লেখক তাঁর ত্রুটি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে তাঁকে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাজা বলে আখ্যায়িত করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তিনিই ছিলেন চরম মুসলিম বিদ্বেষী। অত্যাচার ও উৎপীড়ক রাজা বলে ইতিহাসের পাতায় তার নাম উল্লেখ রয়েছে। তারয়ারিখে ফেরেশতায় তাঁকে গাদ্দায়ণ (নরপিচাশ) বলে অভিহিত করা হয়েছে। ঐ শতকে তার অত্যাচারে এ দেশ থেকে মুসলমান প্রায় নিঃশেষ হয়ে যেতে বসেছিল। তার আমলের মতো মুসলিম নারী ও শিশু নির্যাতন বাংলার ইতিহাসে ইতিপূর্বে আর কখনও ঘটেনি। পর্দানশীন বহু মুসলিম রমণীকে তিনি বদ্ধ গৃহে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করে তাদের

www.nagorikpathagar.org

পর্দাকে পরীক্ষা করেছেন। বহু শিশুকে হস্তী পদতলে নিক্ষেপ করেছেন। তার অত্যাচারের ভয়ে বহু মুসলিম অসহায় শিশু ও স্ত্রী ফেলে জঙ্গলে পালাতে বাধ্য হয়েছে। এই সময়ে অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলমান মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করছিলো ও আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনায় রত ছিলো। অবশ্য তারয়ারিখে ফেরেশতায় তার জীবনের শেষের দিকে পরিবর্তনের কথার উল্লেখ রয়েছে।

রাজা গণেশের অত্যাচারের চরম মুহূর্তে জৌনপুরের বাদশার এক সেনাপতি রাজা–গণেশকে আক্রমণের কথা ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে। বাদশার আদেশে তিনি সর্বপ্রথম রাজা গণেশের রাজধানী গৌড় আক্রমণ করেন (১৪০৯/১০)। রাজা গণেশকে পরাজিত করেও কোনো এক অজ্ঞাত কারণে তিনি আর জৌনপুর বাদশার সেনাপতির কাজে যোগদান করেননি। পরবর্তীকালে রাজা গণেশের চুক্তিভঙ্গের কারণে তিনিই রাজা গণেশকে দ্বিতীয়বার আক্রমণের প্রস্তুতি নেন। আমার ধারণা, ইতিহাসের এই ব্যক্তি আমাদের আলোচ্য খানজাহান আলী (র.) ছাড়া আর কেউ নন। তাঁর এই অঞ্চলে আগমনের সময় ও রাজা গণেশের রাজত্বকালের সময় একই। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা গিয়েছে যে যখন মানুষ মানবিক আচরণ ভুলে গিয়ে অমানবিক ও জাহেলী আচরণ শুরু করেছে তখনই সেখানে তার বিপরীত শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে, সে পৃথিবীর যেখানেই হোক না কেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে খলিফাতাবাদ রাজ্য সম্পর্কে আলোচনা করার আগে খেলাফত সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। তাতে করে হযরত খানজাহানের খলিফাতাবাদ রাজ্য প্রতিষ্ঠার আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক জানা যাবে।

কুরআনের বিধান মতে মানবীয় শাসনের সত্যিকার রূপ হচ্ছে, রাষ্ট্র আল্লাহ এবং রাসূলের আইনগত কর্তৃত্ব (Legal Supermacy) স্বীকার করে তার সপক্ষে সার্বভৌমত্ব (Sovereignty) ত্যাগ করবে এবং আসল শাসকের অধীনে খেলাফত (প্রতিনিধিত্ব)– এর ভূমিকা গ্রহণ করবে। এ–ক্ষেত্রে তার ক্ষমতা ও ইখতিয়ার আইনগত, প্রশাসনিক বা বিচার সম্বন্ধীয় যাই হোক না কেনো – উপরে আল্লাহর আইনের সার্বভৌমত্ব, রাসূলের মর্যাদা ও উর্ধতন আইন অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশের চৌহদ্দীর মধ্যে অবশ্যই সীমিত থাকবে :

– (হে নবী) আমি তোমার প্রতি এ কিতাব সত্য–সঠিকভাবে নাযিল করেছি। তা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতা প্রতিপন্ন করে এবং তার হেফাজত করে। সুতরাং আল্লাহ যা কিছু নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী লোকদের মধ্যে তুমি ফায়সালা করো। আর মানুষের খাহেশের অনুবর্তন করতে গিয়ে তোমার নিকট আগত সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে না। [আল কুরআন]।

www.nagorikpathagar.org

- হে দাউদ। আমি তোমাকে জমিনে খলিফা (প্রতিনিধি) করেছি। সুতরাং তুমি সত্যানুযায়ী মানুষের মধ্যে ফায়সালা করো এবং নফসের খায়েশ (মনের অভিলাষ এবং কামনা বাসনা)–এর অনুসরণ করো না। এমন করলে তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে। [আল– কুরআন]।

  কুরআনে এ–খেলাফতের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তা হচ্ছে, জমিনের বুকে মানুষ যে শক্তি–সামর্থ্য লাভ করেছে, তা সবই সম্ভব হয়েছে আল্লাহর দান ও অনুগ্রহে। আল্লাহ মানুষকে এমন মর্যাদা দান করেছেন, যার ফলে মানুষ আল্লাহ্‌প্রদত্ত শক্তি–সামর্থ্য অনুযায়ী তাঁরই দেয়া স্বাধীন ক্ষমতা বলে তাঁর জমিন ব্যবহার করে। এ–জন্য দুনিয়ার বুকে মানুষের স্বাধীন মালিকানা নেই। বরং সে প্রকৃত মালিকের খলিফা বা প্রতিনিধি মাত্র।

- এবং স্মরণ করো, তোমার রব যখন ফেরেশতাদের বলেছিলেন, আমি জমিনে একজন খলিফা বানাবো। – [আল–বাকারা : ৩১]

- (মানবমণ্ডলী) আমি তোমাদেরকে জমিনের বুকে স্বাধীন কর্মক্ষমতা দিয়ে সংস্থাপন করেছি এবং তোমাদের জন্য তার অভ্যন্তরে জীবিকার উপায়–উপকরণ সরবরাহ করেছি। – [আল– আরাফ : ১০]

- তোমরা কি দেখতে পাও না যে, জমিনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ তোমাদের জন্য অধীন করে দিয়েছে? [আল–হজ্জ : ৬৫]

  জমিনের কোনোও অংশে যে জাতি ক্ষমতা লাভ করে, মূলত সে জাতি সেখানে আল্লাহর খলিফা :

- (হে আদ কওম) জমিনে আল্লাহ যখন তোমাদেরকে নূহের কওমের পরে খলিফা করেছিলেন, তখনকার কথা স্মরণ করো। – [আরাফ ঃ ৬৯]

- (হে সামুদ কওম) স্মরণ কর তখনকার কথা, যখন তিনি আদ কওমের পরে তোমাদেরকে খলিফা করেছিলেন। – [আল আরাফ : ৭৪]

- (হে বনী ইসরাঈল) সে সময় নিকটবর্তী যখন তোমাদের রব তোমাদের দুশমন (ফেরাউন)–কে ধ্বংস করে তোমাদেরকে জমিনে খলিফা করবেন। এবং তিনি দেখবেন, তোমরা কেমন কার্যকর। – [আল–আরাফ : ১২৯]

- অতঃপর তাদের পরে আমি তোমাদেরকে জমিনে খলিফা করেছি, তোমরা কেমন কাজ কর, তা দেখার জন্য। – [ইউনুস : ১৪]

কিন্তু এ–খেলাফত কেবলমাত্র তখনই সঠিক এবং বৈধ হতে পারে; যখন তা হবে সত্যিকার মালিকের (আল্লাহ তায়ালার) নির্দেশের অনুসারী। তা থেকে বিমুখ হয়ে যে স্বেচ্ছাচারমূলক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা হবে, তা খেলাফত হবে না। বরং খেলাফতের পরিবর্তে তা হবে "বাগওয়াত" তথা প্রকাশ্য বিদ্রোহঃ

www.nagorikpathagar.org

- তিনি তোমাদেরকে জমিনে খলিফা করেছেন। অতঃপর যে কুফরী করবে তার কুফরী তার ওপর শাস্তিস্বরূপ আপতিত হবে। আর কাফেরদের কুফরী তাদের রব-এর কাছে তার গজব ছাড়া অন্য কোন বিষয় বৃদ্ধি করতে পারে না। কাফেরদের জন্য তাদের কুফরী কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি করতে পারে। - [আল ফাতের : ৩৯]
- তুমি কি দেখোনি, তোমার রব আদ-এর সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন? এবং সামুদ-এর সাথে; যারা উপত্যকায় পাথর কেটেছিল (গৃহ নির্মাণের জন্য) এবং খুঁটি-তাঁবুর অধিকারী ফেরাউনের সাথেও যারা দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করেছিল? [আল : ফজর]
- (হে মুসা) ফেরাউনের কাছে যাও। সে বিদ্রোহী হয়ে গেছে। ফেরাউন লোকদের বলেছিলো, আমিই তোমাদের সবচেয়ে বড় রব-পালনকর্তা-পরওয়ারদেগার। [আন-নাযেআত: ১৭-২৪]
- তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের সাথে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদেরকে জমিনে খলিফা করবেন, যেমন তিনি খলিফা করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে .... তারা আমার বন্দেগী করবে, আমার সাথে অন্য কিছুকেই শরীক করবে না।

কোনো ব্যক্তি গোষ্ঠী বা দল এ-বৈধ এবং সত্য-সঠিক ধরনের খেলাফত (প্রতিনিধিত্ব)-এর একক ধারক-বাহক নয়। বরং যে দল (Community) উপরোক্ত মূলনীতিগুলো স্বীকার করে সমষ্টিগতভাবে রাষ্ট্র-সরকার প্রতিষ্ঠা করে, সে দলই হয় এ-খেলাফতের ধারক-বাহক। সূরা নূর-এর ৫৫ নং আয়াতের বাক্যাংশ এ ব্যাপারে অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন। এই বাক্যাংশের আলোকে ঈমানদারদের জামায়াতের প্রতিটি ব্যক্তিই খেলাফতের সমান অংশীদার। সাধারণ মুমিনদের অধিকার হরণ করে তা নিজের কুক্ষিগত করার অধিকার কোনো ব্যক্তি-গোষ্ঠীর নেই।

কোনো ব্যক্তি বা দল নিজের স্বপক্ষে আল্লাহর বিশেষ খেলাফতের দাবিও করতে পারে না। এ-বিষয়টিই ইসলামী খেলাফতকে মুলুকিয়্যাত (একনায়কতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, রাজতন্ত্র) গোষ্ঠীতন্ত্র এবং ধর্মীয় যাজক-সম্প্রদায়ের শাসন থেকে পৃথক করে তাকে গণতন্ত্রাভিমুখী করে। কিন্তু ইসলামী গণতন্ত্র এবং পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এই যে, পাশ্চাত্য গণতন্ত্র জনগণের সার্বভৌমত্ব (Popular Sovereignty)-এর মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে ইসলামী গণতন্ত্রে (ইসলামের জমহুরী খেলাফত) জনগণ স্বয়ং আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে স্বেচ্ছায় সন্তুষ্টচিত্তে নিজেদের ক্ষমতা-ইখতিয়ারকে আল্লাহর বিধানের সীমার মধ্যেই সীমিত করে দেয়।

খেলাফত সম্পর্কে উল্লিখিত আলোচনার পরও খলিফাতাবাদ সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষকদের কিছু বক্তব্য তুলে ধরতে হচ্ছে :

www.nagorikpathagar.org

ক.

হযরত খানজাহান আলী সর্বপ্রথম বারোবাজারে কিছুদিন অবস্থান করার পর চলে যান মুড়লী, যেখানে বর্তমান আধুনিক যশোর শহর। মুড়লী হতে তার অনুচরদের একদল সুন্দরবন অঞ্চলে ও অন্যদল যার নেতৃত্বে স্বয়ং তিনি ছিলেন, ভৈরব তীর হয়ে পয়গ্রাম কসবায় যেয়ে পৌছায়। এখানে অল্প কিছুদিন অবস্থানের পর খানজাহান বাগেরহাটের সন্নিকটে ভৈরব নদী তীরে সুন্দরঘোনা পৌছান এবং এই ভৈরব নদীর দক্ষিণ তীরেই সুন্দরঘোনায় তার শহরের পত্তন করেন। আর এই শহরই ছিলো তাঁর প্রশাসনিক কেন্দ্র ও রাজধানী। এখানে বসেই তিনি তাঁর শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। পূর্ববর্তী সকল স্থানে তিনি তাঁর কার্য পরিচালনার জন্য নিজস্ব প্রতিনিধি রেখে আসেন। গৌড় হতে রওনা হয়ে এতদূর পৌছাতে তিনি তেমন কোনো শত্রুপক্ষ দ্বারা বাধার সম্মুখীন হননি। খানজাহান আলী তাঁর সর্বশেষ অবস্থানস্থল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এখানকার নামকরণ করেন খলিফাতাবাদ বা প্রতিনিধির কর্মস্থল। যার বর্তমান নাম বাগেরহাট। খানজাহান আলীর আগমনকালে দক্ষিণাঞ্চলের অধিকাংশ স্থান ছিলো বনাঞ্চল। বন-জঙ্গল সাফ করে তারা দক্ষিণবঙ্গকে বসতির উপযুক্ত করে গড়ে তোলেন। দক্ষিণবঙ্গে আগমনের প্রথম হতেই খানজাহান আলী স্বাধীনভাবে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। জনগণও তার নেতৃত্বকে পুরাপুরি গ্রহণ করেছিলো। গৌড়ের সুলতান তার বিষয়ে কোনরূপ বাধা দেননি। পরবর্তীতে তিনি সুলতান নাসির উদ্দীনের সময়ে তারই সনদ নিয়ে দক্ষিণবঙ্গ শাসন করেন। সুলতান শাসক খানজাহান আলীর কোনো কাজে হস্তক্ষেপ করতেন না। ফলে তিনি একরূপ স্বাধীনভাবেই রাজকার্য পরিচালনা করতেন। তবে তিনি স্বাধীন রাজা–বাদশার ন্যায় চলতেন না। এমনকি তিনি নিজের নামে কোনো মুদ্রার প্রচলন করেননি। এ থেকে বুঝা যায় খানজাহান আলী (রঃ) অনাড়ম্বর জীবন–যাপনকে পছন্দ করতেন। তবে তার ইন্তিকালের পর বঙ্গের স্বাধীন সুলতান হোসেন শাহের সময় তাঁরই প্রতিষ্ঠিত খলিফাতাবাদে গড়ে ওঠে ঐতিহাসিক খলিফাতাবাদ টাকশাল। পরবর্তী ৪০/৫০ বছর এই টাকশাল হতেই বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মুদ্রা তৈরি হতো।

খানজাহান আলী তাঁর দীর্ঘ শাসনামলে এই অঞ্চলের ব্যাপক উন্নতি সাধন করেন। প্রায় ২০/২৫ গ্রাম নিয়ে তাঁর রাজধানী খলিফাতাবাদ নগরী গড়ে ওঠে। এখানে খানজাহান আলী নিজের বাসভবন, প্রশাসনিক কেন্দ্র ও সেনানিবাস বা ব্যারাক ও অস্ত্রাগার নির্মাণ করেন। তার প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে ছিলো থানা নির্মাণ, চৌকি নির্মাণ, বিভিন্ন সরকারি দফতর, কোর্ট–কাছারী ইত্যাদি। প্রশাসন চালানোর সুবিধার্থে তিনি তাঁর আওতাধীন দক্ষিণবঙ্গকে কয়েকটি এলাকায় বিভক্ত করেন। মানুষের ঘরে ঘরে পৌছে দেন সুশাসন। বিখ্যাত ষাটগম্বুজ মসজিদ ছিলো তাঁর দরবারগৃহ। এখানে বসে তিনি তাঁর শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। তিনি তার

www.nagorikpathagar.org

নগরীকে এমন সুসজ্জিত ও শৃঙ্খলিত করেন যে, সুলতানী আমলের এটি একটি বিরল উপমা হয়ে আছে। হযরত খানজাহান আলী (রহ.) প্রায় চল্লিশ বছর অর্থাৎ মৃত্যুপূর্ব পর্যন্ত এই অঞ্চল শাসন করেন।

আমরা তাঁর এই অঞ্চলকে একটি ছোটখাটো রাজ্য হিসাবে ধরতে পারি। তাই আমরা দেখতে পাই, তিনি শুধু ইসলাম প্রচারক বা সমাজসেবী হিসাবে নয়, বরং তিনি একজন সুশাসক হিসাবেও জনগণের কাছে খ্যাতি লাভ করেন। জনবসতি গড়ে তিনি সেখানে প্রশাসনিক ব্যবস্থা জোরদার করেন। এবং সমগ্র রাজ্যে ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে সক্ষম হন। তিনি তাঁর শাসনামলে এই অঞ্চলকে বহিরাক্রমণ হতে মুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং রাজ্যকে একটি প্রাচুর্যময় রাজ্য হিসাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হন।

খ.

বাগেরহাটে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি একে তার এ রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র তথা রাজধানী হিসাবে গড়ে তোলায় মনোনিবেশ করেন। তিনি ধীরে ধীরে একে এক ঐতিহাসিক নগরী হিসাবে গড়ে তোলেন। তবে আধুনিক নগরীর সাথে যার কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ শহরের নামকরণ করা হয় হাবেলী কসবা বা বাসস্থানের শহর। পূর্বেই বলেছি, তাঁর সৃষ্ট তিনটি ঐতিহাসিক জনপদই কসবা নামযুক্ত। এগুলো হল মুড়লী কসবা, পয়োগ্রাম কসবা এবং হাবেলী কসবা। হাবেলী কসবা তাঁর এক অসাধারণ সৃষ্টি। এর আর এক নাম দেয়া হয় খলিফাতাবাদ। খলিফতে আবাদ অর্থাৎ প্রতিনিধির কর্মস্থল। পূর্বেই বলেছি প্রতিনিধির অর্থে তিনি কার প্রতিনিধি ছিলেন এটাই প্রশ্ন। দিল্লীর না বাংলার স্বাধীন সুলতানদের? বাংলা তখনও দিল্লীর পদানত হয়নি। বাংলা তখনও স্বাধীন।

তাই তিনি বঙ্গের স্বাধীন সুলতানদের প্রতিনিধি হিসাবেই এ অঞ্চল শাসন করেন বলে ধরে নেয়া যুক্তিসঙ্গত। গৌড়ের সুলতানদের প্রতিনিধির প্রতিনিধি হিসাবে তিনি এ অঞ্চল পরিচালনা করেন বলে এর নাম হয় খলিফাতাবাদ বা প্রতিনিধির শহর। নাসির উদ্দীন মাহমুদ শাহ তখন গৌড়ের স্বাধীন সুলতান। খানজাহান সম্ভবত তার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে তার প্রতিনিধি হিসাবেই এ অঞ্চল শাসনে মনোনিবেশ করেন।

এর থেকেই তাঁর রাজ্যের নাম হয় খলিফাতাবাদ। কথিত আছে নাসির উদ্দীন মাহমুদ শাহ একটা সনদ দিয়ে খানজাহানকে সুন্দরবন আবাদের ভার দিয়ে দক্ষিণবঙ্গে প্রেরণ করেন।

www.nagorikpathagar.org

গৌড়ের সুলতানদের মধ্যে একমাত্র নাসিরুদ্দীন মাহমুদই 'খলিফাতোল মোসতায়ান বা আল্লাহর প্রতিনিধি উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। সেজন্য গৌড়ের সুলতানদের উপাধি অনুসারেই খানজাহান প্রতিষ্ঠিত শহরের নাম খলিফাতা বাদ হওয়াই স্বাভাবিক। সে যুগে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের প্রতীক ছিলো মুদ্রা। এ পর্যন্ত খানজাহানের নামাঙ্কিত কোনো মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়নি। সে থেকেও প্রমাণিত হয় যে তিনি হয়তো স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি বা নিজ নামে কোনো মুদ্রা প্রচার করতে চাননি। গৌড়ের সুলতানদের প্রতিনিধি হিসাবেই কাজকর্ম চালিয়ে গেছেন।

পূর্বেই বলেছি খানজাহান কর্তৃক সৃষ্ট খলিফাতাবাদ ছিলো একটা ঐতিহাসিক নগরী। সে যুগের প্রেক্ষিতে এ শহর ছিলো খুবই সুপরিকল্পিতভাবে নির্মিত এবং বিরাট এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এ শহর লম্বায় প্রায় ৭-৮ মাইল এবং প্রস্থে ৩-৪ মাইল ছিলো। বাগেরহাট বিজয়ের পর তিনি প্রায় ৩০/৪০ বৎসর জীবিত ছিলেন বলে মনে করা হয়ে থাকে। এই দীর্ঘ সময় ধরে তিনি মনের মতো করে এ শহরকে গড়ে তোলেন। বহু দীঘি খনন করেন, অনেক মসজিদ ও ইমারত নির্মিত হয়। শুধু দীঘি বা মসজিদ-ইমারত নয়, রাস্তা নির্মাণেও তিনি ছিলেন বিশেষ দক্ষ। তিনি জানতেন, সুন্দর রাস্তাঘাট ব্যতীত যাতায়াতের সুবিধা ও নগরীর শোভা বর্ধিত হতে পারে না। এজন্য তিনি শহর ও শহরতলীর নানাস্থানে অনেক রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন। এসব রাস্তার অধিকাংশ ছিলো ইট দ্বারা নির্মিত।

খানজাহানের পরিচয় অস্পষ্ট হলেও তিনি তাঁর কীর্তিরাজির মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে জীবন্ত হয়ে আছেন। তার অনেকগুলি কালের করাল গ্রাসে বিলীন হয়ে গেছে। তবে যা গেছে তার জন্য দুঃখ করে লাভ নেই- যা আছে তার মূল্যও কম নয়। এই কীর্তিসমূহ আজ আর বাগেরহাট বা বাংলাদেশের সম্পদ নয়- তা আজ সারাবিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নসম্পদ। আজ তা ইউনেস্কো (জাতিসংঘের বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা UNESCO) কর্তৃক তালিকাভুক্ত বিশ্ব-ঐতিহ্যের (World Heritage) অঙ্গ। সুতরাং এর মধ্যেই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন মানব কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ শাসক দরবেশ হযরত খানজাহান।

জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহের মিশরের উসমানীয় খলিফার নিকট থেকে খলিফাতুল্লা উপাধি প্রাপ্তির সংবাদ পেয়ে সুলতানের ওপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে, রাজদরবারে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এবং সুলতানের আনুগত্যের ও খেতাব প্রাপ্তির স্বীকৃতির নিদর্শনস্বরূপ তিনি এই 'সুন্দরঘোনা' দীপের নাম বদলে রেখেছিলেন 'খলিফাতা বাদ'। আর এর আরো একটি অন্তর্নিহিত রূপ ছিল। তিনি ছিলেন আল্লাহর 'খলিফা' অর্থাৎ মানুষ আল্লাহর খলিফা এবং জাগতিক দিক থেকে তিনি ছিলেন তাঁর মুর্শিদ হযরত নূর-কুতুবুল-আলম (র)-এর আধ্যাত্মিক খলিফা।

www.nagorikpathagar.org

আর সমগ্র দ্বীপটির নাম যে তিনি 'সুন্দরঘোনা' রেখেছিলেন তার আরও একটা প্রমাণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, 'ঘোণা' অর্থাৎ ঘোড়ার নাক, এর গঠনাকৃতি ছিলো দ্বীপটির পূর্ব দক্ষিণ সীমান্তের চিতলী ও বৈটপুর গ্রামের শেষ প্রান্তে। তাই 'সুন্দরঘোনা' নামকরণ সেই এলাকায় হওয়াই যুক্তিসংগত ছিলো। অথচ তা না হয়ে দ্বীপের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে উক্ত নাম দেখা যায়। অতএব এটা নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে যে, সমগ্র দ্বীপটির নামকরণ করেছিলেন 'সুন্দরঘোনা' এবং খলিফাতাবাদ নামকরণের পর পীর কেবলার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদ ও ঘোড়াদীঘি যে এলাকায় অবস্থিত, সুন্দরবনের পাশে সেই এলাকার নাম 'সুন্দরঘোনা' রেখে যোগ করেছিলেন আর একটি ঐতিহাসিক স্মৃতি।

পরে খলিফাতাবাদে তাঁর নিজের ও সঙ্গী অনুসারীদের প্রত্যেকের জন্য হাবেলী নির্মাণ করে সেই স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রাখবার উদ্দেশ্যে খলিফাতাবাদ নামের আগে হাবেলী যোগ করে রেখেছিলেন 'হাবেলী খলিফাতাবাদ অর্থাৎ বাসস্থানের খলিফাতাবাদ- কোনো রাজধানীর বা কোনো রাজ্যের নাম নয়।

গ.

হযরত খানজাহান অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন। হযরত খানজাহান অকুতোভয় সেনাপতি ছিলেন। হযরত খানজাহান খলিফাতাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এবং এ-রাজ্যের স্বাধীন খলিফা ছিলেন, একপ্রকার নিশ্চিত হয়েই বলা যায়। যে-সব কারণে নিশ্চিত হওয়া যায় তা হলো :

ক. অবিসংবাদিত নেতা যদি না হবেন, তাহলে তার উপাধি উলুঘ হবে কেন? উলুঘ মানেই নেতা, সর্বাধিনায়ক।

খ. খলিফাতাবাদ রাজ্য যদি সার্বভৌম একটি রাষ্ট্রের নাম না হবে, তাহলে ঐ রাজ্যের নামে মুদ্রা পাওয়া যাবে কেন? যে-মুদ্রা এখনো ঢাকার যাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে।

গ. বঙ্গদেশের বিভিন্ন ভূ-ভাগে ইসলাম প্রচার করেছিলেন অনেক-অনেক মহান ব্যক্তিত্ব। তাদের কারোরই তো উলুঘ খানজাহানের মতো বিপুল পরিমাণে সৃষ্টিসম্ভার নেই, নেই রাষ্ট্রসুলভ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। কেনো নেই?

ঘ. খানজাহান আলী যদি স্বাধীন রাষ্ট্রপ্রধানই না হবে, তাহলে মোহাম্মদ তাহির নামে তার একজন প্রধানমন্ত্রী থাকবেন কেন? এবং সেই সময়ে কি খলিফাতাবাদের বাইরের অঞ্চলগুলোতেও প্রধানমন্ত্রীর পদ প্রদানের ব্যবস্থা ছিলো?

www.nagorikpathagar.org

ঙ. মসজিদে নববীই ছিলো রাসূলে খোদা (স:) এর প্রধান রাষ্ট্র পরিচালনা কেন্দ্র। ঠিক সেই আদলে ষাটগম্বুজ মসজিদকে কেনো উলুঘ খানজাহান প্রধান রাষ্ট্র পরিচালনা কেন্দ্র হিসাবে গ্রহণ করলেন?

চ. যশোরের দিকে বারোবাজার পার হয়ে, বাগেরহাটের দিকে আসবার পথে তার একটি বাহিনীকে কেনো তিনি সুন্দরবনে পাঠালেন? এই পাঠানোর পেছনে অন্যান্য প্রয়োজনের সঙ্গে নিশ্চয়ই সামরিক প্রয়োজন ছিলো। বস্তুত সামরিক প্রয়োজন তো রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্যেই।

ছ. একজন রাজাকে যথাযথভাবে আশ্রয় দিতে পারে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রই। খলিফাতাবাদ সত্যিকার অর্থেই স্বাধীন কোনো রাষ্ট্র না হলে, অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র না হলে, সাম্য এবং শান্তির রাষ্ট্র না হলে, আরাকানের বিতাড়িত বৌদ্ধ রাজা নরমিকলা উলুঘ খানজাহানের আশ্রয় গ্রহণ করতেন না।

শেষ কথা

ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে খানজাহান আলী সমাজসেবার ক্ষেত্রে এক বিপ্লব সাধন করেন। পনের শতকের গোড়ার দিকে তিনি বঙ্গে আগমন করেন। তিনি এখানে এসেই জনকল্যাণার্থে একে একে অসংখ্য দীঘি, রাস্তা, সেনানিবাস, সরাইখানা, বসতবাড়ি প্রভৃতি নির্মাণ করেন। এখনও তাঁর সমাজসেবামূলক কাজের অসংখ্য নিদর্শন দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্নস্থানে দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর এই জনহিতকর কাজের মূল উদ্দেশ্য ছিল জনগণের সেবা করা। ফলে তার আগমনের সাথে সাথে এ-অঞ্চলের জনগণের মনে এক নতুন আশার আলো সঞ্চারিত হয়। তারা খানজাহানের উন্নয়নমূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত হতে থাকে। মূলত খানজাহানের প্রচেষ্টাতেই এই বিস্তীর্ণ পল্ললময় লবণাক্ত দেশে ঘনবসতি ও সুন্দর বাসভূমির প্রবর্তন সম্ভব হয়েছিলো।

শাসক হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব অসাধারণ। তিনি রাজ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মানুষের ঘরে ঘরে সু-শাসন পৌছে দেন এলাকাবাসী মুগ্ধ হয়ে যায়। এ-ক্ষেত্রেও তিনি রাসূল (সা.)-এর আদর্শ অনুকরণ করেন। তিনি মসজিদভিত্তিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। তাঁর নির্মিত বিখ্যাত ষাটগম্বুজ মসজিদে বসে তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। আর তাঁর শাসনব্যবস্থার কেন্দ্র ছিল রাজধানী খলিফাতাবাদ।

সর্বোপরি খানজাহান (র) ছিলেন একজন মহান সাধক, এতদাঞ্চলের একজন বিশিষ্ট ওলী। তিনি সময় পেলেই আধ্যাত্মিক সাধনায় মশগুল থাকতেন। অপূর্ব চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে অসংখ্য লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। আল্লাহর এই মহান বান্দা হযরত খানজাহান আলী (র) ৮৬৩ হিজরীর ২৬শে জিলহজ, ইংরেজি ১৪৫৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর ইন্তিকাল করেন। তিনি আজ নেই, কিন্তু আছে

www.nagorikpathagar.org

তাঁর স্মৃতিচিহ্ন, আছে তাঁর ত্যাগ ও মহান আদর্শ, যা আমাদের জন্য চলার পাথেয় ও অনুকরণীয়। আমরা যদি তাঁর এই আদর্শকে আঁকড়ে ধরতে পারি তবে আমাদের জীবন হবে সার্থক ও সুন্দর।

কবি সৈয়দ ওমর ফারুক হোসেন তাঁর "হে হযরত খান-ই-জাহান" কবিতায় মর্মস্পর্শী ভাষায় যথার্থই প্রকাশ করেছেন :

হে হযরত খান–ই জাহান
বলিতে ব্যর্থ হয় ভাষা, তুমি কতো মহিয়ান।
শৈশব–কৈশোর পার হয়ে গেছে সে কবে
যৌবনে পড়েছি আমি সেও কবে;
তার বুঝি পার হয়ে যায়।
কাল জয়, তোমার কীর্তির পাশে বসে
সেদিনও ভেবেছি আমি আজও ভাবি
কে তুমি ? কি তোমার নাম ? কি তোমার পরিচয় ?
এখানে এসেছ কেনো ?
কি চেতনা লুকানো ছিল তোমার অন্তরে।
তোমাকে গোপন করেছো তুমি সকল প্রচেষ্টায়
তবুও তোমার নাম
মশহুর হতেছে শুধু দূর হতে দূরান্তরে।
তুমি লুকায়েছ কবরের মাঝে, কীর্তি লুকায় নাই
কেহ জানিবে না তোমার নাম, অভিপ্রায় ছিলো বুঝি তাই;
তোমার কীর্তির মাঝে যতোবার তোমাকে দেখি
ততোবার ভাবি কি তুমি নও ?
দিক শূন্য হয়ে যাই
আলো হতে ঃ অন্ধকারে খুঁজে ফিরি হয়রান
চক্ষু ম্লান, অন্ধ হয়ে যাই
তল্লাট খুঁজে খুঁজে ঝুলি ভরে নিয়ে আসি
কিছু কিংবদন্তি ইট আর পাথরের গল্পের রাশি।
যতোই খুঁজি না কেনো দিন হতে রাতে
এছাড়া কিছুই জোটে না বরাতে।
তোমার কীর্তির পানে তাকাই যখন
ভাবনা আসে মিছিলের মত।
ভাবি এ এদেশের বাদশা ছিলে তুমি
সৈন্য–সামন্ত ছিলো
ছিলো সেনাপতি আমাত্য পরিষদ।

www.nagorikpathagar.org

তবু তুমি হয়েছিলে সকলের আপনার জন;
অঙ্গুলি নির্দেশে তব
আকাশে উড্ডীন হতো ইসলামী বিজয় নিশান
উৎসর্গিকৃত হয়ে যেনো শত শত নিবেদিত প্রাণ।

কারুকার্যমণ্ডিত কীর্তির পানে চেয়ে ভাবি
সুনিপুন শিল্পী ছিলে তুমি
শিল্পীকে নির্দেশ তুমি দিতে;
সকল কীর্তিই তার দিতেছে প্রমাণ।

বিশাল দীঘি, অগণিত মসজিদ;
প্রমাণ করে
তার বিশালতা কতো
ভালোবেসে মাখলুক সেবা করে
কেটেছে তোমার –
মোসাফেল, সরাইখানা
সাক্ষ্য দেয় তার
সকল চূড়ামনি।
নিঃস্ব করে সবকিছু করে গেছ দান;
বছর ধরে
শীতল পানি
তপ্ত করে এদেশের কোটি কোটি প্রাণ।

দীঘির ঘাটে আজও বহে বেহেস্তি বাতাস
মাজারে আজিও বিরাজে বেহেস্তি সুবাস
রেখে গেছো তুমি, এক শান্তির নিকেতন;
এলে ব্যথা ভোলে যতোসব ব্যথাতুর মন।

হাজার লোক তোমার মাজারে আসে
কি অভিপ্রায়
তাদের হৃদয় পূর্ণ হয় তোমার দোয়ায়।
অশান্ত মনে শান্তি খুঁজে পেতে
কবর পাশে যখনই নীরবে বসি
কোনো স্বপ্নের দেশে চলে যাই
হারায়ে ফেলি পলকে পলকে;
কি খুঁজিতে গেলে
তোমাকে পায় যাকে তুমি নিভৃতে কাছে ডাকো
ভক্তের মনে উঁকি দিয়ে
পর্দার অন্তরালে থাকো।

www.nagorikpathagar.org

প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ
এক সর্বস্পর্শী প্রেরণা

[অগ্রন্থিত]

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

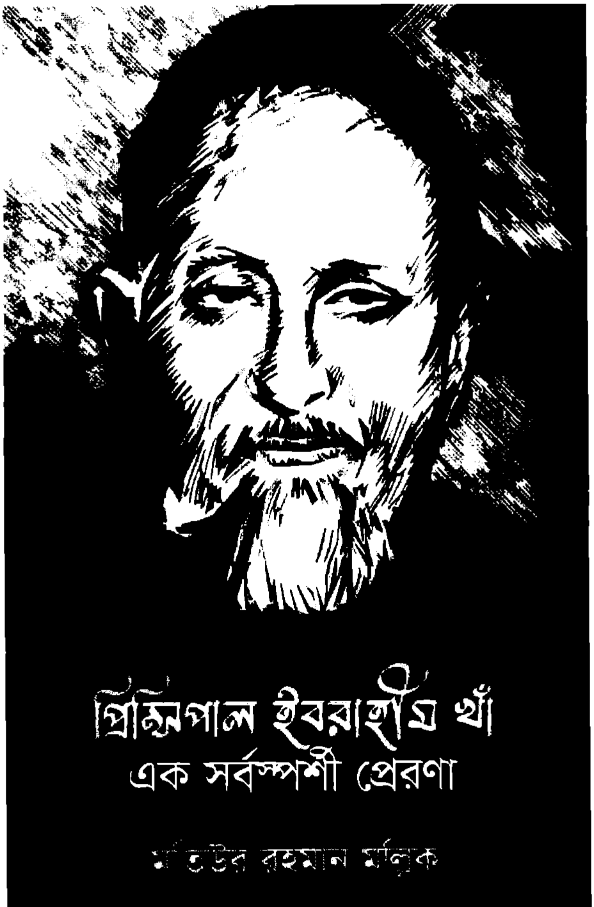

www.nagorikpathagar.org

প্রসঙ্গ কথা

'প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁঃ এক সর্বস্পর্শী প্রেরণা' কবি মতিউর রহমান মল্লিকের অপ্রকাশিত প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি। জনপ্রিয় পত্রিকা দৈনিক সংগ্রামে ৫ এপ্রিল ২০০২ থেকে ১৭ মে ২০০২ পর্যন্ত ৭টি পর্বে লেখাটি ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়। তবে পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি আমাদের সংরক্ষণে ছিলো না। দৈনিক সংগ্রামের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সাজজাদ হোসাইন খানের শরণাপন্ন হলে উনি পত্রিকার আর্কাইভ থেকে প্রকাশিত লেখা সবগুলি কপি আমাদেরকে দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। এ কাজে বিশেষ সহযোগিতা করেন কবি রেদওয়ানুল হক। কবি মতিউর রহমান মল্লিক খুব সংক্ষেপে তবে চমৎকারভাবে পাঠকের সামনে তুলে এনেছেন প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁকে। এখানে ইবরাহীম খাঁ'র ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য সাধনার মৌলিক বিষয়গুলি সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন তিনি। পাণ্ডুলিপিটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন আফসার নিজাম।

www.nagorikpathagar.org

প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ
এক সর্বস্পর্শী প্রেরণা

সাহিত্য বলি, সংস্কৃতি বলি, আর সমাজ বলি কিংবা শিক্ষা এবং রাজনীতির কথাই বলি- প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ আমাদের জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় প্রেরণা হয়ে আছেন এবং থাকবেনও। তাঁর অসামান্য অবদান কখনো ভুলে যাবার নয়, ভোলা সম্ভবও নয়। সম্ভব নয় এই জন্যে যে, এ দেশের অধিকাংশ মানুষ যখন অশিক্ষার অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে- সমস্ত প্রলোভন ত্যাগ করে- তখন তিনি তাদেরই পাশে দাঁড়িয়েছেন, শিক্ষার আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে অবিসংবাদিত অনুপ্রেরণার আদর্শ হয়ে।

একটি অধঃপতিত জাতিকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার জন্যে ইবরাহীম খাঁ তাঁর সবটুকু শক্তি এবং তাঁর সমস্ত সামর্থ্য ব্যয় করে ত্যাগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে গেছেন।

তিনি শুধু পড়ার জন্যে পড়েননি, লেখার জন্যে লেখেননি, গড়ার জন্যে গড়েননি বরং এক মহান উদ্দেশ্যে আজীবন কর্মবীরের ভূমিকা পালন করে গেছেন। প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁর তুলনা সত্যিই বিরল।

তাঁর শিক্ষাঙ্গন গড়ে তোলার উদ্দেশ্য, তাঁর সাহিত্য সাধনার উদ্দেশ্য, তাঁর সংস্কৃতি চর্চার উদ্দেশ্য, তাঁর রাজনীতি করার উদ্দেশ্য, তাঁর ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য সর্বোপরি জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে অকুতোভয় সৈনিকের ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্য একটাই- সর্বস্তরের মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও অগ্রগতি।

মরহুম দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ঠিকই বলেছিলেন : পলাশীর প্রান্তরে যখন এ দেশীয় মানব সমাজের চরম অধঃপতন ঘটে, যখন এ জাতি ক্রমশ দুর্দশার চরম স্তরে অধঃপতিত হয়, তখন নবাব আবদুল লতিফ এ জাতিকে পুনরায় উত্তোলনের যে মন্ত্র নিয়ে দেখা দিয়েছিলেন, ইবরাহীম খাঁ ছিলেন তারই উত্তরসূরী আবদুল লতীফের মতো তিনি তাঁকে কেবল মাত্র শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মক্ষেত্রে

www.nagorikpathagar.org

সীমাবদ্ধ রাখেননি, তিনি সকল ক্ষেত্রে এ জাতিকে পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে আজীবন সংগ্রাম ও সাধনা করেছেন।

দুই.

প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ এক ঐতিহ্যবাহী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। যে পরিবারের রক্তধারায় রয়েছে লড়াই করার প্রবণতা এবং আগ্রহ।

ইবরাহীম খাঁ-র জন্ম ১৮৯৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে টাঙ্গাইলের বিরামদি গ্রামে। তাঁর আব্বার নাম শাবাজ খাঁ। বিরামদি গ্রামে তাঁর আব্বা বাড়ি করেছিলেন নিকটবর্তী ফশলান্দি গ্রাম থেকে এসে।

ইবরাহীম খাঁর পূর্বপুরুষরা 'বাইশ গাঁ পাঠান' নামে পরিচিত ছিলেন। এই পরিবারের লোকেরা একদা বসতি স্থাপন করেছিলেন টাঙ্গাইল এবং সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন গ্রামে। তখন যমুনা নদী প্রশস্ত ছিলো না, প্রবলও ছিলো না। পাঠান পরিবারগুলো টাঙ্গাইল-সিরাজগঞ্জ এলাকায় এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন পাঠান সম্রাট শেরশাহের ইন্তেকালের পরে।

ইবরাহীম খাঁর বংশধারায় রয়েছে পাঠান সম্রাট শেরশাহের রক্ত।

তিন.

ইবরাহীম খাঁ স্বভাবগতভাবেই সচেতন মানুষ ছিলেন। এই সচেতনতা তাঁর মধ্যে স্কুল জীবনেই দেখা দিয়েছিলো। তাঁর প্রমাণ মেলে ইবরাহীম খাঁর নিজের লেখায়। তিনি লিখেছেন:

দেখলাম, এখানে [১৯০৭ সালে, পিংনা হাইস্কুলে অধ্যয়নকালে] মুসলমান ছেলের মনও নব বসন্তের আগমন সম্ভাবনায় দুলে উঠেছে। তারা অতীতের পানে চেয়ে দেখেছে এক গরিমাময় জাতীয় জীবনের অস্তমিত সূর্য, ভবিষ্যতের পানে অনন্ত ঔৎসুক্যের সাথে কান পেতে রেখেছে, যেনো শুনতে পাচ্ছে 'দিগন্তে'র ওপারে নতুনের প্রাণময়ী পদধ্বনি। দুইটি শক্তিধর পুরুষের প্রভাব তখন পিংনা স্কুলের মুসলমান ছেলেদের মনে ক্রিয়া করছে- তাঁদের একজন কবি কায়কোবাদ, আর একজন বাগ্মী ইসলমাইল হোসেন সিরাজী।

কায়কোবাদ সাহেব কিছুদিন আগে পিংনার পোস্ট মাস্টার ছিলেন। তাঁর 'মহাশ্মশান কাব্য' তিনি এখানেই শেষ করে বই আকারে ছাপান। আমি পিংনা গিয়ে তাঁকে পাইনি। কিন্তু দেখলাম পিংনার বহু মুসলমান ছেলের কাছে সেই

www.nagorikpathagar.org

বই। তারা পরম গৌরবের সাথে পড়ে, কি অতুল্য বাহুবলে পানি পথের ময়দানে আবদালীর বিক্রান্ত বাহিনীর রণদুর্মদ মারাঠা বীরদের শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলো। তাদের সে হাওয়া আমার গায় লাগলো। কতোবার যে মহাশ্মশান কাব্য পড়েছি, কতো আগ্রহে, কতো ব্যথায়, কতো আনন্দে। কাব্যের গানগুলোর রেশ এখনো স্মৃতির তারে বেজে ওঠে। এতো বছর পরেও মনে পড়ে, নিবেদিত চিত্ত ফকিরের সেই ভক্তি মুখর কণ্ঠ-

"তুহি আশা তুহি ভরসা
তুহি হৃদি রাণী
তুহি ভিন জ্ঞানহীন
কিছুই না জানি।"

কায়কোবাদ সাহেব এরপর মুক্তাগাছায় কিছুকাল পোস্ট মাস্টার ছিলেন। একদিন সেখানে তাঁর কাছে গিয়ে বললাম- আপনার একটি ক্ষুদ্র অজানা ভক্ত আপনাকে সালাম করতে এসেছে। তিনি চেয়ার থেকে উঠে এসে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর সাহিত্য সম্বন্ধে কতো কথা, কতো উপদেশ, কত উৎসাহ। ইবরাহীম খাঁ কতোটা সচেতন ছিলেন তার অনেক অনেক প্রমাণ তাঁর নিজের লেখাতেই রয়ে গেছে। এখানে আর একটি মাত্র প্রসঙ্গের অবতারণা করছি। ইবরাহীম খাঁ লিখেছেন :

আমি পিংনা থাকতেই সিরাজী সাহেব আর একবার পিংনা এলেন। হিন্দু-মুসলমান মিলে বিরাট সভার আয়োজন করলো। তিনি বক্তৃতা করলেন। বিষয় দেশের সেবা। অমন ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা তার আগে কখনো কোথাও শুনি নাই। তখন আমাদের চোখে আজাদীর স্বপ্নের আবেশ, আমাদের চিত্ত তখন দাউ দাউ শিখায় জ্বলে উঠতে উন্মুখ, সেই পরিবেশে তাঁর সেদিনের বক্তৃতা শ্রোতাদের মনে আগুন লাগিয়ে দিলো। তাঁর কণ্ঠ উচ্চ হতে উচ্চতর হয়ে ওঠে। আমি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনি, তারপর উচ্চতম গুরু গর্জনে আসে তাঁর সে আহ্বানের শরীর, ঘন ঘন শিউরে ওঠে, মনে হয় তখনি লাফ দিয়ে দাঁড়াই। এতো দীর্ঘ এতো সুন্দর এতো উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা অথচ কেউ একটিবার হাততালি দিলো না, তারা সমস্ত ভুলে কেবল মুগ্ধ মনে রোমাঞ্চিত দেহে শুনল আর শুনল।

পিংনা স্কুলে পড়াকালে ইবরাহীম খাঁ স্বাজাত্যবোধে, সমাজ ও সাহিত্য সেবায় উজ্জীবিত হন। পিংনার হাজী মযহার উল্লাহ- যিনি মহাকবি কায়কোবাদের মহাশ্মশান কাব্য প্রকাশে আর্থিক সাহায্য করেছিলেন- প্রতিদিন বিকেলে তারই বাড়িতে বসতো আড্ডা; পরবর্তী সময়ে ইবরাহীম খাঁ এবং তাঁর বন্ধুদের উদ্যোগে নিয়মিত আড্ডার একটি দিন নির্বাচিত করা হয় সাপ্তাহিক আলোচনা সভার জন্য। ইবরাহীম খাঁ-র মানস গঠনে এই আলোচনা সভার প্রভাব অনস্বীকার্য।

www.nagorikpathagar.org

ইবরাহীম খাঁ-র বয়স তখন কম ছিলো। কিন্তু মেধায়, চরিত্রে, সাহসে, উৎসাহে এবং গুণে ছিলেন অসাধারণ। সেই কারণে ঐ আড্ডায় খুব সহজেই তার স্থান হয়ে গিয়েছিলো।

হাজী মযহারউল্লাহ সাহেবের বাড়িতে সুলতান [সম্পাদক- মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, কংগ্রেস ঘেঁষা জাতীয়তাবাদী কাগজ], সঞ্জীবনী [সম্পাদক- কৃষ্ণকুমার মিত্র], মিহির ও সুধাকর [সম্পাদক- শেখ আবদুর রহীম, সরকার ঘেঁষা নরম দলের কাগজ] আসতো নিয়মিত এবং এই সব পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার ওপর হতো মুক্ত আলোচনা। আলোচনায় ইবরাহীম খাঁ'র ভূমিকা থাকতো সব সময়ই উজ্জ্বলতর।

হিন্দু যুব মানস গঠন এবং স্বদেশী আন্দোলনকে জোরদার করার জন্যে ব্রাহ্মণ্যবাদী নেতৃবৃন্দ তখন যাত্রা এবং থিয়েটারের ওপর বহুলাংশ গুরুত্ব দিয়ে চলেছে। অন্যদিকে স্কুল ছাত্র ইবরাহীম খাঁ, তাঁর আদর্শবাদী কিছু বন্ধু উদ্বুদ্ধ হলেন সিরাজুদ্দৌলা নাটক মঞ্চায়নের জন্যে। সার্বিক সহযোগিতা করলেন হাজী মযহারউল্লাহ সাহেব।

ঐ নাটকে একজন সেনাপতি এবং বিশেষ করে ঘষেটি বেগমের চরিত্রে অভিনয় করলেন ইবরাহীম খাঁ নিজে।

সর্ব শ্রেণির মুসলমানেরা সেইদিন যার পর নাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলো ঐ নাটকের মাধ্যমে।

১৯১২ সালে মোমেনশাহীর আনন্দমোহন কলেজে ভর্তি হবার মধ্য দিয়ে ইবরাহীম খাঁর কলেজ-জীবন শুরু হলো। নতুন উদ্যমে লেখাপড়া চলতে লাগলো তাঁর। পাশাপাশি চলতে লাগলো সাহিত্যচর্চা। বিশেষ করে বিভিন্ন সাহিত্য-সাধক এবং বিখ্যাত লেখকদের গ্রন্থ পাঠ করার পুরো সুযোগটাই কাজে লাগালেন এই সময়। জাস্টিস সৈয়দ আমীর আলীর পড়লেন হিস্টরি অব স্যারাসিনস এবং স্পিরিট অব ইসলাম।

গিরিশচন্দ্র সেনের লেখার সঙ্গে ইবরাহীম খাঁর মেলবন্ধন ঘটে যায় এই সময়ই। ব্রাহ্ম-ধর্মাবলম্বী ভাই গিরীশ চন্দ্র সেন কুরআন শরীফের বাংলা অনুবাদ করেন, মেশকাত শরীফেরও বাংলা অনুবাদ করেন। রসূলে খোদার (সা.) জীবনীসহ আরো কয়েকজন মহাপুরুষের জীবনী রচনা করেন। বস্তুত ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় ২৫টি গ্রন্থের রচয়িতা ভাই গিরিশচন্দ্র সেন। ধর্মীয় বিষয় নিয়ে গ্রন্থ রচনার সাহস খাঁ সাহেব এই ঢাকা জেলার পাঁচদোনা গ্রামের অধিবাসী গিরিশচন্দ্রের কাছ থেকে পান।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু এ সময় তিনি সবচেয়ে বেশী আহত হন বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' পড়ে, নবীন সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' পড়ে। কেননা এসব গ্রন্থ ছিলো বিদ্বেষে ভরা এবং হিংসায় আক্রান্ত।

আই এ পাস করার পর কোলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে- ভর্তি হবার মতো নাম্বার থাকার পরও- ইবরাহীম খাঁ ভর্তি হতে পারলেন না, মুসলমান হবার কারণে। ভর্তি হলেন রিপন কলেজে। মন টিকলো না সেখানে। অগত্যা ভর্তি হলেন সেন্ট পলস সি এম কলেজে। কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন রেভারেন্ড হল্যান্ড। হল্যান্ড সাহেব মাঝে মধ্যে ইবরাহীম খাঁর হোস্টেলের রুমে আসতেন। তিনি চাইতেন ইবরাহীম খাঁ লেখাপড়া শেষ করে ব্যবসা করুক। কিন্তু ইবরাহীম খাঁ চাইতেন লেখাপড়া শেষ করে ওকালতী করবেন, দেশ সেবা করবেন। এ ব্যাপারে একটি ঘটনা এই রকম : ইবরাহীম খাঁ বি এ পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এ সময় একদিন ইবরাহীম খাঁর হোস্টেলের কামরায় এলেন রেভারেন্ড হল্যান্ড। এ কথা সে কথার পর জিজ্ঞেস করলেন :

ইবরাহীম, পড়া শেষ করে তুমি কি করবে? ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হবে?

না, স্যার।

খুব খুশি হলাম। তোমাদের দেশের ভালো ছেলেদের সবারই ডেপুটি হওয়ার ব্যারাম হয় কি না, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।

না স্যার, অমন আকাঙ্ক্ষা আমার নাই।

বেশ, বেশ। আচ্ছা, তবে তুমি কি হতে চাও?

আমি উকিল হতে চাই।

খুশি হলাম না। কেনো উকিল হতে চাও, বলো দেখি?

দেশের কাজ করতে চাই, সেই জন্য।

ওই সময়ে প্রতি রবিবারে ইবরাহীম খাঁর হোস্টেলে আসতো খ্রিস্টান ধর্মবিষয়ক পত্রিকা 'এপিফ্যানি'। পত্রিকাটি পড়তে গিয়ে একদিন দেখলেন- ইসলামকে কটাক্ষ করে একটি নিবন্ধ ছাপা হয়েছে তাতে। ইবরাহীম খাঁ কলম ধরলেন, প্রতিবাদ পাঠালেন। শুরু হয়ে গেলো কলম-যুদ্ধ। অনেক দিন পর্যন্ত চলতে থাকলো এই বাদ-প্রতিবাদ। যাঁর সাথে চলছে, তিনি তাঁর কলেজেরই টিউটর রেভারেন্ড রাজেন্দ্রনাথ দাস। ব্যাপারটি দাস সাহেবের কাছেও পরিষ্কার হয়ে গেলো। ইবরাহীম খাঁকে খ্রিস্টান বানানোর জন্যে তখন থেকে বহু চেষ্টা করলেন দাস সাহেব। কিন্তু ইবরাহীম খাঁ ছিলেন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন অনুপ্রেরণা দায়ী তরুণ এবং জ্ঞানী মুসলমান- দাস সাহেবের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেলো।

www.nagorikpathagar.org

কোনো এক পীরের মুরীদ বানাবার জন্যও ইবরাহীম খাঁর পেছনে লাগে অনেকেই ওই সময়। শেষ পর্যন্ত তারাও ব্যর্থ হয়।

দুই.

যে ইবরাহীম খাঁ পিংনা হাইস্কুলে অধ্যয়নকালে হাজী মযহারউল্লাহ তালুকদারের বৈঠকখানায় জমিয়ে তুলতেন সাপ্তাহিক আলোচনা সভা- সে ইবরাহীম খাঁ কলকাতায় গিয়ে ভুলে যাননি তাঁর প্রভাতবেলার স্বপ্ন এবং পরিকল্পনার প্রসঙ্গগুলো। বরং আরো অনেক অনেক দৃঢ়তায় কাঁধে তুলে নিলেন সামাজিক সংগঠন গড়ে তুলবার গুরুভার।

কিশোরগঞ্জের রোকনউদ্দীন আহমদ ইবরাহীম খাঁর সঙ্গেই বি এ পড়ছিলেন কলকাতায়। তাঁকে নিয়েই গড়ে তুললেন ময়মনসিংহ মুসলিম ছাত্র সমিতি। এ সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিলো- ময়মনসিংহ থেকে কলকাতায় পড়তে আসা ছাত্রদের আর্থিক সাহায্য করা এবং তাদের জন্য জায়গীরের ব্যবস্থা করে দেয়া। বাঙলার এককালের প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীনও একদা ঐ সমিতির সাহায্য নিয়েছিলেন; সাহায্য নিয়েছিলেন এককালের ময়মনসিংহ জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান খান বাহাদুর শরফউদ্দীন আহমদ- তাঁদের ছাত্র জীবনে।

মুসলিম বাংলার সর্বদরদী জননেতা সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরীর সঙ্গে ইবরাহীম খাঁর গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে এ সময়ই এবং ময়মনসিংহ ছাত্র সমিতির নানা তৎপরতার মধ্য দিয়ে।

দেশ-সমাজ-সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি ইবরাহীম খাঁর সহজাত আনুগত্য ছিলো বলে এইসব অঙ্গনের মানুষ ও মনীষার প্রতিও তাঁর আকর্ষণ ছিলো অপ্রতিরোধ্য কিন্তু শিকড়বিনাশী নয়। তাই তিনি অনুভব করেছেন অনির্বচনীয় আকুলতা রবীন্দ্রনাথের জন্যেও। গভীর অনুরাগ নিয়ে তিনি তাঁর বক্তৃতা শুনেছেন। এ সম্পর্কে ইবরাহীম খাঁ নিজেই বলেছেন :

তিনি [রবীন্দ্রনাথ] বক্তৃতা করলেন, আমি শুনলাম তাঁর মুখে একটি নিখুঁত গদ্য কাব্য পাঠ, একটি অপূর্ব সুরহীন সঙ্গীত, অলক্ষ্যে উতলা পানির বিপুল ব্যগ্রতা; সরু উৎস মুখে পানি শান্ত স্রোতে বের হয়ে কুলাতে পারে না, ব্যাকুল ধারায় লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে। কবির বেলায় সেদিন তাই দেখলাম। বুকে তাঁর প্রকাশ বেদনায় অধীর অফুরন্ত কথা, ছোট্ট কণ্ঠে বের হয়ে আসতে পারছিলো না। মাঝে মাঝে স্বর আবেগে কেঁপে উঠছিলো। সর্বক্ষণ তাঁর ইন্দ্রজালময় ভাষা নব নব উপমায় নব নব চিত্র এঁকে চলছিলো।

www.nagorikpathagar.org

কলকাতার কলেজ ছাত্রজীবনে, বড় বড় আরো যে সব মানুষের সান্নিধ্যে এসেছিলেন ইবরাহীম খাঁ, তাঁদের মধ্যে সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরীর কথা আগেই বলা হয়েছে। নবাব আলী চৌধুরী ছাড়াও ব্যারিস্টার আবদুর রসূল, 'দি মুসলমান' পত্রিকার সম্পাদক মওলবী মুজীবর রহমান প্রমুখের সাহচর্যও ইবরাহীম খাঁ পেয়েছিলেন।

তাঁর ছিলো বক্তৃতা শোনার নেশা এবং এই সূত্রেই তিনি দেখতে পেয়েছিলেন মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধীকে, স্যার রাসবিহারী ঘোষকে, নওয়াব আবদুল জব্বারকে, মওলবী লিয়াকত হোসেনকে এবং ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.) কে।

তখনকার দিনে কলকাতার এলবার্ট হল, মুসলিম ইন্সটিটিউট এবং কলেজ স্কোয়ার ছিলো সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং আলোচনা অনুষ্ঠানের কেন্দ্রস্থল। এইসব কেন্দ্রস্থলের সঙ্গে ইবরাহীম খাঁর ছিলো নাড়ির সম্পর্ক।

ইবরাহীম খাঁ ছিলেন ইংরেজি অনার্সের ছাত্র। রিপন কলেজ থেকে ইংরেজিতে বিএ অনার্স পাস করার পর এবার তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার আসন্ন পর্ব। ভর্তি হলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। একই সঙ্গে রিপন কলেজে ল'তেও ভর্তি হলেন তিনি। শিক্ষার দু'টি দিগন্ত জয় করতে গিয়ে ইবরাহীম খাঁ এ সময়ে খানিকটা আর্থিক টানাপোড়েনের মধ্যে পড়ে গেলেন, কিন্তু দমলেন না একেবারেই, চাকরি নিলেন একটি- কলকাতা রাইটার্স বিল্ডিংয়ে, চল্লিশ টাকা বেতনে এবং নিলেন একটি প্রাইভেট টিউশনিও।

একটা নয়, অনেকগুলো ঝামেলা তখন ইবরাহীম খাঁর। কারমাইকেল হোস্টেলের ছাত্র হিসেবে তবুও তাঁকেই নেতৃত্ব দিতে হচ্ছে। ঐ সময় হোস্টেলের সুপারিনটেন্ডেন্ট ছিলেন নিতান্ত এক অযোগ্য ব্যক্তি। নানাবিধ অভাব এবং অনিয়মের জন্য তাঁর ওপর ছাত্ররা ছিলো ভীষণ বিরক্ত। প্রতিকারের দায়িত্ব নিলেন ইবরাহীম খাঁ। একদল লাল বেজপরা ছাত্র নিয়ে হাজির হলেন তদানীন্তন ভাইস চ্যান্সেলর স্যার আশুতোষ মুখার্জীর সামনে। ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়ের সাথে কথোপকথনের একটি খণ্ডচিত্রঃ

তোমরা কে? কি চাও?

আমরা কারমাইকেল হোস্টেলের ছেলে।

বেশ।

সুপারিনটেন্ডেন্ট সাহেব আমাদের কাছ থেকে মাথাপিছু দুই টাকা অনর্থক আদায় করছেন। সেই টাকাই আমরা ফেরত চাই।

বেশ, তা পাবে। সে টাকা কার কাছে আছে?

www.nagorikpathagar.org

বেগতিক দেখে তিনি সে টাকা নাকি ইউনিভার্সিটিতে জমা দিয়ে দিয়েছেন।

তবে তো মুশকিল করলে। এ দুনিয়ায় টাকা-পয়সা কিছু একবার গেলে আর কি তা কখনো উদ্ধার করা যায়? বেশ আর কি?

আমাদের সীট-রেন্ট পাঁচ টাকা আছে, আমরা ওটা চাই চার টাকা করে দিতে।

তা পরের মাস থেকেই হবে।

আর?

আমাদের হোস্টেলের রান্নাঘর নেহায়েত ছোট; ওতে চলে না, আপনি নিজে দয়া করে একবার গিয়ে দেখে আসুন।

কিন্তু আমি যে কুলীন ব্রাহ্মণ হে। তোমরা ফাঁকি দিয়ে তোমাদের রান্নাঘরে নিয়ে আমার জাত মারবে নাকি?

ঐ কথোপকথনের দিনই মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর দেখে গিয়েছিলেন হোস্টেলের রান্নাঘর এবং সপ্তাহ না- যেতেই শুরু হয়ে গিয়েছিল রান্নাঘর বড় করার কাজ। সীট- রেন্টও কমিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

এক সফল ছাত্রনেতা ইবরাহীম খাঁ ঐ সময় ছাত্রদের নানাবিধ সমস্যা সমাধানে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন এবং সেই কারণে গড়ে তুলেছিলেন 'সেবাসংঘ' নামে একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান।

এ কথা কে জানে না যে, 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতিই হচ্ছে বাংলার মুসলমানদের প্রথম সফল সাহিত্য সংগঠন। আত্মসচেতন ইবরাহীম খাঁ কলকাতার ছাত্রজীবনে ঐ সংগঠনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির মুখপত্র 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি পত্রিকা'য় তিনি নিয়মিত লিখতেন এবং লিখতেন তিনি তাঁর ছোটকালের ডাক নামে। অর্থাৎ 'খাজা' নামে।

ঐ সময়ই কবি গোলাম মোস্তফা, ইয়াকুব আলী চৌধুরী, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডা. লুৎফর রহমান, কবি মোজাম্মেল হক, কবি শাহাদাৎ হোসেন, আবুল মনসুর আহমদ প্রমুখ সাহিত্যসেবীদের সঙ্গে ইবরাহীম খাঁর জানাজানি হয় আরো বেশী।

সত্যি কথা বলতে কি, মুসলিম সমাজের কর্ণধাররা সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার প্রতি যেমন এখনো উদাসীন, তেমনি উদাসীন ছিলেন তখনো। অনিবার্যভাবে সে সময়ে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ছিলেন ব্যতিক্রমী মানুষ। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি ঘটনার কথা বলতে গিয়ে ইবরাহীম খাঁ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এভাবে-

একদিনের ঘটনা বলি। ঘটনার বর্ণনাকারী আয়নাওয়ালা আবুল মনসুর আহমদ।

www.nagorikpathagar.org

সমিতির বাড়ির ভাড়া বাকী পড়েছে; না দিলে বাড়ি ছাড়তে হবে, তার নোটিশ এসেছে। দুইজনে মিলে একদিন সকালে গেলেন ফজলুল হক সাহেবের কাছে। তখন তিনি মহারানী স্বর্ণময়ী রোডে থাকেন। বললেন, এখন হাতখালী, বিকেলে এসো। বিকেলে গেলাম। দেখি, তিনি হাইকোর্ট হতে তখনো আসেননি। কিন্তু তাঁর বাড়ির দুয়ারে বসা দুইজন কাবুলীওয়ালা। ঠেকা পড়লে হক সাহেব কাবুলীওয়ালাদের কাছ থেকে টাকা ধার নিতেন, এ কথা অনেকেই জানত। একটু পর হক সাহেব ফিরলেন এবং পকেটে হাত দিয়ে পঞ্চাশটি টাকা বের করে আমাদের দিলেন। মনে হলো, এই তাঁর পকেটে ছিলো। আমাদের কৌতূহল হলো, দেখি কাবুলীওয়ালাদের তিনি কি বলেন। দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বুঝলাম, বচসার মতো কিছু হচ্ছে। একবার কেবল এক কাবুলীওয়ালার উত্তেজিত আওয়াজ কানে এলো, কম বখত, রুপিয়া নাহি দেনে ছেকতা হ্যায়, তব লেতা হ্যায় কাহে? ভাবলাম, এই আমাদের ফজলুল হক।

কলকাতার ছাত্রজীবনের শত ব্যস্ততার মধ্যেও ইবরাহীম খাঁ সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন। কারমাইকেল হোস্টেলের দিনগুলোতেও এ চর্চায় তাঁর ছেদ পড়েনি। ঐ বয়সেই তিনি লেখক হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন অকুতোভয় সৈনিকের ভূমিকা। সেই কারণে ডি এল রায়ের 'সাজাহান' নাটকের সমালোচনা লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন। ঐ লেখায় তিনি প্রসঙ্গক্রমে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টপাধ্যায়ের মুসলিম চরিত্র চিত্রন সম্পর্কেও বিরূপ সমালোচনা করেন। মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী তখন 'আল-ইসলাম' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম। লেখাটি ছাপানোর জন্যে ইবরাহীম খাঁ তাঁর কাছেই গেলেন। লেখাটি দেখে ক্ষেপে গেলেন ইসলামাবাদী। বললেন : একে তো তুমি ছাত্র, তার উপর মুসলমান, টিপ্পনী কেটেছো আবার ডি এল রায়ের উপরে। তোমার সাহস তো কম নয়।

ইসলামাবাদীর তাচ্ছিল্যপূর্ণ ব্যবহারে সেদিন দারুণ কষ্ট পেয়েছিলেন ইবরাহীম খাঁ। এতোটা ব্যথা পেয়েছিলেন যে, লেখাটি নর্দমায় ফেলে দেবার মতোও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু পরিশ্রমের ফসল বলে ফেলে দিতে পারেননি। বরং পাঠিয়ে দিয়েছিলেন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়; একবারে সম্পাদক জলধর সেনের নামে। মজার ব্যাপার হলো, ভারতবর্ষ কিন্তু সেই পত্রিকা, যার প্রতিষ্ঠাতা ডি এল রায় নিজেই।

মাস দুয়েক নিঃশব্দে অতিবাহিত হয়ে গেলো এবং তারপরই ঐ ভারতবর্ষ পত্রিকাতেই প্রকাশিত হলো লেখাটি।

লেখাটি নিয়ে চতুর্দিকে যথেষ্ট হৈচৈ পড়ে গেলো। লেখাটির প্রতিবাদ করলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ। বঙ্কিমকে তিনি সমর্থন করে লিখলেন :

www.nagorikpathagar.org

ফরাসী ও অন্যান্য পরিব্রাজকরা, সত্যিভাবে হোক, মিথ্যাভাবে হোক, মোগল হেরেমের অনেক কলঙ্ক কাহিনী লিখে গেছেন, বঙ্কিম বাবু তারই উপরে নির্ভর করেছেন। কাজেই তাঁকে দোষ দেয়া যায় না।

প্রতিবাদের প্রতিবাদ করতে চেয়েছিলেন ইবরাহীম খাঁ। কিন্তু তার আগেই প্রতিবাদ করলেন বর্ধমানের এক ভদ্র মহিলা, নাম- সৌদামিনী।

এমএ পরীক্ষার পরপরই, কারমাইকেল হোস্টেলে এলেন, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অন্যতম সংগঠক, ভোলার কবি মোজাম্মেল হক। ইবরাহীম খাঁর কাছে তিনি এলেন, তাঁর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'ওরিয়েন্টাল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স'- এর জন্যে পাণ্ডুলিপির আবেদন নিয়ে। তাঁরই আবেদনের প্রেক্ষিতে ইবরাহীম খাঁ লিখলেন, 'তুর্কী উপকথা' এবং 'ছেলেদের শাহনামা'।

ঐ সময় তিনি একটি অসাধারণ কাজ করলেন, একটি ইংরেজি নাটক লিখলেন। লিখলেন আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত গণিতবিদ ডক্টর জিয়াউদ্দিন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের জন্যে। 'কারমাইকেল হোস্টেলই এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন।

যথা সময়ে নাটকটি মঞ্চস্থ হলো। নাটকটি দেখে অনুষ্ঠানের অন্যতম অতিথি বহুভাষাবিদ পণ্ডিত আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী এবং প্রধান অতিথি ডক্টর জিয়াউদ্দিন উভয়ই ইবরাহীম খাঁকে একান্তে ডেকে প্রশংসা করেছিলেন এবং প্রশংসা করার সময় কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন ইবরাহীম খাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু টাঙ্গাইলের আইউব খাঁ। আইউব খাঁ সেদিন কাঁদতে কাঁদতে ইবরাহীম খাঁকে বলেছিলেন :

> যাচ্ছেন তো কোলকাতা ছেড়ে অজ পাড়াগাঁয়ে, সেখানে কে আপনার এরূপ সমঝদারী করবে? বন্ধুর কথা শুনে ইবরাহীম খাঁর কথা ফুরিয়ে গিয়েছিলো সেদিন, কেবল নিজের চোখের পানিই মুছে ছিলেন বারবার।

তিন.

ইবরাহীম খাঁ ছিলেন প্রেক্ষণহৃদ্ধ মানুষ। তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনে কর্মহীনতার কোনো স্থান ছিলো না, ছিলো না অলসতার স্পর্ধা কোনো। সাধারণ মেধার ছাত্রদের মতো তাই তিনি ম্যাট্রিকুলেশন [এসএসসি] পরীক্ষা দিয়ে বসে থাকতে পারেননি, মাত্র আড়াই মাসের জন্যে হলেও ভূঞাপুর মিডল মাদরাসায় নিয়ে ছিলেন মাস্টারি। এই মাস্টারি করার মধ্য দিয়ে তিনি টাকা-পয়সা রোজগার করতে চাননি, বরং চেয়েছিলেন পড়াশোনা, শিক্ষাদান এবং সমাজসেবার সান্নিধ্যে থেকে পরীক্ষার ফলপ্রাপ্তির পূর্ববর্তী সময়টা কাটিয়ে দিতে।

www.nagorikpathagar.org

আইএ পরীক্ষার পরও অন্তত দু'মাস পর্যন্ত ইবরাহীম খাঁ গ্রহণ করেছিলেন শিক্ষকতার কাজ। এবার তিনি প্রধান শিক্ষক হলেন মোমেনশাহী সদরের জাটিয়া মাইনর স্কুলের। সে সময় আর কতোইবা বয়স হবে ইবরাহীম খাঁর, স্কুল কর্তৃপক্ষ তবুও তাঁর মেধা এবং পরিশ্রমের মূল্যায়ন যথার্থ অর্থেই করেছিলেন সেদিন।

বস্তুত ইবরাহীম খাঁর কর্মজীবনের শুভ সূচনা হয়েছিলো তাঁর ছাত্রজীবন থেকেই। সম্পূর্ণ কর্মজীবন ইবরাহীম খাঁর শুরু হয়েছিলো ১৯১৯ সালের অক্টোবর মাসের দিকে। তিনি তখন কলকাতার ছাত্রজীবন শেষ করেছেন। অর্থাৎ পাশ করে ফেলেছেন এমএ। ইংরেজিতে, ইংরেজিতে অনার্স তো তাঁর আগেই হয়ে গিয়েছিলো।

তাঁর সম্পূর্ণ কর্মজীবনের শুরুটায় সম্পৃক্ত হয়ে আছে তাৎপর্যময় এক ঘটনা। সম্প্রতি মোহাম্মদ নূরুল হক তাঁর 'প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ : কর্মময় জীবন' নিবন্ধে ঐ ঘটনার চমৎকার বর্ণনা করেছেন :

ইবরাহীম খাঁ তখন এমএ পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। করটিয়া হাইস্কুলের একজন মুসলমান শিক্ষক তার কাছে এসে তাদের স্কুলের জন্য অঙ্ক আর ইংরেজির দু'জন গ্রাজুয়েট শিক্ষক জুটিয়ে দেয়ার জন্য সাহায্য চান এবং ইবরাহীম খাঁকেও করটিয়া স্কুলে শিক্ষকতা করার জন্য অনুরোধ করেন। [টাঙ্গাইলের] করটিয়ার জমিদার চাঁদ মিয়া সাহেব তাকে পাঠিয়েছেন একথাও বলেন। একসঙ্গে কয়েকজন শিক্ষক কেনো প্রয়োজন তা জিজ্ঞেস করায় মাস্টার সাহেব বলেন যে, স্কুলে মাত্র দু'জন শিক্ষক মুসলমান, বাকি সবাই হিন্দু। মুসলিম হোস্টেলের নামাজ ঘরের সম্মুখে সরস্বতী পূজার মণ্ডপ তৈরী করা হয়। নামাজের অসুবিধা হবে এ জন্য পূজামণ্ডপ অন্য পাশে নেয়ার জন্য হিন্দু শিক্ষকদের অনুরোধ করা হয়, কিন্তু তারা এতে রাজি হন না। জমিদার চাঁদ মিয়া স্বয়ং তাদের অনুরোধ করে বলেন যে, মণ্ডপ সরানোর সমস্ত খরচ ও লোকজন তিনি দেবেন, পূজার ছাপড়া ঘরও তৈরী করে দেবেন, কিন্তু হিন্দু শিক্ষকগণ তার অনুরোধ রাখেননি। তারা বলেন যে, 'পূজার মণ্ডপ সরানো হলে আমরা সকল হিন্দু শিক্ষক এ পাপের স্থান থেকে সরে যাবো।' তখন জমিদার চাঁদ মিয়া সাহেব বললেন, 'তাহলে আপনাদের পুণ্যের পথে আমিও দাঁড়াতে চাই না।' খাজাঞ্চিকে বললেন, 'এখন বাজে ৯টা, বেলা ১১টার মধ্যে এদের শেষ পয়সা পর্যন্ত, বেতন শোধ করে দাও।' হিন্দু শিক্ষকদের ধারণা ছিলো যে, তাদের ছাড়া স্কুল চলবে না। যাওয়ার সময় তারা বলে যান যে, 'মুসলমান দিয়ে কাচারীর পেয়াদার কাজ চলে, স্কুলের মাস্টারির কাজ চলে না।' তখন কারমাইকেল হোস্টেলে বিজ্ঞান ও কলার দুই গ্রাজুয়েট মালদহের আবুল খাঁয়ের চৌধুরী ও চট্টগ্রামের মনিরুজ্জামান থাকতেন। এরা দু'জন আইন পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। আবুল খায়ের ছিলেন ইবরাহীম খাঁর বন্ধু। তিনি তৎক্ষণাৎ গিয়ে

www.nagorikpathagar.org

তাদের দু'জনকে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। তারা ঐ দিনই রাত আটটার ট্রেনে রওনা হয়ে পরদিনই করটিয়া হাইস্কুলের শিক্ষকতায় যোগদান করেন। কয়েক মাস পর ইবরাহীম খাঁ এমএ পরীক্ষা শেষ করে তাদের দেখতে করটিয়া আসেন। দেখলেন তারা খুব ভালো আছেন। করটিয়ার এই যাত্রাবিরতি তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নী উরফে চাঁদ মিয়া সাহেবের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও সদাচরণে তিনি আকৃষ্ট হন। হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ খালি ছিলো- চাঁদ মিয়া তাঁকে এই পদে যোগদান করতে অনুরোধ করেন। ইবরাহীম খাঁ ১৯১৯ সালে করটিয়া হাইস্কুলে যোগদান করেন।

ইবরাহীম খাঁ একটানা চার বছর ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব সাফল্যের সঙ্গে পালন করেন। কিন্তু তাঁর মন পড়েছিলো আইন ব্যবসার প্রতি। স্বাধীন আইন ব্যবসার ভেতর দিয়ে সমাজসেবার একটি স্বপ্ন তিনি সর্বসময়ই লালন করে আসছিলেন। সিদ্ধান্ত নিলেন তাই- এবার আইন ব্যবসা-ওকালতি-শুরু করবেন। শুরু করলেনও মোমেনশাহী শহরে।

কিছুদিন যেতে না যেতেই, ইবরাহীম খাঁ বুঝলেন- আর যাই হোক, অন্তত আইন ব্যবসা তাঁর জন্যে নয়। মানুষ গড়ার আঙ্গিনাই তার জন্যে অধিকতর মানানসই। এই উপলব্ধিগত সন্ধিক্ষণে তিনি ছিলেন করটিয়া জমিদারীর অন্যতম উকিল।

১৯২৫ সালে করটিয়ায় বেড়াতে এলেন ইবরাহীম খাঁ। খবর পেয়ে চাঁদ মিয়া সাহেব তাকে রাতের খাবারের দাওয়াত দিলেন। খেতে খেতে অনেক কথা হলো দু'জনের মধ্যে। এক পর্যায়ে ভোরে আবার চায়ের দাওয়াতও দিলেন চাঁদ মিয়া সাহেব ইবরাহীম খাঁকে।

ভোরের চা পর্বের এক ফাঁকে চাঁদ মিয়া সাহেব বললেন : হেড মাস্টার সাহেব, দেশে শিক্ষা না হলে তো চলবে না। হাইস্কুলটা চলে গেছে। ইতিমধ্যে একটা মাদরাসা করেছি। মাদরাসা বেঁচে থাক, কিন্তু হাইস্কুলটা যে আমার চাই।

আমি হুজুরের মত সমর্থন করি।

বেশ, তবে স্কুলটি করার ভার আপনি নিন।

তা নিতেই রাজি আছি, দিন পনেরো বিশেকের মধ্যে আমি সব ঠিকঠাক করে দিয়ে যেতে পারবো।

আবার যাবেন কোথায়?

কেন, ময়মনসিংহে।

আমি যে এখানে আপনাকে স্থায়ীভাবে চাই। আপনি আবার হেড মাস্টার হয়ে এখানে থাকুন।

www.nagorikpathagar.org

সে হয় না হুজুর, তা পারি না।

কেনো পারেন না? কতো আপনার ওখানে রোজগার? কতো বেতন দিলে আপনি নিশ্চিন্ত মনে আসতে পারেন।

বেতনের কথা তো এখানে বড় কথা নয় হুজুর। আসল ব্যাপার হলো যে, হাইস্কুলের হেড মাস্টারি নিয়ে আমি তৃপ্ত থাকতে পারি না। এখানে যে তখন মাস্টারি নিয়েছিলাম, সে তো নিতান্ত সাময়িকভাবে।

তবে কিভাবে আপনাকে আমি এখানে পেতে পারি?

যদি একটা বড় কিছু করেন...

তার মানে?

একটা কলেজ যদি করেন, তবে আমি আসতে পারি।

বলেন কি, কলেজ।

হ্যাঁ, কলেজ।

এই পাড়াগাঁয়ে কলেজ হতে পারবে?

হুজুর খরচের ভার নিন, আমি কলেজ করার ভার নিই। যদি কলেজ করতে পারি, আমি কলেজে চলে যাবো। যদি তা না পারি তবে স্কুল নিয়েই তুষ্ট থাকবো।

বেশ, আমি খরচের ভার নিচ্ছি।

বেশ, আমিও কলেজ করে দেওয়ার ভার নিলাম।

কলেজের শুভ উদ্বোধন হলো ১৯২৬ সালের জুলাই মাসে। নামকরণ করা হলো চাঁদ মিয়া সাহেবের দাদার নামে 'ছা'দাত কলেজ।

কলকাতার এক এ্যাডভোকেট বন্ধু চাঁদ মিয়া সাহেবকে পরামর্শ দিলেন যে, কলেজের প্রিন্সিপালের দায়িত্বটা যদি কোনো একজন এ্যাংলা সাহেবকে দেয়া যেতো, তাহলে কলেজটা ভালোভাবে চলতো প্রথম থেকে। চাঁদ মিয়া সাহেবের কাছে ঐ পরামর্শ সেদিন অন্তঃসারশূন্য মনে হয়েছিল। তাই তিনি পরিষ্কারভাবে তাকে জানিয়ে দিলেন যে, যে কলেজ বানাতে পারে, সে চালাতেও পারে, ইবরাহীম খাঁ-ই হবে ছা'দাত কলেজের প্রিন্সিপাল।

নির্মিত হবে, নতুন কলেজ ভবন, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য দাওয়াত করা হলো তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হককে। মন্ত্রীপরিষদের চারজন মন্ত্রী নিয়ে তিনি এলেন। এলেন দৈনিক আজাদের সম্পাদক প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ আকরম খাঁ।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের কিছুদিন পর শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হককে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে একটি চিঠি লেখেন ইবরাহীম খাঁ। যা একটি ঐতিহাসিক দলিল হয়ে আছে। তিনি লেখেন :

www.nagorikpathagar.org

বাঙলার প্রধানমন্ত্রী মাননীয় এ কে ফজলুল হক সাহেব সমীপে তছলিম।

মাত্র একটি দিন আপনি করটিয়ায় ছিলেন। সেই স্বল্পকালের মধ্যে শিক্ষা প্রাণতায় আদর্শের যে অনুপম ঐশ্বর্য আমাদের চিত্ত ভাণ্ডারে রেখে গেলেন, ভেবে কৃতজ্ঞতায় মাথা নত হয়ে আসছে।

করটিয়ার সঙ্গে বিগত দুই বছর সময়ের মধ্যে আপনার যে গভীর দরদের সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে, আজ তারই কথা বারবার মনে পড়ছে। আর তারই দুটি কথা এই পত্র মারফত আপনার দরবারে পেশ করতে চাই।

স্মৃতিতে আপনি শ্রুতিধর, সেসব কথা নিঃসন্দেহে আপনার মনে আছে। তবু যে তা বলতে চাই তার প্রথম কারণ, কথাগুলো পুনরাবৃত্তিতে আমার অপার আনন্দ, কারণ, কথাগুলো দ্বিতীয় লেখায় বেঁচে থাক, এ আমার একান্ত আকাঙ্ক্ষা।

করটিয়া কলেজের বাড়িঘরের জন্য আপনার সরকারে এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা চেয়ে আমি দরখাস্ত করি। অর্থমন্ত্রী তখন ছিলেন নলিনী রঞ্জন সরকার। আপনাকে বিরক্ত না করে তাই সোজা তারই কাছে গেলাম। একবার নয়, বোধহয় আট-দশবার। অবশেষে তিনি বললেন, আর হয়রান হবেন না, প্রিন্সিপাল সাহেব, টাকা আপনার কলেজ নিশ্চয়ই পাবে।

চিত্তে গভীর প্রশান্তি নিয়ে আমি করটিয়ায় ফিরলাম। কিন্তু কয়েক দিন পর খবর এলো, করটিয়া কলেজকে তিনি মাত্র পঁচিশ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছেন।

ক্ষিপ্ত প্রায় হয়ে তার বাড়ি গেলাম। বললাম, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, বর্ধমান রাজ কলেজ এদের টাকার অন্ত নেই, তাদের দিলেন ছয় লক্ষ টাকা। আর আমার অভাবী কলেজ, সেখানে মাত্র দিলেন পঁচিশ হাজার টাকা? নির্বিকার কণ্ঠে বললেন, তারা যে কলেজের জন্য আগে অনেক টাকা খরচ করেছে।

চলে এলাম আপনার বাড়ি। আপনাকে সমস্ত কথা খুলে বললাম। আপনি জিজ্ঞেস করলেন : আপনার কলেজের জন্য কিছু খরচ করেন নাই? বললাম করেছি। কিন্তু সে হিসেব অফিস চায় নাই। আমরাও দিই নাই। আপনি খরচপত্রের একটা হিসাব নিয়ে দেখা করতে বললেন।

আমি চলে আসতে উদ্যত, এমন সময় আপনি খোশ মেজাজে আমার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করলেন : আচ্ছা, ঘরের টাকার জন্য যে এতো ব্যস্ত, ক্লাশ করেন কোথায়?

খানিকটা টিনের ঘরে, খানিকটা গাছের তলে।

আর অধ্যাপকদেরসহ আপনি বসেন নাকি বারো আনা দামের লোহার চেয়ারে? আপনি তাও জানেন, স্যার?

www.nagorikpathagar.org

স্কুল-কলেজগুলোর জন্য আমার যে গায়েবী গোয়েন্দা আছে? কিন্তু শুনুন, আমি তো দেখতে পাচ্ছি আপনারা নতুন 'শান্তি নিকেতন' গড়ে তুলেছেন?

পারছি না স্যার, প্রকৃতি পদে পদে বাদ সাধছে।

কেমন?

ফাল্গুন মাস। গাছতলে বসে ক্লাশ নিচ্ছি। হঠাৎ দমকা হাওয়া ছোঁ মেরে টেবিল, হাই বেঞ্চি থেকে বই নিয়ে দে দৌড়?

আচ্ছা, ফাল্গুন হাওয়ার সাথে আপনাদের এমন আড়ি কেনো?

কেবল ফাল্গুন হাওয়া নয় স্যার, অমন দুশমন আরো আছে।

যথা?

চৈত্রের শেষ দিক। গাছতলে বসে ক্লাশ নিচ্ছি। হঠাৎ কানে এলো একটা গুড় গুড় শব্দ, তারপরই দেখতে দেখতে একখণ্ড মেঘ, ঝুপঝাপ এক পশলা বৃষ্টি।

হঠাৎ মেঘের মেজাজ এমন বিগড়ায় কেনো?

আপনার হাসিখুশি মেজাজ দেখে সাহস পেলাম। বললাম, বোধহয় কোনো চাতকের ডাকে?

হঠাৎ আপনি গম্ভীর হয়ে বলে উঠলেন : সব চাতকের ডাকেই যদি মেঘেরা অমনিভাবে গলে পড়তো। তারপর স্থির কণ্ঠে বললেন, হফতাখানেক পরে আসুন, দেখি কিছু করতে পারি কি না। কিন্তু একটা কথা : টাকা পেয়ে ইট-পাটকেলের গুহা তৈরী করে প্রকৃতির সাথে আজকের এই সম্বন্ধটা যেনো একদম ছিন্ন না করে ফেলেন।

কলেজের জন্য আমরা সে সময় তখন যে খরচ করেছিলাম, তার একটা হিসাব নিয়ে আপনাকে দিলাম আপনি করটিয়া কলেজের জন্য এক লাখ ছাব্বিশ হাজার টাকা মঞ্জুর করলেন।

তখন মাহতাবউদ্দিন সরকার শিক্ষা দফতরের ডেপুটি সেক্রেটারি। তিনি আমাকে বললেন : পরিপূর্ণ পাক্কা বাজেট, তার মধ্যে হাত দেওয়ার কোনো দস্তুর নাই। কিন্তু হক সাহেব বললেন : দস্তুরের চেয়ে ইনসাফ বড়। এই বলে তিনি বাজেট থেকে আপনার ঐ টাকা যেনো সবল হাতে ছিনিয়ে আনলেন। সরকার সাহেবকে বললাম : সমস্ত বাংলাদেশে অমন কাজ একা ফজলুল হক সাহেবই করতে পারেন। কলেজ বিল্ডিং-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্যে আপনাকে দাওয়াত করতে গেলাম। আপনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন : আমি একা যাবো না, প্রিন্সিপাল সাহেব, আমি এক ঝাঁক মন্ত্রী নিয়ে যেতে চাই। বললাম : সে আমাদের পরম গৌরবের কথা হবে।

www.nagorikpathagar.org

আপনি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উৎসবে এলেন। সঙ্গে এলেন মন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী, খাজা নাজিমউদ্দিন, খাজা শাহাবুদ্দিন, মৌলভী তমিজউদ্দিন খাঁ সাহেব গয়রহ। আপনাদের আগমনে করটিয়ার পল্লী প্রান্তর নব জীবনের উদ্দীপ্ত আলোকে হেসে উঠলো।

সুদূর পাড়াগাঁয়ের একটি ছোট্ট বেসরকারী কলেজ, তারই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য চার চারজন উচ্চ স্তরের মন্ত্রীসহ কোনো প্রধানমন্ত্রী যায় এত কষ্ট করে? কিন্তু আপনি গেলেন আনন্দের এই আতিশয্যে যে, আপনারই সাহায্যে নিমজ্জমান একটি কলেজ এমনভাবে মাথা তুলে উঠেছে। এ আনন্দের উদ্বেলিত উচ্ছ্বাস আপনি রুখতে পারেন নাই।

সেদিন আপনার চোখে মুখে উচ্ছ্বল পুলকের যে ঝলমল দীপ্তি দেখেছিলাম, তা কোনো দিনই ভুলতে পারবো না। নীরব মুখের ভাষায় সহযোগী মন্ত্রীদের যেনো বলছিলেন, দেখো দেখো, এই একান্ত অজপাড়াগাঁ, সেইখানে এরা কি করে তুলেছে। এখনো কেউ বলতে পারবে যে, শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের সমাজ আজো ঘুমিয়ে থাকবে?

হে শিক্ষার অবিস্মরণীয় বন্ধু তোমার মহান আত্মার প্রতি হাজারো সালাম। প্রীতিধন্য ইবরাহীম খাঁ।

চার.

একটি অনুন্নত সমাজকে এগিয়ে নেবার জন্যে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই এবং সেই শিক্ষার যথার্থ প্রসারের জন্যে চাই তাৎপর্যপূর্ণ ত্যাগ। প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ ছিলেন ঐ ত্যাগের এক উজ্জ্বল উপমা এবং এক সর্বস্পর্শী উদাহরণ।

ইবরাহীম খাঁকে ত্যাগের উপমা হতে দেখি ১৯২১ সালে, যখন তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক হবার জন্য আহ্বান জানানো হয়। সেই সময়ে, সেই আহ্বানে তিনি সাড়া দেননি। শুধু শৈশব এবং যৌবনের মহান অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি লোভনীয় পদ পরিত্যাগ করা সাধারণ কোনো বিষয় নয়। কিন্তু তাও তিনি করেছিলেন, করতে পেরেছিলেন শুধু, পল্লী বাংলার উন্নয়নের কথা ভেবে। কারণ তিনি খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছিলেন যে, পল্লী গাঁয়ের পথ ও প্রান্তর পেরিয়ে রাজধানীর দিকে যাত্রা করার মতো প্রতিভার অভাব হবে না কিন্তু অভাব হবে গাঁও গেরামের গভীরে, থেকে যাওয়ার মতো প্রতিভাধর মানুষের। যে ব্যক্তি দেশের সার্বিক কল্যাণ চায়, তার পক্ষে রাজনীতি মনস্ক হওয়াই স্বাভাবিক। তারপরও যখন ঐ মানুষটি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হয়, তখন তার চৈতন্য থাকে আর দশজনের চেয়ে অনেক

www.nagorikpathagar.org

বেশী তীক্ষ্ণ- অনেক বেশী অতন্দ্র। ইবরাহীম খাঁ ছিলেন সত্যি তীক্ষ্ণ মেধা ও তীব্র বোধসম্পন্ন মানুষ এবং সেই কারণে, তিনি যখন পিংনা হাইস্কুলের ছাত্র ছিলেন, সন্দেহাতীতভাবে তখন থেকেই রাজনীতি সচেতন ছাত্র ছিলেন। এ সম্পর্কে ইবরাহীম খাঁ নিজেই লিখেছেন : স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি বাংলার মুসলমানের বেশীর ভাগই বিরুদ্ধে ছিলো। কিন্তু মুসলিম নেতারা পাল্টা কোনো কাজের প্রোগ্রাম আমাদের সামনে দিতে পারছিলেন না। আমরা যেসব মুসলমান ছাত্র দেশের কথা, সমাজের কথা ভাবতাম, তারা ফাঁপড় হয়ে উঠলাম এই নিষ্ক্রিয় জীবন নিয়ে। অগত্যা আমরা সমাজের আভ্যন্তরীণ সংস্কারের কথাই বেশী করে ভাবতে লাগলাম। পিংনার হাজী সাহেবের বাড়িতে আমরা এক সাপ্তাহিক সভার প্রতিষ্ঠা করলাম। প্রতি রোববার সেখানে ষাট-৭০জন ছেলে উপস্থিত হতো। তাঁদের নৈতিক জীবনের পরিচ্ছন্নতা, তাঁদের ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনা, তাদের সমাজের প্রতি কর্তব্য, তাদের পাঠ্য জীবনের উন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করতাম। বস্তুত স্বদেশ আন্দোলন যে ইবরাহীম খাঁকে অধিকতর রাজনীতি সচেতন করেছিলো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে একাকার করে দিতে পারেনি। বরং একটি প্রতিযোগিতার উষ্ণ মনোভাবই তাঁর মধ্যে আন্দোলিত হয়। এ সম্পর্কে ইবরাহীম খাঁ নিজেই বলেছেন :

কাজেই আমরা হিন্দু ছেলেদের সাথে পাল্লাপাল্লি করে চলতে চেষ্টা করতাম। তারা পড়তো রমেশ দত্তের মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত, আমরা তার উপর পড়তাম জামালউদ্দীন আফগানীর মন্ত্রশিষ্য, রিয়াজুদ্দীন মাসহাদীর সমাজ ও সংস্কারক, তারা পড়তো হেলেনা কাব্য, আমরা তার উপর পড়াতাম কাশেম বধ কাব্য, তারা পড়তো বৃত্রসংহার, আমরা পড়তাম মহাশ্মশান, তারা পড়তো বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতা, আমরা পড়তাম শিবাজীর স্ত্রী শিক্ষা; তারা কর্নেল সুরেশ বিশ্বাসকে নিয়ে গর্ব করতো, আমরা প্লেভনার বীর ওছমান পাশাকে নিয়ে গর্ব করতাম। তারা রাম মূর্তি ও ভীম ভবানীর কথা বলতো, আমরা গোলাম আর গামা পালোয়ানের কথা বলতাম। এ নিয়ে আমাদের উভয় সমাজের মধ্যে মাঝে মাঝে আলোচনা হয়েছে। কখনো বা আমাদের আলোচনা হয়ে উঠেছে বিতর্ক, আবার হয়তো হয়ে পড়েছে বিতণ্ডা, তবে মারামারি আমরা কখনো করি নাই। বহু হিন্দু ছাত্রের সঙ্গে আমাদের অবিস্মরণীয় বন্ধুত্ব ছিলো- এখনো আছে।

ইবরাহীম খাঁ স্বদেশী আন্দোলনের দ্বারা এতোটাই উজ্জীবিত হয়েছিলেন যে, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যখন 'বাঙ্গালী পল্টন' গঠন করা হয়, তখন তিনি তাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নাম লেখান। বাঙ্গালী পল্টনের কর্নেল সুরেশ সর্বাধিকারী নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাঁকে গ্রহণ করেন। কিন্তু ইবরাহীম খাঁ যখন জানতে পরলেন- জার্মানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সুযোগ হবে না, লড়াই করতে হবে তুর্কী খেলাফতের বিরুদ্ধে, ইরাকের মাটিতে দাঁড়িয়ে, আত্মসচেতন

www.nagorikpathagar.org

ইবরাহীম খাঁর তখন আর যুদ্ধে যাওয়া হয় না। বাঙ্গালী পল্টন থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নেন।

পিংনা স্কুলের ছাত্র থাকাকালেই ইবরাহীম খাঁ 'বঙ্গভঙ্গ' রদ হতে দেখেন। দেখেন- বঙ্গভঙ্গের কারণে, নতুন প্রদেশের রাজধানী ঢাকা হওয়ায়, পূর্ব বাংলার অবহেলিত মুসলমানদের মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার যে একটি সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের পরিচালিত রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে ধূলিসাৎ হয়ে গেলো। এই বঙ্গভঙ্গ রদের ঘটনায় স্বাধীনতাপ্রিয় সমস্ত মুসলমানই ব্যথিত হয়েছিলেন সে সময়, ব্যথিত হয়েছিলেন স্কুল ছাত্র ইবরাহীম খাঁও। কিন্তু রাজনৈতিক বোধও যে তাঁর আরো ধারালো হয়েছিলো- তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ঢাকাকে একটি নতুন প্রদেশের রাজধানী করার ব্যাপারে অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে পূর্ব বাংলা কেন্দ্রিক একটি নতুন প্রদেশ গঠনের ব্যাপারে প্রধান উদ্যোক্তার ভূমিকা পালন করেছিলেন মুসলমানদের দরদী নেতা নবাব স্যার সলিমুল্লাহ। তাই বঙ্গভঙ্গ রদের কারণে সবচেয়ে বেশী দুঃখ পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তারপরও উদ্যোগ নিয়েছিলেন ঢাকায় একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার। তাঁর প্রচেষ্টায় ১৯২০ সালের শেষের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয়ে গেলো; কলকাতার বর্ণ-হিন্দুরা সহ্য করতে পারলো না, বিদ্রূপ করে বলতে লাগলো 'মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়।' ঐ সব ঘটনা, ইবরাহীম খাঁকে অল্প বয়সেই, আরো বেশী রাজনীতি সচেতন করার ব্যাপারে প্রবলভাবে ভূমিকা রেখেছিলো।

ইবরাহীম খাঁর ভেতর স্বাধীনতা-স্বদেশপ্রেম জাতীয় চিন্তা কতোটা জায়গা করে নিয়েছিলো, একটি ছোট্ট ঘটনার মধ্য দিয়ে তা সম্যক উপলব্ধি করা যায়। ঘটনাটি তিনি যেভাবে বর্ণনা করেছেন, আমরা সেই ভাবেই তুলে ধরলাম :

বইপত্রে যুদ্ধের কথা আগে পড়েছিলাম। স্বদেশী আন্দোলনের দৌলতে স্বাধীনতার বাণী আমাদের কানে পৌঁছেছিলো। আমাদের তরুণ চিত্তে দোলা লেগেছিলো নব-জীবনের আশায়-আশায়। কিন্তু গোলামের দেশে জন্ম নিয়েছিলাম- যুদ্ধ কি, কখনো চোখের সামনে পড়ে নাই, যুদ্ধের পোশাক কেমন, কখনো পরে দেখিনি, তলোয়ার হাতে নিয়ে ময়দানে দাঁড়ালে দামামার তালে-তালে হৃদয় কেমন নেচে ওঠে, তা কখনো লক্ষ্য করি নাই। আজ এই কৃত্রিম লড়াইয়ের ময়দানের কিনারে দাঁড়িয়ে অনুভব করলাম আমার বুকের তলে তোলপাড় উঠেছে। উদ্বেলিত চিত্তে চেয়ে আছি, এমন সময় এলো একটি তরুণ অশ্বারোহী সেনাপতি। সম্ভবত পাঠান। বয়স হয়তো মাত্র কুড়ি। ঠোঁটের ওপর ঘনকালো গোঁফের রেখা, চোখে-মুখে নব-উন্মোচিত বিক্রমের জ্বলজ্বল জ্যোতি, গায় অদ্ভুত সুন্দর সামরিক, তেমনি সুন্দর পোশাক পরিহিত তার দুর্দান্ত নৃত্যমান তাজী, দুশমনের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে উন্মত্ত আগ্রহে অধীর। তার দিকে চেয়ে হঠাৎ আমার মন দেড়শ'

www.nagorikpathagar.org

বছর আগের একটি ময়দানের দিকে ফিরে এলো। পলাশীর রক্তাক্ত প্রান্তর আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। মনে হলো, আজকের এই তরুণ সেনাপতির মতো সেখানে ঘোড়ার উপর হতে যুদ্ধের আদেশ দিচ্ছেন মীর মদন আর মোহন লাল। হয়তো স্বয়ং সিরাজুদ্দৌলাই এগিয়ে আসছেন, তাঁকে দেখে সৈন্যরা উন্মত্ত হয়ে মেতে উঠছে। ওহ! আমার চোখ ফেটে অশ্রু ঝরতে লাগলো।

বৃটিশ আমলের একটি যুদ্ধের মহড়া [কৃত্রিম লড়াই] দেখে ঐ বর্ণনা দিয়েছেন ইবরাহীম খাঁ। কিন্তু বাংলার স্বাধীনতার প্রতীক সিরাজুদ্দৌলার প্রতি তাঁর যে প্রেম, জাতির ঐতিহ্য-ইতিহাসের প্রতি তাঁর যে আনুগত্য তা সত্যি সত্যিই অনুপ্রেরণার অকৃত্রিম আদর্শে সমুজ্জ্বল অবশ্যই। ১৯১২ সালে ইতালী হঠাৎ করে তুরস্কের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইতালীর এই হঠকারিতায় কোনো উচ্চবাচ্য করলো না খ্রিস্টান জগৎ।

বরং গোটা ইউরোপ তুরস্ককে ছিন্নভিন্ন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। গ্রীস তো কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়ে রুমানিয়া-বুলগেরিয়া-মন্টেনিগ্রো-হার্জেগোভিনাকে সঙ্গে নিয়ে তুরস্কের অস্তিত্ব বিপন্ন করার লক্ষ্যে লড়াইয়ে লিপ্ত হলো বলকানে।

ঘটনার আকস্মিকতায় চঞ্চল হয়ে ওঠে ইবরাহীম খাঁর মন। এই সময় তুরস্কের পক্ষে ভারত জুড়ে তুমুল আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ইবরাহীম খাঁ চাঁদা তুলতে নেমে পড়েন। এ সম্পর্কে ইবরাহীম খাঁ বলেন :

আমরা হোস্টেলে ঈদের ভোজের জন্য টাকা তুলেছিলাম। সভা করে ঠিক করলাম, এবার আমাদের ঈদ নাই। আমরা ঈদের খানার সমস্ত টাকা তুরস্কের সাহায্যে দিবো। আমরা একমাস সকালে-বিকালের নাস্তা ছেড়ে দিলাম। এর টাকা ঐ ফান্ডে যাবে; আমরা যারা বৃত্তি পেতাম, তারা এক মাসের বৃত্তির টাকা ঐ কাজে দিয়ে দিলাম।

ইবরাহীম খাঁ তীক্ষ্ণ এবং সচেতন ছিলেন এবং ছিলেন লড়াকু চরিত্রের। অন্যায়কে অন্যায় বলতে তার দ্বিধা ছিলো না। কৌশলীও ছিলেন তিনি।

১৯১৪ সালে বেজে উঠলো প্রথম মহাযুদ্ধের দামামা। একদিকে ফরাসী-ইতালী-ইংরেজ অন্যদিকে তুরস্ক-জার্মান। ভারতীয় মুসলমানরা পড়লো মহাপরীক্ষায়। তুরস্ককে সমর্থন করলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যেতে হয়। ইংরেজদের কোপানলে পড়তে হয়। তবুও ভারতীয় মুসলমানরা তুরস্ককে সমর্থন না করে পারে না। না করে পারে না এই জন্য যে, তখনকার সুলতান ছিলেন মুসলিম জাহানের খলীফা।

যুদ্ধ শুরু হলো তো ইংরেজরা তাদের বিজয় কামনা করার জন্য নানা স্থানে প্রার্থনা সভার আয়োজন করতে লাগলো। সেন্ট পল্‌স কলেজেও একটি প্রার্থনা

www.nagorikpathagar.org

সভার আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে, শুরু হবে প্রার্থনা, এমন সময় দাঁড়িয়ে গেলেন ইবরাহীম খাঁ। বললেন, যুদ্ধে জার্মান পক্ষ বেশী দোষী না ইংরেজ পক্ষ বেশী দোষী, তা আমরা জানি না। কাজেই আমাদের পক্ষে এই প্রার্থনা করাই ভালো যে, যে পক্ষ হক পথে আছে, বিজয় যেনো তারাই লাভ করে।

ছাত্রের সাহসী উচ্চারণ শুনে তখনই দাঁড়িয়ে গেলেন প্রিন্সিপাল হল্যান্ড এবং বললেন : আমি ভুলে গিয়েছিলাম ইবরাহীম যে তুরস্ক-জার্মান পক্ষে যোগ দিয়েছে। যাক আজকের প্রার্থনা তোমার পরামর্শ মতোই হবে।

বস্তুত ঐ দিনের প্রার্থনা সভা তরুণ ইবরাহীম খাঁর দাবী অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়েছিলো।

তুরস্কের বিরুদ্ধে ইতালীর অন্যায় আক্রমণ এবং বলকানে সম্মিলিত ইউরোপের নগ্ন থাবা সর্বোপরি ইংরেজদের গোলামীর যন্ত্রণা ইবরাহীম খাঁকে প্রত্যক্ষ আন্দোলনের দিকে ঠেলে দিয়েছিলো। তিনি ওকালতী পরীক্ষার অপেক্ষা না করেই খেলাফত আন্দোলনে যোগ দিলেন। শুভ সূচনা হলো তার প্রত্যক্ষ রাজনীতির দুঃসাহসী অভিযান। এ সময় ওয়াজেদ আলী পন্নী চাঁদ মিয়া সাহেব ছিলেন রাঁচীতে। কিছুদিনের মধ্যে করটিয়ায় ফিরে এলেন তিনি এবং যোগদান করলেন খেলাফত আন্দোলনে এবার খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি হয়ে উঠলো করটিয়া। চাঁদ মিয়া সাহেবকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠিয়ে দেয়া হলো।

ঐ গ্রেফতারের ঘটনায় ইবরাহীম খাঁ নিজেই লিখেছেন : জমিদার বাড়ি চললাম। সেখানে যেয়ে দেখলাম জন পঞ্চাশেক সশস্ত্র পাঞ্জাবী পুলিশ এসেছে। অন্দর হতে এদের নাস্তা পাঠানো হয়েছে এবং তাদের খেদমতের জন্য চার-পাঁচজন আমলা হাজির আছে। আমি ভেতরে গেলাম। দেখলাম, চাঁদ মিয়া সাহেব কাপড় চোপড় পরে তৈয়ার, সুপরিচিতিদের ছাড়াও দু'তিনজন নবাগত তার কাছে বসা। তিনি বললেন, ওরা আমার কাছে লোক পাঠিয়েছে।

ওরা মানে।

জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের তরফ হতে আমাকে ধরেছে, একটা কাগজে একটু দস্তখত দিয়ে দিলেই ওরা আমাকে রেখে যায়। তাদের সঙ্গে বাড়ির অনেকেই যোগ দিয়েছে।

আপনি কি বলছেন?

আমার মন উঠছে না, তাই আপনার জন্য দেরি করছি।

আমি জানি, এ অপমানসূচক প্রস্তাবে আপনার মন উঠবে না- উঠতে পারে না।

তাই, হেড মাস্টার সাহেব তাই। কেদার, ওদের বলো, আমি যাত্রার জন্য তৈরী।

www.nagorikpathagar.org

ইবরাহীম খাঁ খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে রায়ত আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে পড়েন। এ আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে সরকার রায়তদের খাজনা বৃদ্ধি বন্ধ করার এবং কোরফা রায়তদের প্রজাস্বত্ব দান করার ব্যাপারে বিবেচনার একটা আশ্বাস প্রদান করে।

বৃহত্তর মোমেনশাহী জেলার খোশ মাহমুদ চৌধুরী ছিলেন একজন জোতদার। তবু তিনি ছিলেন কোরফা রায়তদের আন্দোলনের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। তিনি তার বর্তমান জামালপুর জেলার কামারের চর গ্রামে রায়তদের এক কনফারেন্স ডাকেন। এই কনফারেন্সে ইবরাহীম খাঁ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং অসাধারণ উদ্দীপনাময় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা শুনে জোতদাররা দারুণ ক্ষ্যাপা ক্ষেপে যায়। এমনকি ইবরাহীম খাঁকে মারার জন্যও ষড়যন্ত্র করে। তবুও ইবরাহীম খাঁ দমলেন না।

বস্তুত ইবরাহীম খাঁ দস্তুর মত রাজনীতিবিদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। পুলিশের নজর তার ওপর তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হলো। কংগ্রেসের সন্ত্রাসবাদী গ্রুপও তার পেছনে লাগে। পেছনে লাগে দলে ভিড়াবার জন্য।

সে সময় গুপ্ত পুলিশে কাজ করতেন সৈয়দ এমদাদ আলী। এমদাদ আলী ছিলেন একজন খ্যাতিমান সাহিত্যিক। খানিকটা তাঁরই সহযোগিতায় জেল খাটার হাত থেকে আপাতত বেঁচে গেলেন তিনি। আর সন্ত্রাসবাদকে ইবরাহীম খাঁ মনে-প্রাণে কখনোই গ্রহণ করতে পারেননি বলে সন্ত্রাসবাদীরাও তাকে তাদের দলের সদস্য বানাবার ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে হতাশ হয়ে যায়।

ইবরাহীম খাঁ তাঁর রাজনৈতিক জীবনের এই পর্যায়ে সিরাজগঞ্জ সম্মেলন সফল করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

পাঁচ.

আগেই বলা হয়েছে, ইবরাহীম খাঁ সিরাজগঞ্জ সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯২৪ সালের জুন মাসে। এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিলো, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বেঙ্গল প্যাক্টকে প্রকাশ্য-সম্মেলনের মধ্য দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নেয়া।

ঐ প্যাক্ট অর্থাৎ চুক্তিনামা প্রণয়ন করা হয় ১৯২৩ সালে। প্রণয়ন করেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ- স্যার আবদুর রহীম, মওলবী আব্দুল করীম, মওলবী মুজীবুর রহমান, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী প্রমুখ মুসলিম নেতা এবং জেএন সেনগুপ্ত, শরৎ চন্দ্র বসু, জেএম দাসগুপ্ত, ডা. বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ হিন্দু নেতার সহায়তায়। চুক্তিনামাটি ছিলো অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং যাতে বলা হয় : সরকারী চাকরিতে মুসলমানরা

www.nagorikpathagar.org

জনসংখ্যানুপাতে চাকরি পাবে এবং যতোদিন ঐ সংখ্যা (তৎকালে শতকরা ৫৪জন মুসলমান) পর্যন্ত না পৌছবে, ততোদিন পর্যন্ত নতুন নিয়োগের শতকরা ৮০টি মুসলমানদেরকে দেয়া হবে। কলকাতা কর্পোরেশনসহ সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটি, ডিস্ট্রিক্ট ও লোকাল বোর্ডে ঐ একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর 'স্বরাজ পার্টি' ও 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি'কে দিয়ে ঐ চুক্তিনামা মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু উগ্রসাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন নেতারা প্রচণ্ড বিরোধিতা শুরু করেন এবং প্রচারণা চালাতে থাকেন যে, কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে দেশবন্ধুর পক্ষে ঐ চুক্তিনামা মঞ্জুর করানো আদৌ সম্ভব হবে না। কিন্তু সিরাজগঞ্জ সম্মেলনে তা সম্ভব হলো।

তরুণ রাজনীতিবিদ ইবরাহীম খাঁ সিরাজগঞ্জ সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য পূর্বাহ্নেই গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই ভূমিকা রেখেছিলেন দূরদর্শী বীর বাহাদুরের মতো।

দুঃখের বিষয় হলো- দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আকস্মিক মৃত্যুর পরপরই নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু কৃষ্ণনগর কংগ্রেস সম্মেলন ১৯২৬তে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' বাতিল ঘোষণা করেন এবং একেবারে প্রকাশ্যে পুড়িয়ে ফেলেন প্যাক্টে'র দলিল-দস্তাবেজ।

ইবরাহীম খাঁর রাজনীতি ছিলো মানুষের কল্যাণের জন্যে। স্বার্থপর রাজনীতিবিদ বলতে যা বোঝায়, ইবরাহীম খাঁ তা ছিলেন না। আসামের নওগাঁ কনফারেন্স তার জ্বলন্ত উদাহরণ। ঐ কনফারেন্স সম্পর্কে ইবরাহীম খাঁ নিজেই বলেছেন :

ময়মনসিংহ থাকাকালে আমার সমাজসেবামূলক কাজের এক লেফটেন্যান্ট ছিলেন গফরগাঁয়ের মওলবী আবদুস সামাদ। বেটে, শক্ত শরীর, পরিশ্রমী, বক্তৃতায় পারদর্শী, সমাজের জন্য দরদী সব মিলে মওলবী আবদুস সামাদকে নিয়ে কাজ করায় সুখ ছিলো। একবার তিনি এসে বললেন, আসাম যেতে হবে- নওগাঁ জেলায় ময়মনসিংহের বহুলোক গিয়ে বাড়ি-ঘর করেছে- তাদের নানা অসুবিধা, কনফারেন্স করে সেসব দূর করতে হবে। কেবল একটি কনফারেন্স করে ঔপনিবেশিকদের বিভিন্ন সমস্যা কি করে সমাধান হবে, আমার বুঝে এলো না। তবু কিছু যে উপকার হবে, এ কথা বিশ্বাস হলো।

কতো রেল স্টেশনে, কতো স্টীমার ঘাটে, কতো নৌকার পাড়ে, আসাম যাত্রী আমার দুস্থ ভাইবোনদের কান্নার ধ্বনি কানে বেজে উঠতো। মনে হলো যাই, এদের একটু দেখে আসি। চললাম।

ইবরাহীম খাঁ নওগাঁ যাবার আগেই জানতে পেরেছিলেন, ময়মনসিংহের লোকেরা সাহসী এবং পরিশ্রমী হবার কারণে, আসামীরা প্রথম দিকে তাদেরকে পরম

www.nagorikpathagar.org

আত্মীয়র মতই গ্রহণ করেছিলো, কিন্তু পরে আর সে সম্পর্ক বজায় থাকেনি। এই বজায় না থাকার পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ :

১. আসামের যেসব মেয়েরা মাঠে-ঘাটে কাজ করে, ময়মনসিংহের লোকেরা প্রকাশ্যে তাদের নিয়ে টানাটানি করে, এই ব্যাপারে মামলাও গড়িয়েছে আদালতে, আদালত দোষী ও প্রমাণিত করেছে ময়মনসিংহের লোকদের।

২. মারামারি-কাজে-ফাসাদ বেড়ে গেছে। আগে, বছরে খুন হতো তিনটা, এখন হয় একুশটা।

ময়মনসিংহের লোকদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সঠিক কি-না, জানার জন্যে ইবরাহীম খাঁ, নওগাঁ পৌছেই মুসলিম জননেতা মওলবী নূরুদ্দীনের সঙ্গে দেখা করেন এবং এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন :

আপনি এদেরকে বলে যান, এরা ভালো হয়ে চলুক, অপব্যয় বন্ধ করে টাকা জমাক, ভালো বাড়ি-ঘর করুক এবং ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শিখাক।

ইবরাহীম দূরদর্শী রাজনীতিবিদ হওয়ায় নূরুদ্দীন সাহেবের সাথে আলাপ করেই পুরো ব্যাপারটি দ্রুত অনুধাবন করলেন এবং কনফারেন্সে পরামর্শধর্মী বক্তব্য রাখতে গিয়ে বললেন :

লাইন প্রথা এখনই উঠিয়ে দেয়ার আন্দোলন শুরু করলে এবং আসামে নতুন বসতি স্থাপনকারীদের জন্যে এখনই সংরক্ষিত আসনের দাবী তুললে, অবশ্যই আসামীরা ঘাবড়ে যাবে এবং আসামে বাঙ্গালীদের আসার পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে, এখন রাজনীতির কথা নয়, স্বতন্ত্র অধিকারের কথা নয়, এখন শুধু এখানে আশার কথা, বসতি স্থাপনের কথা এবং মার্জিত ব্যবহারের কথা। ইবরাহীম খাঁর পরামর্শ সেদিন সবাই মেনে নিয়েছিলো। ইবরাহীম খাঁ স্বসম্প্রদায় এবং স্বজাতির প্রতি ছিলেন কর্তব্যপরায়ণ এবং দরদী দায়িত্বশীল। তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাঁদেরই জন্যে কিন্তু সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। এই জন্যে কলকাতার ভয়ানক দাঙ্গার পর করটিয়ায় তাঁকে এক মহান মানুষ হিসেবে ভূমিকা রাখতে দেখা যায়।

কলকাতার ভয়াবহ দাঙ্গার সময় তিনি সেখানেই আটকা পড়েন। তারপর এক সময় করটিয়ায় ফিরে আসতে সক্ষম হন। এসেই শুনতে পান করটিয়ায় দাঙ্গা শুরু হবে, মুসলমান মারার বদলা নেয়া হবে। তিনি দেরি না করে, তখনই ছাত্র-শিক্ষক-মাতব্বর সবাইকে ডাকলেন এবং বোঝালেন : লুটতরাজ পাপ, মানুষ খুন করা আরো পাপ, এ পাপে আমরা নিজেরা যাবো না, কাউকে যেতেও দেবো না- এই হলো আমাদের ধর্মের কথা। এখন প্রতিহিংসার কথায় আসুন। এখানে একজন হিন্দুকে খুন করলে, তারা বিহার, উড়িষ্যা, এলাহাবাদ, দিল্লীতে দশজন মুসলমানকে খুন করবে। বাইরের এই মুসলিম খুনের জন্যে দায়ী হবে কে?

www.nagorikpathagar.org

ইবরাহীম খাঁর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিরোধী ঐ আহ্বানে সেদিন করটিয়ার সবাই সাড়া দিয়েছিলো। এবং গ্রহণ করেছিলো শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি। বস্তুত ইবরাহীম খাঁ যদি ফায়দা লোটা-কায়েমী স্বার্থবাদী রাজনীতিবিদ হতেন তাহলে সেদিনই তার ভূমিকা হতো মানবতা বিরোধী ভূমিকা।

১৯২৯ সালের 'বেঙ্গল প্যাক্ট'-এর মৃত্যু হলো করুণ মৃত্যু। কংগ্রেস কুক্ষিগত হলো সাম্প্রদায়িক বিষ-বিষাক্ত নেতা-জমিদার এবং মহাজনদের দ্বারা। বাধ্য হয়েই কংগ্রেস থেকে মুসলিম নেতারা বেরিয়ে এলেন এবং মওলানা আকরম খাঁ, স্যার আবদুর রহিম, মওলভী মুজিবুর রহমান, মওলভী আবদুল করীম, মওলভী একে ফজলুল হক, ড. আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী, মওলভী শামসুদ্দীন আহমদ এবং মওলভী তমিজউদ্দীন খান গঠন করলেন 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি।' স্যার আবদুর রহিম ও মওলানা আকরম খাঁ হলেন যথাক্রমে এই নতুন দলের সভাপতি ও সম্পাদক।

ইবরাহীম খাঁ নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতিতে যোগদান করেন এবং রাজনীতিবিদ ইবরাহীম খাঁ ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কায়েদে আজম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ স্বয়ং তাঁর পক্ষে প্রচারে নামেন। প্রচারে নামেন টাঙ্গাইলের গোপালপুর এবং ঘাটাইল এলাকায়।

১৯৪০ সালে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ প্রস্তাবের যৌক্তিকতা বোঝাবার জন্যে দিল্লীতে মুসলিম লীগের কনভেনশন ডাকা হয়। নেতৃত্ব দেন কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। দিল্লীর ঐ অধিবেশনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম প্রমুখদের সঙ্গে ইবরাহীম খাঁও যোগদান করেন।

১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত হয় প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন। অনুষ্ঠিত হয় পাকিস্তান ইস্যুকে কেন্দ্র করে। মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসেবে ঐ নির্বাচনে তিনি জয়ী হন। গণপরিষদের নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৬ সালে। তিনি গণপরিষদেরও সদস্য নির্বাচিত হন। রাজনীতির বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশের ইতিহাস তাঁর এভাবেই শুরু হয়েছিলো।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের সভাপতির পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো ইবরাহীম খাঁকে। রাজি হলেন না তিনি। ভেঙে পড়া শিক্ষাব্যবস্থার একটা সুরাহা অত্যন্ত প্রয়োজন- এই আলোচনা করে, স্বজনরা যখন তাঁকে গভীরভাবে বোঝালেন, শিক্ষাবোর্ডে যোগদান করলেন ইবরাহীম খাঁ। ইবরাহীম খাঁ তাঁর শিক্ষাবোর্ড জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন : সামনে ম্যাট্রিক পরীক্ষা, আমি নতুন। অফিসে অভিজ্ঞ স্টাফ নেই। অনেকেই পষ্ট বলে ফেলেন, এ বৎসরের ম্যাট্রিক পরীক্ষা আমাদেরকে দিয়ে

www.nagorikpathagar.org

নেয়া ঠিক হবে না। আমাদের নতুন রাষ্ট্রের পক্ষে এ এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। আমি এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম। গেলাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভায়। অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ জিজ্ঞাসা করলেন, ম্যাট্রিক পরীক্ষা তো এসে গেলো, নিজেরা নিতে পারবেন; না এবারের মতো আমাদের হাতে রেখে দেবেন?

নিজেরাই নিতে চাই। অভিজ্ঞ স্টাফ?

নাই। নতুন স্টাফ দিয়েই চালিয়ে নেবো। প্রশ্নপত্র?

অভিজ্ঞ লোক আর উপযুক্ত প্রেস কোথায় মিলবে?

নিজেদের মধ্যে থেকেই জুটিয়ে নেবো।

কাগজের কি ব্যবস্থা করবেন? বাজার থেকেও যে ও-চীজ উধাও হয়ে গেছে।

আমার কণ্ঠে ইতিমধ্যে দ্বিতীয় রিপু এসে ভর করেছে। ঝাঁজালো স্বরে জবাব দিলাম, ও-চীজ যেখানে আছে, সেখান থেকেই ডাকাতি করে নিয়ে আসবো।

ইবরাহীম খাঁ ছিলেন কর্মঠ মানুষ, আশাবাদী মানুষ। অত্যন্ত প্রয়োজনের মুহূর্তে তিনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। তারই প্রমাণ বহন করছে উপরোক্ত সংলাপ।

শিক্ষাবোর্ডের সভাপতি হিসেবে ইবরাহীম খাঁ ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মপরিষদেরও সদস্য।

রাজনীতিবিদ যদি জনগণের যথার্থ কল্যাণকামী হন, তাহলে তাঁর সংকটকালের সিদ্ধান্তও হয় জনগণের স্বার্থে। সেই কারণে ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ইবরাহীম খাঁর ভূমিকা ছিলো কল্যাণ চিন্তার একান্ত অনুকূলে।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। ১৪৪ ধারা জারি করলো পুলিশ। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে তুমুল আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছে ছাত্ররা। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে তারা গুলি চালালো তাদের ওপর। এ ব্যাপারে ইবরাহীম খাঁ লিখেছেন :

সন্ধ্যার পর হাসপাতালে আহত ছেলেদের দেখতে গেলাম। হাসপাতালের দুয়ারে-দুয়ারে গুপ্ত পুলিশ। বিলি কেটে পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করে ভিতরে গেলাম। আমার পৌঁছানোর মিনিট পাঁচেক আগে একটি ছেলে মারা গেছে, তাকে দেখলাম। তিনটি জখম হওয়া ছেলে পেলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছেলে শুশ্রূষা করছে। আমাকে দেখে চিনলো। অব্যক্ত ব্যথার পীড়নে আমি অধীর হয়ে উঠলাম। পরদিন ভোরে নূরুল আমীন সাহেবের কাছে গেলাম। বললাম কার জন্যে এ অঘটন ঘটলো, তা জানতে চাই না। বলতে চাই অত্যন্ত ভুল ও অন্যায় হয়েছেঃ তাঁকে বললাম, চলুন একবার হাসপাতালে যাই, আহত ছেলেদের দেখি এবং আপনি তাদের দুটো প্রবোধের কথা বলুন। তিনি চুপ করে রইলেন।

www.nagorikpathagar.org

ইবরাহীম খাঁ শুধু প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীনের কাছেই যাননি, সেদিন গিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী আবদুল হামিদের কাছে, গিয়েছিলেন পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল জাকির হোসেনের কাছেও। কিন্তু কারও কাছ থেকেই কাঙ্ক্ষিত আচরণ পাননি ইবরাহীম খাঁ।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে- ইবরাহীম খাঁ একই সঙ্গে প্রাদেশিক পরিষদ এবং পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। অবশ্য পরে যখন পূর্ববঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডে সভাপতির পদ গ্রহণ করেন তখন কিন্তু প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেন।

গণপরিষদের বিভিন্ন অধিবেশনে যোগদানের মধ্য দিয়ে তিনি সব সময়ই দেশ এবং জনগণের পক্ষেই কথা বলেছেন তাদের ন্যায্য দাবী আদায়ের ব্যাপারে। ১৯৫৩ সালের বাজেট অধিবেশনের কথা স্মরণ করা যায়। মূলত ঐ সালের ঐ বাজেট ছিলো একটি ঘাটতি বাজেট। ঐ ঘাটতি বাজেট পূরণের জন্যে তৎকালীন অর্থসচিব বহু সংখ্যক কর্মচারী ছাঁটাইয়ের প্রস্তাব করেন। দেখা গেলো এই ছাঁটাইয়ের মধ্যে পড়ে গেছে যারা তারা অধিকাংশই পূর্ববঙ্গের কেরানি শ্রেণির। বেশকিছু সদস্য নিয়ে ঐ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করলেন ইবরাহীম খাঁ। প্রতিবাদে কাজ হলো, ছাঁটাই বন্ধ হয়ে গেলো। ঐ সময় তামাক-সুপারির ওপরও ট্যাক্স বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হলে তিনি বললেন :

দরকার হয় মোটর গাড়ি, রেশমি-পশমী কাপড়, সুগন্ধি তেল-সাবানের ওপর আরও ট্যাক্স বসানো হোক, কিন্তু গরিবের একমাত্র বিলাস যে হুক্কা সেই হুক্কা তাদের হাত থেকে কেড়ে নেয়া যাবে না। পান-সুপারি থেকে তাদের বঞ্চিত করা যাবে না।

ইবরাহীম খাঁর রাজনীতি ছিলো সততার রাজনীতি, ভাঁওতাবাজির রাজনীতি তিনি কখনো করেননি। একবারের একটি ঘটনা তার সাক্ষ্য। ইবরাহীম খাঁ লিখেছেন :

প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন সামনে। আমি অন্যতম প্রার্থী। টাঙ্গাইলের অন্তর্গত নলীন হাটখোলায় তালুকদারের মস্ত টিনের ঘর। তারই পেছনে ৮/১০টি কর্মক্লান্ত কর্মী আমাকেসহ আগুন পোহাচ্ছে। এমন সময় আমার একটি ছাত্র কর্মী এক বস্তা ছাপানো কাগজ নিয়ে এসে বললো : স্যার আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর রাজনীতি-জীবনের কুকীর্তির ইতিহাস। এক নজর দেখলাম। বর্ণিত কুকীর্তিগুলোর বারো আনাই বাস্তবভিত্তিক। বললাম : কিন্তু অন্যের কুৎসা গেয়ে নিজেদের জয় চাওয়া ঠিক হবে? বললো: ওরা যদি বানিয়ে বানিয়ে আমাদের কুৎসা গাইতে পারে তবে আমরা ওদের সত্যি কুৎসার কথাও বলতে পারবো

www.nagorikpathagar.org

না? বললাম: না, এতোকাল তোমাদের ক্লাসে বলেছি যে, অন্যায় দিয়ে আমরা অন্যায়ের উত্তর দিবো না। আজ আমার নিজের সামনে সেই পরীক্ষা উপস্থিত। তোমরা ১০ হাজার ছেলে ২০ হাজার চোখে চেয়ে আছো যে, আমি নিজে নিজের প্রচারিত নীতি কথা মেনে চলি কি না? তোমরা গর্ব করো যে, তোমাদের প্রিন্সিপাল নীতিবান মানুষ। আমি তোমাদের নিয়ে গর্ব করবো, তোমরা আমাকে নিয়ে গর্ব করবে। এই আমাদের নীতি হোক।

ছয়.

যাঁদের জানার আগ্রহ থাকে প্রবল, তাঁরা ব্যাকুল থাকেন বিচরণের ব্যাপারে। তাঁদের এই বিচরণের ক্ষুধা নিবারণের জন্যে প্রয়োজন হয় গ্রন্থের পর গ্রন্থ, দেশের পর দেশ। ঐ জানার আগ্রহ ইবরাহীম খাঁকে প্রথমাবধি তাড়িয়ে ফিরেছে এবং ঐ তাড়নার সাথে তাৎপর্যপূর্ণভাবে যুক্ত হয়েছে মানবসেবার আকুলতা। ফলে ইবরাহীম খাঁর বিচরণের মানসিকতা সর্বক্ষণ থেকেছে তীব্র থেকে তীব্রতর।

১৯৫১ সালের আগস্ট মাস। ইবরাহীম খাঁ তখন পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য। দাওয়াত পেলেন ইস্তাম্বুলে, আন্তপার্লামেন্টারি কনফারেন্সে যোগদানের জন্য। দাওয়াত পেয়ে জ্ঞানপিপাসু এবং দেশপ্রেমিক ইবরাহীম খাঁ সেদিন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি তাঁর 'ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র' গ্রন্থে লিখেছেন :

.. এক খানা রেজিস্টার্ড চিঠি পেলাম। দেখলাম, করাচীর চিঠি : উপরে 'নিতান্ত জরুরি' বলে সীলমোহর। তাড়াতাড়ি খুলে পড়লাম : বিজলীর ঝলকের মতো একটা আনন্দের সূক্ষ্ম প্রবাহ চিত্তের উপর দিয়ে নিমেষে বয়ে গেলো। মুখ তুলে বললাম- নূরু মিঞা, এখন যাও, জরুরি চিঠি কিনা- আমি একটু ভেবে নিই। করাচী হতে পাক গণপরিষদের ডেপুটি সেক্রেটারি খোন্দকার আলী আফজাল সাহেব লিখেছেন, ইস্তাম্বুলে আন্ত-পার্লামেন্টারি কনফারেন্সের অধিবেশন আসন্ন- পাকিস্তানের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে সেই কনফারেন্সে হাজির হওয়ার জন্য আপনাকে দাওয়াত।

আমার জন্য এই ইস্তাম্বুলী দাওয়াতই যথেষ্ট ছিলো- তা সে যে উপলক্ষেই হোক।

করাচী থেকে প্রথমত বসরায় গিয়েছিলেন ইবরাহীম খাঁ, তারপর বসরা থেকে বৈরুত, বৈরুত থেকে আলেপ্পো। আলেপ্পোতে রয়েছে খালিদ বিন ওলিদ (রা.)-এর মাজার। গভীর আবেগের সাথে জিয়ারত করলেন মাজার। তারপর মোনাজাতের মধ্যেই তিনি কাজী নজরুল ইসলামের দুটি লাইন উচ্চারণ করলেন:

www.nagorikpathagar.org

'খোদার হাবীব কহিয়া গেছেন
ঈসা আসিবেন ফের
চাই না তাহারে, তুমি এসো বীর
হাতে লয়ে শমসের।'

ইবরাহীম খাঁ দেশ ভ্রমণ করেছেন কিন্তু অন্ধের মতো নয়। অন্ধের মতো নয় এই জন্যে যে, তিনি আলেপ্পো থেকে ট্রেনে যাচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনের ইতিহাসটাও উদ্ধার করছেন :

প্রথম মহাযুদ্ধের এক বড় কারণ এই গাড়ি। জার্মানীর কাইজার উইল হেলম ইস্তাম্বুল হতে সোজা বাগদাদ পর্যন্ত তাঁর নিজের ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে করিয়েছিলেন রেল লাইন। পাহাড় কেটে পর্বতের ভিতর দিয়ে সুড়ং করে দুই পাহাড়ের মাঝখানে গভীর নিচু জায়গা, তারই উপর দিয়ে পুল নিয়ে এই লাইন চালানো হয়েছে। এ গাড়িও তৈরী হয়েছিলো জার্মান ইঞ্জিনিয়ারদের হাতে। ইংরেজ ভাবলো, কাইজার বার্লিন হতে সোজা বাগদাদ গাড়ী ভরে সৈন্য নিয়ে আসবে, আর ঐ গাড়িতেই জাহাজের বিভিন্ন অংশ এনে বাগদাদের কাছে সেগুলো একত্র করে জাহাজ তৈরী করবে, তারপর সেই জাহাজে করে সৈন্য নিয়ে এসে ভারত আক্রমণ করবে। সুতরাং ইংরেজ ঠিক করলো জার্মানী তার জোগাড় শেষ করার আগেই যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে হবে। তা-ই তারা করলো আর যুদ্ধে জয়লাভও করলো।

অনেকেই ভ্রমণ করে কেবল নিজের জন্যে। সফরের সব সঞ্চয় লুকিয়ে রাখে আপনার মধ্যে, আপনিই আনন্দিত হয়, আপনিই আতঙ্কিত হয়; ভাগ দেয় না কাউকে কোনো কিছুর- না বলে, না লিখে, ফেলে রাখে ভ্রমণের সমস্ত অভিজ্ঞতা। অথচ ভ্রমণের অভিজ্ঞতাটা অন্যকে জানানোর অর্থই হলো নানাভাবে তাকে উপকৃত করা। ইবরাহীম খাঁর মধ্যে ছিলো- এই নানাভাবে উপকৃত করার ঔদার্য। ফলে, যখনই যেখানে তিনি গেছেন, বিবিধ তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করে এনেছেন- নিজের জন্যে, সমাজের জন্যে, জাতির জন্যে। সেই কারণেই কথায় কথায় তাঁর কাছ থেকে আমরা তুর্কী সাম্রাজ্যের একটি ইতিহাসে পেয়ে গেছি :

সে খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর কথা। মধ্য এশিয়ায় তুর্করা তখনো দলে দলে ভাগ্যের অন্বেষণে দেশ-বিদেশে ফিরে বেড়ায়। এমনিই একটি তুর্ক যোদ্ধা দলের নেতা তুগরল খাঁ ভাগ্যান্বেষণে খোরাছান হতে চলতে চলতে অবশেষে আঙ্কারায় এসে উপস্থিত। হঠাৎ দেখেন, সামনের এক ময়দানে তুমুল সংগ্রাম। তুগরল খাঁ তাঁর যোদ্ধাদেরকে লাইন করে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। তখন তাঁর ধমনীতে যুদ্ধের নেশার উন্মত্ত তীর তীব্র বেগে ছুটতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেলো, এক পক্ষ পরাজিত হয় হয় অবস্থা। দুর্বলের পক্ষ সমর্থনের জন্য

www.nagorikpathagar.org

বীর ব্যক্তির যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাঁরই প্রেরণা- বলে তুগরল খাঁ তাঁর যোদ্ধা দলসহ বিজয় উন্মুখ পক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মুহূর্তের মধ্যে যুদ্ধের গতি ফিরে গেলো। প্রবল পক্ষ পরাজিত হয়ে ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেলো।

দুর্বল পক্ষের অধিনায়ক ছিলেন আইকোনিয়ামের ছেলজুকীয় সুলতান কায়কোবাদ-দেশের আসল মালিক। আর প্রবল পক্ষে ছিলো একদল ভাগ্যান্বেষী মোগল যোদ্ধা। সুলতান কায়কোবাদ তাঁর কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ এক অকস্মাৎ আবির্ভূত সাহায্যকারী দলের নেতা আঙ্কারার প্রান্তদেশে একটি ছোট্ট জায়গীর দান করলেন। এমনিভাবে ভবিষ্যৎ তুর্কী সাম্রাজ্যের বুনিয়াদের পত্তন হলো।

ইস্তাম্বুলের এই ভ্রমণে তিনি মিসরে গেলেন, পিরামিড দেখলেন, আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় দেখলেন, জামালুদ্দিন আফগানীর কবর জেয়ারত করলেন, জেদ্দা-মক্কা-মদীনা সফর করলেন। জেয়ারত করলেন গাজী সালাহউদ্দীন আইউবীর কবর এবং ইরান সফরের ভেতর দিয়ে ইবরাহীম খাঁ ভ্রমণের প্রথম পর্ব শেষ করলেন।

মিসর ভ্রমণের এক পর্যায়ে ইবরাহীম খাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় ইখওয়ানুল মুসলিমিনের এক টগবগে তরুণের সঙ্গে। হোটেল মিসরে। এমএ পাস করা এ তরুণের নাম সৈয়দ রমজান। সৈয়দ রমজান এবং ইখওয়ান সম্পর্কে ইবরাহীম খাঁ লিখেছেন :

হোটেল মিসরে সৈয়দ রমজানের সঙ্গে পরিচয় হলো। সৈয়দ রমজান কায়রোর একজন নব্য-শিক্ষিত নব্য যুবক- এমএ। কিন্তু মাস্টার না বলে মওলানা বলেই খুশি- বয়স সাতাশ আটাশের কাছাকাছি; দাড়ি রাখেন এবং সে জন্য কোনো সমাজে সংকোচবোধ করেন না- আরবিতে নিতান্ত ভালো বক্তা ইখওয়ানুল মুসলিমীনের পরিচালকদের মধ্যে [সৈয়দ রমজান] একজন টিকটিকি নাকি তাঁর পাছে লেগেই আছে- কিন্তু তাতেও বেপরোয়া সে। ইখওয়ানুল মুসলিমীন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি যা বললেন, তার মর্ম এই : ইসমাইলীয়া মিসরের একটি ছোট্ট শহর। এই শহরে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন শেখ হাসানুল বান্না। ছোট স্কুলের শিক্ষক হলেও তিনি কেবল ছোট বিষয় নিয়ে থাকতেন না, বড় বিষয়ের কথাও ভাবতেন। বিশেষ করে ভাবতেন তিনি ইসলামের কথা, মুসলিম রাজ্যগুলোর কথা। প্রথম মহাযুদ্ধের পর যখন ইউরোপ আমেরিকার বিজয়ী খ্রিস্টান শক্তিপুঞ্জ মুসলিম রাজ্যগুলোকে ভাগ বাটারা করে নিতে লেগে গেলো, তখন শেখ হাসানুল বান্নার মাথায় আগুন জ্বলে উঠলো : তিনি রাত দিন ভাবতে লাগলেন, মুসলিম রাজ্যগুলোকে বাঁচানোর জন্য কোন পথ অবলম্বন করা সম্ভব? অবশেষে তিনি স্থির করলেন, যে পথে চলে মুসলমান একদিন বড়

www.nagorikpathagar.org

হয়েছিলো মুসলমানকে আবার সেই পথে চলতে হবে এবং সে পথ ইসলামের পথ। ইসলাম একদিন অজ্ঞ বেদুঈনকে দুনিয়ার ওস্তাদ করে তুলেছিলো।

মুসলমানকে আবার সেই পথে চালাতে হলে চাই অক্লান্ত সাধনা বলে তাদের মধ্যে নব-জীবনের সঞ্চার, আর সে জন্য চাই নিঃস্বার্থ সেবক দল। কাজেই ১৯২৭ সালে তিনি ইসমাইলীয়া শহরে এই সেবক সংঘের পত্তন করেন- এরই নাম ইখওয়ানুল মুসলিমীন- মুসলিম ভ্রাতৃ সংঘ। অল্পকালের মধ্যেই এই ইখওয়ান আন্দোলন চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। বর্তমানে মিসর, সুদান, সিরিয়া, জর্দান, ইরাক, মরক্কো, মালয়া, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে ইখওয়ানের শাখা-সমিতি আছে। তুরস্ক ও সউদী আরবে ইখওয়ান আন্দোলন নিষিদ্ধ, তবু নাকি গোপনে সেখানেও কাজ চলছে।

ইবরাহীম খাঁ ১৯৫২ সালের ১১ অক্টোবর আমেরিকা যাত্রা করেন। এটা হলো তার ভ্রমণ পর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়। আমেরিকা ভ্রমণের ওপর লিখিত তাঁর তথ্যবহুল গ্রন্থের নাম 'নয়া জগতের পথে।' প্রায় দেড়শ' পৃষ্ঠার মতো হবে বইটি। আমেরিকার নানা বিষয়ে খোলাখুলি মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি এ বইয়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, সে অনেকদিন আগের কথা। ইংরেজ সমাজে তখন ধর্ম নিয়ে মহা মারামারি। ধর্মঘটিত কথিত অপরাধে মাঝে মাঝে মানুষ আগুনে পোড়া দেয়া হতো।

সে অত্যাচার সইতে না পেরে একদল লোক ১৬২০ সালে অকূল দরিয়ায় ভাসিয়ে দিলো তাদের তরী। অবশেষে তারা এসে পৌঁছলো আমেরিকার কূলে। যে জায়গায় তারা নামলো, তা এখন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত। নবাগতদের সামনে ছিলো দুরন্ত শীত, খাদ্যদ্রব্যের ছিলো বিষম অভাব। আদিম বাসিন্দাদের ভীষণ ভয়। এদের মধ্যে দুর্বলেরা মরলো। যারা রইলো তারা পর বছর পেলো আশাতীত খাদ্যশস্য। তারা আল্লাহর দরগায় শুকুর গোজারী করে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করলো।

পরবর্তীকালে ইউরোপের নানা দেশ থেকে এমনি নানা নির্যাতিত দল এসে আমেরিকায় মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলতে থাকে। তাদেরই বংশধরেরা শিক্ষা, সভ্যতা, সম্পদ ও শক্তিতে আজ জগতের পুরো ভাগে।

ইবরাহীম খাঁ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের সময় চোখ-কান খোলা রেখেছিলেন। একটি দেশ কিভাবে একটি শ্রেষ্ঠ দেশে পরিণত হলো, তা তিনি তার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখার চেষ্টা করেছিলেন। সেই কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমাজব্যবস্থার ওপরে, শিক্ষাব্যবস্থার ওপরে, এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পল্লী জীবনের ওপরেও তিনি কথা বলেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শীতকালীন পল্লী জীবনের ওপর একটি চমৎকার বর্ণনা দিতে গিয়ে ইবরাহীম খাঁ বলেছেন :

www.nagorikpathagar.org

পথে বের হয়ে মনে হলো, আজ এ দুর্যোগের ঘনঘটায় ভালোই হলো। নইলে এই যে, মাইলের পর মাইল বরফ আর বরফ, গাছের ডালে ডালে, পাতায় পাতায় এই যে বরফের বিচিত্র ঝালর, ঘরের চালায় চালায় এই যে বরফের অদ্ভুত সুন্দর আস্তর, আর এই যে তার অবিস্মরণীয় শুভ্র কোমল অপরূপ, এ কোথায় দেখতে পেতাম? পথে পথে ছোট ছোট পাহাড়, পেলাম নিরবিচ্ছিন্ন সাদা, যেনো সেই সুদূর অতীতের অতল থেকে কোনো অতিকায় শ্বেত ভল্লুক এসে গুহামুখ ব্যাদান করে নিশ্চুপ পড়ে আছে। কোনো বাড়িতে মেহমান এলে, ঐ মেহমানও গৃহকর্ত্রীর সাহায্যকারী হয়ে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক বাড়িতে দাওয়াত খেতে ইবরাহীম খাঁ তা লক্ষ্য করেছিলেন :

বাড়িতে মেহমান এলে তাদের পক্ষে গৃহকর্ত্রীকে সাহায্য করা ভদ্রতার পরিচয়। আমার সাথী জুলিয়াস ও ক্লারা ঘরে ঢুকেই মার্থাকে টুকটাক সাহায্য করতে লাগলো। আবার খানা শেষ হলেই জুলিয়াস টেবিলের বাসন- পেয়ালাগুলো তুলে এনে পানির কলের সামনে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার করার কাজে সাহায্য করতে লেগে গেলো। যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরার পথে তিনি ভ্রমণ করেন লন্ডন, জুরীখ, এবং আরো কিছু ইউরোপীয় শহর।

১৯৬৬ সালে গণচীন ভ্রমণের মধ্য দিয়ে ইবরাহীম খাঁর বিদেশ ভ্রমণের তৃতীয় পর্ব শুরু হয় এবং এটাই মূলত তার সর্বশেষ ভ্রমণও বটে। এই ভ্রমণে তিনি চীনের ইতিহাসের সন্ধানে, চীনের বর্তমানের অনুধাবনে গভীরভাবে প্রয়াস চালিয়ে গিয়েছেন শান্তির পাহাড়ে, রাজাদের প্রাসাদে, চীনের প্রাচীরে, পাতালপুরীর প্রাসাদে, প্রাসাদ যাদুঘরে, পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে, চীনা বাদশার গ্রীষ্মবাসে ওহাঙে, ক্যান্টনে, ছা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের (রা.) মাজারে, সিন্‌কিয়াঙে, হ্যাঙ চোতে, সাংহাইয়ে, বাঘের পাহাড় প্রভৃতি জায়গায় এবং সঞ্চয় করেছেন জ্ঞানের সব মূল্যবান মণিমুক্তা, অভিজ্ঞতার সব বিচিত্র ভাণ্ডার। চীন ভ্রমণের ওপর লিখিত তার বইয়ের নাম 'নয়া চীনে এক চক্কর।' প্রায় দু'শ পৃষ্ঠার এই বইটি ধারণ করে আছে মজার মজার তথ্যাবলী। চীনের প্রাসাদে যাদুঘরের বর্ণনা দিতে গিয়ে ইবরাহীম খাঁ বলেছেন :

শাহী প্রাসাদের কক্ষ সংখ্যা ১০ হাজার। এতোগুলো কক্ষের মধ্যে কি কি আছে সে প্রশ্নের জবাব দেয়ার চেয়ে, কি কি নাই তারই জবাব দেয়া বোধহয় সহজ। ইবরাহীম খাঁ চীনা জাতির ফুলপ্রীতির প্রশংসা করেছেন। বলেছেন :

চীনারা ফুলের পাগল। মনে পড়লো কয়েকদিন আগে চীনের পথে দেখেছি আলবেনিয়ার সভাপতি ওমর খায়রোর প্রতি সম্বর্ধনা। খায়রো আসছেন, তার পথের দু'ধারে দাঁড়িয়ে গেলো হাজার দশেক কিশোর-কিশোরী। তাদের কারো হাতে ফুলের তোড়া, কারো রুমাল ভরা ফুলের পাপড়ি। তাদের কারো হাতে ফুলের মালা- অপূর্ব কৌশলে সে মালা তাদের হাতের উপরে ঘুরছে আর ঘুরছে।

www.nagorikpathagar.org

অভ্যর্থনার এ ফুলময় রূপ আর কোনো দেশেই দেখি নাই। এ বিদ্যায় চীনারা ওস্তাদ। পিকিং লাইব্রেরিরও তিনি প্রশংসা করেছেন। মাও সে তুং যে একদা লাইব্রেরিয়ানের চাকরি করেছেন, সে কথা; ইবরাহীম খাঁ তার 'নয়াচীনে এক চক্কর' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ইবরাহীম খাঁ পিকিং লাইব্রেরির প্রশংসা করেছেন এভাবে :

২৮শে এপ্রিল [১৯৬৬]। পিকিং লাইব্রেরি দেখতে গেলাম। বিস্তৃত আঙ্গিনার ওপর বিরাট লাইব্রেরি। বইয়ের সংখ্যা ৭৫ লাখের ওপর। ৭৯টি ভাষার বই। উর্দু বই শ'খানেক- বাংলা বই ১৫টি।

পুরনো বইয়ের পাণ্ডুলিপি সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য নয়, তবে এরা চীনা ভাষায় যে বিশ্বকোষ তৈয়ার করেছে, তা কেবল বিশ্বকোষই নয়, বিস্ময় কোষও বটে। বিচিত্র বড় বড় হরফের ৮০ পৃষ্ঠায় এক এক খণ্ড। এরই ত্রিশ হাজার খণ্ডে সমস্ত বই সমাপ্ত। দুই হাজার লেখক গত ১০ বছর ভর পরিশ্রম করে লিখেছেন।

চীন ভ্রমণে ইবরাহীম খাঁ মুসলমানদের আদৌ ভুলে যাননি। তাদের অবস্থা সম্পর্কে যতোদূর সম্ভব নির্ভুলভাবে জানার চেষ্টা করেছেন। তাদের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

> "চীনের জনসংখ্যা যদি পঞ্চাশ কোটি হয় তবে মুসলমানরা হয় তার দশ ভাগের এক ভাগ। এই হিসাব মোতাবেক পাঁচটি শ্রেণির সমবায়ে গঠিত চীনা জাতির মধ্যে মুসলমানরা দ্বিতীয় বৃহত্তম শ্রেণি।"

"মুসলমান বাসিন্দারা স্বভাবত সাহসী। তাই তাদের অনেকে সৈন্য বিভাগে যোগদান করে। দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের মুসলিম মহিলারা বাইরে যাবার সময় নেকাব ব্যবহার করে থাকেন। অন্যত্র মুসলমান নারীরা টুপিও পরেন। এসব অঞ্চলের পুরুষরা কোথাও পরেন পাগড়ি। মুসলমানরা মাঞ্চু অঞ্চলের নীতি মোতাবেক লম্বা চুল রাখতো না। মুসলমান মেয়েরা কখনো লোহার জুতা পরতো না।" প্রথমাবধিই ইবরাহীম খাঁ ছিলেন আদর্শবান মানুষ, নীতিবান মানুষ, অসাম্প্রদায়িক এবং যথাযথ মুসলমান। সেই কারণে যাবতীয় ভ্রমণ তাকে আরো উদার করেছিলো, আরো যথার্থ করেছিলো।

সাত.

একটি মহীরূহ এমনি- এমনিই বিশালতা লাভ করে না। তার জন্যে প্রয়োজন হয় মৃত্তিকার, প্রয়োজন হয় বেড়ে ওঠবার আবহাওয়া, বেড়ে ওঠবার আকাশ। একজন মহীরূহ লেখক হবার সে আনুকূল্য ইবরাহীম খাঁ তার পরিবারের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। ইবরাহীম খাঁর বাড়িতে প্রায়ই পুঁথি পাঠ ও কবিতা আবৃত্তির

www.nagorikpathagar.org

মজলিস বসতো। খুব ভালো বাঁশী বাজাতে পারতেন তাঁর মেজো ভাই আবদুস সোবহান খাঁ। মধুর কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন তাঁর মেজো ভাই কাজিমউদ্দীন খাঁ- খুব ভালো তেলাওয়াত করতে পারতেন এবং আজান দিতে পারতেন তিনি। ভালো গানের গলা ছিলো তাঁর চতুর্থ ভাই এবাদত খাঁর। আর বড় ভাই আবদুল করিম খাঁ পড়তে পারতেন পুঁথি। পুঁথি পাঠের প্রতি ইবরাহীম খাঁরও ছিলো অপ্রতিরোধ্য দুর্বলতা। ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার সময়ই ইবরাহীম খাঁ তার জীবনের প্রথম লেখাটি সম্পন্ন করেন। ঐ বছরই একটি উপন্যাস লিখতেও শুরু করেছিলেন তিনি। কিন্তু তার প্রথম লেখা ছাপা হয় ৮ম শ্রেণিতে পড়ার সময়।

সেই সে ইবরাহীম খাঁ স্কুলজীবন থেকে লেখালেখি শুরু করেছিলেন, তা তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন সারাজীবন। হাজারো ব্যস্ততার মধ্যেও ইবরাহীম খাঁ এইখানে এসে হার-না-মানা প্রতীকী অস্তিত্বের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন।

একবার তাঁর এক ভাইয়ের- বড় পদস্থ কর্মকর্তা এক ছেলের কাছে শুনেছিলাম, ইবরাহীম খাঁ প্রতিদিন রাত তিনটার দিকে লেখালেখি শুরু করতেন, কখনো-কখনো ফজরের নামাজ পড়ার পরও এ ধারা অব্যাহত রাখতেন। এটা ছিলো তাঁর সারাজীবনের নিয়ম। সময়-সুযোগমত অন্যান্য সময়ও তিনি লিখতেন। তাঁর ঐ লেখাপড়ার ঘরটা ছিলো মস্তবড় এক বাদাম গাছের নীচে। ভোর না হতেই বাদাম কুড়াবার ধুম পড়ে যেতো বাড়ির ছেলে-মেয়েদের। অমনি হাঁক দিয়ে উঠতেন ইবরাহীম খাঁ :

রাত জেগে-জেগে বাদাম পাহারা দিলো যে মানুষটা, তার ভাগটা কইরে? হাঁক শুনে, দাদুর ভাগটা ঠিকই দিয়ে আসতো সবাই।

লেখালেখির ক্ষেত্রে তাঁর স্বভাবগত মনোযোগ তাকে এক মহান লেখকে পরিণত করেছে এবং তার হাতেই রচিত হয়েছে বিপুল পরিমাণের সাহিত্য সম্ভার।

শিশু-কিশোরদের জন্য তিনি লিখেছেন : ১. ছেলেদের শাহনামা ২. তুর্কী উপকথা ৩. ভিস্তি ও বাদশা ৪. নিজাম ডাকাত ৫. জঙ্গী বেগম ৬. শিয়াল পণ্ডিত ৭. সিন্দবাদ জাহাজী ৮. ব্যাঘ্র মামা ৯. ছোটদের জাতিসংঘ ১০. দাদুর জাম্বিল ১১. গল্প দাদুর আসর ১২. জেলে ও জীবন ১৩. নীল হরিণ ১৪. সাত ভাই চম্পা ১৫. সোনালী পরশ।

শিশু-কিশোরদের জন্যে লেখা তার ৯টি পাণ্ডুলিপি এখনো অপ্রকাশিত :

১. ছোটদের ইতিকথা ২. ছোটদের কিচ্ছা ৩. বাদলে বিচার ৪. দো পৈয়াজার দফতর ৫. ব্যাঙ্গী-বুড়ী ৬. জীবন প্রভাতে ৭. পরের তরে ৮. দাদুর সফর ৯. বটতলার বৈঠক।

www.nagorikpathagar.org

উপর্যুক্ত তালিকার দিকে তাকালে একথা বুঝতে কষ্ট হয় না যে, ইবরাহীম খাঁ শিশুদের জন্যে কতোটা ভাবতেন এবং তাদের মানস গঠনে কতটা সজাগ ছিলেন, সচেতন ছিলেন।

শিশু সাহিত্য রচনায় তিনি বৈচিত্র্য প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। সেই কারণে হাত দিয়েছেন গল্পে, কখনো নাটকে, প্রবন্ধে, সাধারণ লেখালেখিতে। কিন্তু তার সব রচনাই শিল্প নৈপুণ্যসম্পন্ন।

ইবরাহীম খাঁ জীবন চরিত রচনায় অগ্রসর ভূমিকা পালন করে গেছেন। এ জীবন চরিত শিশু-কিশোরদের জন্যে তো অবশ্যই। কিন্তু বড়দের জন্যেও এতে রয়েছে নানাবিধ উপাদান ও উপাত্ত। আমরা এখানে প্রকাশিত জীবন চরিত্রগুলোর একটি তালিকা দিচ্ছি :

১. বাদশা বাবর ২. সম্রাট সালাহউদ্দীন ৩. কামাল পাশা ৪. আনোয়ার পাশা ৫. অভিযাত্রী ৬. নবজীবনের ঝাণ্ডা বহিল যারা ৭. জঙ্গী জীবন ৮. ছোট থেকে বড় ৯. সোহরাব রোস্তম ১০. ছোটদের মহানবী ১১. ছোটদের ওমর ফারুক ১২. ছোটদের নজরুল ১৩. হাকিম আজমল খান ১৪. গল্পে ফজলুল হক।

মানুষের জীবন অর্থহীনতায় পর্যবসিত হতে পারে না। সেই অর্থহীনতা থেকে এ দেশের মানুষকে মুক্ত করার জন্যে এবং তাদের মানস প্রদেশকে যথার্থভাবে সমৃদ্ধ করার জন্য ইবরাহীম খাঁ অনুবাদেও হাত দিয়েছিলেন। এ অনুবাদ ছিলো সবারই জন্যে।

প্রকাশিত অনুবাদগুলোর তালিকা :

১. খালেদার সময় স্মৃতি; ২. সুয্যি মামার রথে; ৩. আরব জাতির ইতিহাস; ৪. মহামনীষী আলবার্ট আইনস্টাইন; ৫. জর্জ ওয়াশিংটন; ৬. ইউরোপ বিজয়ী সুলায়মান; ৭. মোটরগাড়ির প্রথম যুগ; ৮. বাবর নামা ১ম খণ্ড; ৯. বাবর নামা ২য় খণ্ড; ১০. চির তুষারের দেশ; ১১. ইতিহাসের আগের মানুষ; ১২. নূরমহল ও ১৩. চেঙ্গিস খাঁ।

ইবরাহীম খাঁর প্রকাশিত নাটকের সংখ্যা :

১. মনীষী মজলিস ২. ঋণ পরিশোধ ৩. মায়ের বুলি ৪. কাফেলা

ইবরাহীম খাঁর শিশুতোষ নাটকের সংখ্যাই বেশী। ইংরেজি নাটকও তিনি লিখেছেন এবং তা তাঁর ছাত্রজীবনেই অভিনীত হয়েছে।

ভাষা সৈনিক অধ্যাপক আবদুল গফুর বলেছেন, আকবর উদ্দীনের নাটক 'আজান' তাঁর প্রকাশিত গল্পগ্রন্থের সংখ্যা ৬টি এবং প্রকাশিত উপন্যাস ১টি :

www.nagorikpathagar.org

১. লক্ষ্মী ছাড়া ২. সাপুড়ে ৩. আলু বোখারা ৪. ওস্তাদ ৫. মানুষ ৬. পাখীর বিদায় ৭. বৌ বেগম (উপন্যাস)

ইবরাহীম খাঁর সমস্ত গল্পে ফুটে উঠেছে সমাজের আসল চেহারা এবং যাবতীয় অসঙ্গতি থেকে মুক্তি ও উদ্ধারের আলোকিত নির্দেশিকা।

সব মিলিয়ে প্রকাশিত প্রবন্ধের বই তাঁর ১৮টির মতো।

১. ইসলামের বাণী ২. সোনার শিকল ৩. ইসলামের দর্পণ ৪. ইসলামের ঔদার্য ৫. আমাদের শিক্ষা সমস্যার ক,খ,গ ৬. আমাদের পাকিস্তান ৭. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ৮. একটি রূপায়নমান স্বপ্ন ৯. A peep into our Rebel poet ১০. ইসলামের মর্মকথা ১১. তমদ্দুন প্রসঙ্গে ১২. ফিলিস্তিনের ফরিয়াদ ১৩. ছোটদের মিলাদুন্নবী ১৪. মুসলিম সংস্কার আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ১৫. ইকরা পড় ১৬. ইসলামের উদারতা ১৭. মানুষ মোহাম্মদ প্রবন্ধ সাহিত্যে এক অপরিসীম অবদান রেখে গেছেন ইবরাহীম খাঁ। তাঁর প্রবন্ধ যেমন তত্ত্বে, তেমনি তথ্যে, যেমন জ্ঞানে, তেমনি পাণ্ডিত্যে, যেমন নির্ণয়ে, তেমনি নির্দেশিকার এক-একটি অমূল্য রত্নের ভান্ডার যেনো।

ভ্রমণ সাহিত্যেও ইবরাহীম খাঁ বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে গেছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের পথে ঘাটেসহ তার ভ্রমণগ্রন্থ চারটি। অন্য তিনটি হলো-

১. ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র; ২. নয়াজগতের পথে ও ৩. নয়াচীনে এক চক্কর।

ভ্রমণ সংক্রান্ত এই সব বই না-পড়লে বোঝা যাবে না যে, ইবরাহীম খাঁর নজর কত ধারালো ছিলো এবং কতোটা মেধাবী ছিলেন তিনি। ইবরাহীম খাঁর অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে :

১. হিরকহার [নীতিকথা সংকলন]; ২. Anecdotes from Islam; ৩. বেদুঈনের দেশে [ইতিকথা]; ৪. ইসলামের সোপান; ৫. ইতি কাহিনী [নীতিকথা সংকলন]; ৬. বাতায়ন [স্মৃতিকথা] ও ৭. লিপি সংলাপ [পত্র সাহিত্য]

সাহিত্যের প্রায় সকল শাখায় ইবরাহীম খাঁ তার সোনার কলম দিয়ে অবিরাম এঁকে গেছেন সোনালি আঁখর। বস্তুত দেশপ্রেমিক এবং দূরদর্শী জনগণ তার মূল্যায়নও তাঁর জীবদ্দশায়ই করেছে।

১৯৪৪ সালে ইবরাহীম খাঁকে সংবর্ধনা প্রদান করে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ। সভাপতিত্ব করেন জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান।

১৯৬৪ সালে তিনি বাংলা একাডেমি নাট্য পুরস্কারে ভূষিত হন।

www.nagorikpathagar.org

১৯৬৯ 'টাঙ্গাইল মহফিল' সংবর্ধনা প্রদান করে ইবরাহীম খাঁকে। ঐ অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন ড. কাজী মোতাহার হোসেন।

১৯৭৫ সালে ঢাকায় বাংলাদেশ সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁকে সম্বর্ধনা দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এককালের প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খান। উদ্বোধন করেন কবি জসীমউদ্‌দীন। ঐ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তাঁকে সোনার কলম ও রূপার দোয়াত উপহার দেয়া হয়।

বড় লেখক হতে গেলে, বড় হৃদয়েরও প্রয়োজন। ইবরাহীম খাঁ বড় মাপের লেখক ছিলেন- তাতে কোনো সন্দেহ নেই, তেমনি বড় হৃদয়ের মানুষও ছিলেন তিনি। কাজী নজরুল ইসলামকে লেখা চিঠিই তার সবচে' বড় প্রমাণ। তিনি নজরুলকে লিখেছিলেন :

ময়মনসিংহ

১৯২৫

ভাই নজরুল ইসলাম,

তোমায় কখনো দেখি নাই। অনেকবার দেখা করার সুযোগ খুঁজেছি, সে সুযোগও ঘটে নাই- দূর হতে শুধু তোমার লেখা পড়েছি, মুগ্ধ হয়েছি, অন্তরের অন্তস্তল হতে ঐ প্রতিভার কাছে বারবার মস্তক নতো করেছি। বলেছি- 'প্রভো', এ কাঙ্গাল বাঙ্গালী মুসলিম সমাজকে যদি একটি রত্ন দিয়েছো, একে রক্ষা করো- সমাজকে দিয়ে ওর কদর করিয়ে নিও।' তোমায় এতো আপন ভাবি, এতো কদর করি বলেই আজ অকুণ্ঠচিত্তে তোমাকে তুমি বলে সম্বোধন করছি। তোমার গুণমুগ্ধ, তোমার প্রীতি আকাঙ্ক্ষী; তোমার ভক্ত ভাইয়ের এ আবদার তুমি রক্ষা করবে, তাও জানি।

আজ তোমায় কয়টি কথা বলবো, গুরু রূপে নয় ভাই রূপে, ভক্ত রূপে। এ কথাগুলো বলবো বলে অনেকবার তোমার সাক্ষাৎ খুঁজেছি। পাই নাই। কিন্তু কথাগুলিও বোধের তলে অনুদিন তোল-পাড় করছে। তাই পত্র মারফতই চেষ্টা করছি। আমি আগেই বলেছি, বাঙলার মুসলমান সমাজ কাঙাল: শুধু ধনে নয়, মনেও। তাই বাঙলার অমুসলমানরা তোমার যে কদর করছেন, মুসলিমরা তা করেন নাই, করতে শেখেন নাই। এ কথা ভেবে অনেক সময় লজ্জায় মাথা নতো করেছি, সমাজকে নিন্দা করেছি, বন্ধু মহলে রোষ প্রকাশ করেছি। কিন্তু সে শুধু নিন্দায় ফায়দা কি? শুধু আস্ফালনে ফল কি? সমাজ যে পতিত, দয়ার পাত্র; তাই সেইভাবে তাকে ধাক্কা দিয়ে জাগাতে হবে, পথে আনতে হবে। আর অন্যের কাছে তো আমার সে আবদারের অধিকার নেই, যে আবদার তোমার কাছে আমি করতে পারি। তাই এবার সমাজ ছেড়ে তোমার দিকে ফিরেছি। সমাজ মরতে

www.nagorikpathagar.org

বসেছে। তাকে বাঁচাতে হলে চাই সঞ্জীবনী সুধা। কে সে সুধার পাত্র হাতে নিয়ে এই মরণোন্মুখ সমাজের সামনে দাঁড়াবে? কোন সুসন্তান আপন তপোবলে গঙ্গা আনয়ন করে এ অগণ্য সগরগোষ্ঠীকে পুনঃ জীবনদান করবে, কাঙ্গাল সমাজ উৎকণ্ঠিত চিত্তে করুণ নয়নে সেই প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে। কেন জানি না; কিন্তু মনে হয়, তোমায় বুঝি খোদা সে সুধা ভাণ্ডের কিঞ্চিত দান করেছেন, অন্তরের অন্তরালে বুঝি সে সাধনার বীজ জমা আছে। হাত বাড়াবে কি? একবার সাহসে বুক বেঁধে সে তপশ্চারণে মনোনিবেশ করবে কি?

সুদূর অতীত ইতিহাসের প্রান্ত সীমার ওপার হতে যে অস্পষ্ট, অর্ধশ্রুত মায়াধ্বনি ভেসে আসে সে কবির কণ্ঠস্বর। কবি যে যুগে যুগে সত্যের গীতি, কল্যাণের গীতি, বিরাট অনন্ত মহাজীবনের নিগূঢ় ভিত্তি কর্মের উদ্বোধন গীতি গেয়ে এসেছে। স্নেহবাৎসল্য ভরপুর মাতৃক্রোড়ে, আধ নিমিলিত আঁখি শিশুর শয্যাপার্শ্বে নবীন-নবীনার মিলন তীর্থ-বিবাহবাসরে, ধর্ম যাজকের উন্নত বেদীতে, কর্ম বীরের উলঙ্গ অসি-বর্ষার রঙ্গ ভূমি যুদ্ধ ক্ষেত্রে, সমরশেষে বিজয়ের উল্লাস নিনাদে, শহীদের শোকে, নিহতের কল্যাণ কামনায় মহাযাত্রীর সমাধি ধারে কবির লীলায়িত বাণী ধ্বনি যুগে যুগে ঝংকৃত হয়েছে; মহামানবের মনোজ্ঞ করে যখনই যিনি যে বাণী প্রচার করতে চেয়েছেন, তিনি যতো বড় মহাসত্যই প্রচার করুন না, তিনি কবির বচন লালিত্যে মধুর করে তা বলতে চেয়েছেন, বলেছেন। কারণ বিশিষ্ট শক্তি স্ফূরিত স্বল্প সংখ্যক- বিশেষজ্ঞ রসশূন্য নির্মম বাণীর মর্যাদা রক্ষা করতে পারেন। কিন্তু বিশ্ব-মানবের চিত্ত স্পর্শ করতে হলে সেইভাবে উদ্বেল তরঙ্গায়িত বচন-প্রবাহেই তা করতে হবে, যাকে ধরবার জন্য খোদা তায়ালার স্থাপিত রাজধানীর দুই পার্শ্বের বেতার স্টেশন দুইটি অনুদিন এতো উদগ্রীব এবং যার মৃদু আঘাতে প্রাণের বীণায় নীরব তারে সহসা আকুল রাগিনী ঝংকার জেগে উঠে মানবদেহের স্নায়ুর তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে উন্মাদনার তড়িৎ প্রবাহ ছুটিয়ে দেয়। তুমি সেই কবিদের একজন; তোমার কণ্ঠে সেই সঞ্জীবনী সুধার উন্মাদনা আছে।

কিন্তু ভাই, তোমায় জিজ্ঞাসা করছি, কোন ব্রতে তোমার সে কণ্ঠস্বর তুমি নিয়োজিত করেছো? তোমার প্রতিভা অদ্ভুত, কিন্তু তারো চেয়ে গুরুতর তোমার দায়িত্ব। কড়ির মালিক যে, তার নিকাশ না দিলেও বড় আসে যায় না, কিন্তু মানিকের মালিকের নিকাশ দিতেই হবে, তোমার প্রতিভাকে তো তোমার সার্থক করতে হবে।

কোন পথে সে স্বার্থকতার অন্বেষণ করবে? বিদ্রোহে? উত্তম। কিন্তু বিদ্রোহকেও সুনিশ্চিত উদ্দেশ্যযুক্ত করতে হবে, শুধু তোমার 'যখন চাহে এ মন যা' উন্মাদ ঝন্‌ঝার মতো চললে তোমার জীবনের স্বার্থকতার নৈকট্য কোথায়? তৈমুরের বিরাট দুর্বার অভিযানের দিকে আমরা বিস্ময়ে চেয়ে থাকি, তারপর ক্লান্ত চোখ

www.nagorikpathagar.org

ফিরিয়ে নিই এবং তার কথা ভুলে যাই; কিন্তু বাবরের ক্ষুদ্রতর অভিযানের কথা ভুলতে পারি না। তাঁর অভিযান আমাদেরকে দিয়েছে দিল্লী, আগ্রা, ময়ূরাসন; সর্বোপরি দিয়েছে তাজমহল। তোমার কাছে আমরা চাই বাবরের অভিযান, যে অভিযানের দক্ষিণে-বামে-অগ্রে-পশ্চাতে নব নব সৃষ্টির সৌধ গড়ে উঠে।

বাংলার মুসলিমরা তোমার কদর করে নাই; কিন্তু তাই কি তাদেরে তুমি ছেড়ে যাবে? তোমার ক্ষেত্র মুসলিম-সাহিত্য। বাঙ্গালী মুসলিম চেয়ে আছে তোমার কণ্ঠ দিয়ে ইসলামের প্রাণ বাণীর পুনঃ প্রতিধ্বনি এই নিদ্রিত সমাজকে মহা আহ্বানে জাগ্রত করবে। বাংলার আর দশজন কবির মতো যদি তুমি কবিতা লেখো, তবে তোমার প্রতিভা আছে, স্থায়ী আসন তুমি পাবে, কিন্তু সে আসন মাত্র, সিংহাসন নয়। আজ বাংলার মুসলমান সাহিত্য রাজ্যে সিংহাসন খালি পড়ে রয়েছে, তুমি শুধু দখল করলেই হয়। মধুসূদন যদি শুধু ইংরেজি কাব্যই লিখতেন, তবে হয়তো একজন বায়রন হতে পারতেন, কিন্তু মধুচক্র রচয়িতা হতে পারতেন না। কিন্তু আমি শুধু যশোর, শুধু প্রতিষ্ঠার দিক দিয়ে এ প্রশ্নের বিচার করছি না।

আমার বক্তব্য এই : যেখানে দশটা অভাব আছে, সেখানে যদি সব অভাবগুলো একসঙ্গে দূর করা না যায়, তবে যেটি সবচেয়ে বড় অভাব, সেইটি আগে দূর করতে চেষ্টা করতে হবে।

এখন বিচার করতে হয়; তুমি বাঙ্গালী, তুমি কবি, তুমি মুসলমান। বাংলার কোনো কল্যাণ সাধনে তোমার আগে অগ্রসর হওয়া দরকার? বাঙ্গালীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী অজ্ঞ, সবচেয়ে বেশী কলঙ্কিত, সবচেয়ে বেশী নিন্দিত, কুলিখিত বিষয় ইসলাম। যিনি বাংলার সাহিত্যের ইসলামের সত্য সনাতন নিষ্কলঙ্ক চিত্র দান করবেন, যিনি 'এইসব ভগ্ন শুষ্ক বুকে আশা ধ্বনিয়ে তুলবেন, যিনি ইসলামের সত্য স্বরূপ দেশের সম্মুখে ধরে মুসলিমের বুকে বল দিবেন, অমুসলিমের বুক হতে ইসলামের অশ্রদ্ধা দূর করত হিন্দু-মুসলমান মিলনের সত্য ভিত্তির পত্তন করবেন, তিনি হবেন বাঙালী মুসলিমের মুক্তির অগ্রদূত।' তুমি চেষ্টা করলে তাই হতে পারো; তুমি সেই মহাগৌরবের আসন দখল করতে পারো; তুমি এইরূপে তোমার কবি প্রতিভাকে, তোমার জীবনকে, তোমার মানবতাকে সহজতমরূপে সার্থক করতে পার।

আরো এক কথা। এই বাঙ্গালী মুসলিমের মুক্তির অগ্রদূত রূপে যে তুমি আসবে, সে কোন পথে? বিদ্রোহের পথে? আমার মনে হয় না, তা নয়। ইংরেজিতে একটা আছে, Line of Ledst resistance বা লঘুতম বাধার পথে অগ্রসর হওয়া সমীচীন। সত্যিকার ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কিছু নাই; ইসলাম আধুনিকতম উন্নতম ধর্ম, তবে যে বাংলায় মুসলিমরা অনেক কুসংস্কারে পড়েছে,

www.nagorikpathagar.org

সে ইসলামের দোষ নয়, এই হতভাগারা ইসলামের সাথে ঐ কুসংস্কারগুলো পোষণ করছে। এখন এই কুসংস্কারগুলো দূর করতেই হবে, কিন্তু সেগুলো যে ইসলামের অনুশাসন নয়, বরং ইসলামের বিরুদ্ধ মত, এই বলে সেগুলোর নিন্দা করতে হবে, ইসলামকে, ইসলামের কোনো অনুষ্ঠানের নিন্দা করে নয়। কারণ যারা কুসংস্কারে ডুবে ইসলামের পবিত্র নামে হয়তো অজ্ঞাতে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করছে, তারাও ইসলামের নিন্দা সইতে পারে না, সুতরাং ইসলামের নিন্দার নামে খুব ভালো কথা বললেও তারা শুনবে না। যাদের শুনবার জন্য বলা, তারাই যদি না শোনে তবে সে বলায় লাভ কি? কিন্তু মুসলিমের একটা গুণ আছে, তারা ধর্মের নামে পাগল হয়, তাই সে হাফিজ-রুমীকে সত্য সাধক বলে বরণ করে নিয়েছে, তাই সে শেখ সাদীকে দৈনন্দিন জীবনের বহু কাজে আদর্শ মেনে নিয়েছে। তোমার বিদ্রোহী পড়ে যারা বিদ্রোহী হয়েছিলেন, তাঁদেরই একজন তোমার 'ছুবহে উম্মিদ' পড়ে আনন্দে গর্বে লাফিয়ে উঠেছিলেন, আর নাচতে নাচতে এসে আমায় বলেছিলেন, 'নজরুল যদি এমনি ধারায় লিখতো তবে বাংলার আলিমরা যে তাকে মাথায় করে রাখতো' (যিনি বলেছিলেন, তিনি একজন আলীম)। একথা কয়টা তোমায় ভেবে দেখতে বলি। বাংলার মৌলানা রুমীর আসন খালি পড়ে রয়েছে, তুমি তাই দখল করে ধন্য হও, বাংলার মুসলিমকে বাংলার সাহিত্যকে ধন্য করো।

তাই আজ বড় আশায়, বড় ভরসায়, বড় সাহসে, বড় মিনতির স্বরে তোমায় বলছি, ভাই কাঙ্গাল মুসলিমের বড় আদরের ধন তুমি, তুমি এই পতিত মুসলিম সমাজের দিকে, এই অবহেলিত ইসলামের দিকে একবার চাও, তাদের ব্যথিত চিত্তের করুণ রাগিণী তোমার কণ্ঠে ভাষা লাভ করে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলুক, তাদের সুপ্ত প্রাণের জড়তা তোমার আকুল আহ্বানের উন্মাদনায় চেতনাময়ী হোক, ইসলামের মহান উদার উচ্চ আদর্শ তোমার কবিতায় মূর্তি লাভ করুক, তোমার কাব্য সাধনা ইসলামের মহান নীতিতে চরম স্বার্থকতায় ধন্য হোক। আমিন।

অনেক কথা বলে ফেললাম ভাই- মাফ করো। ভাইয়ের কাছে ভাই যদি এমন প্রাণ খুলে কথা না বলবে, তবে বলবে কোথায়? গুণমুগ্ধ-ইবরাহীম খাঁ।

কবি কাজী নজরুল ইসলামের কাছে লেখা ইবরাহীম খাঁর ঐ চিঠি শুধুমাত্র চিঠি নয়, ইবরাহীম খাঁর জাতীয় চিন্তা ও আদর্শের এক উন্মুক্ত দলিল।

একদা নজরুলের জন্যেও তিনি যেমন প্রেরণার মতো আবির্ভূত হয়েছিলেন, এখনও তিনি রয়ে গেছেন এক সর্বস্পর্শী প্রেরণা।

www.nagorikpathagar.org

কৃতজ্ঞতা স্বীকার-

১. কবি-গীতিকার আজিজুর রহমান
২. দেওয়ান আবদুল হামিদ
৩. মফিজউদ্দিন আহমদ
৪. আহমাদ কাফিল
৫. ইবরাহীম খাঁ একাডেমি
৬. এ এ এস মুহাম্মদ জাকারিয়া
৭. আসাদুজ্জামান খাঁ
৮. খালেদা হাবীব
৯. আমিনুজ্জামান খাঁ
১০. মোহাম্মদ নূরুল হক
১১. অধ্যাপক আবদুল গফুর
১২. সুলতানা রাহমান একাডেমি
১৩. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ
১৪. বাংলা একাডেমি

www.nagorikpathagar.org

সাক্ষাৎকার

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

মতিউর রহমান
মল্লিকের

সাক্ষাৎকার

www.nagorikpathagar.org

প্রসঙ্গ কথা

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের জীবদ্দশায় পাঁচটি কবিতার বই, দুটি গীতি কবিতার বই, একটি প্রবন্ধের বই ও একটি কিশোর কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। ইন্তেকালের পর এ পর্যন্ত একটি গীতিকাব্য, উপন্যাসের একটি অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ হলেও এখনো বিভিন্ন স্মারক-সংকলন ও পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে তার বহু লেখালেখি। মতিউর রহমান মল্লিকের জীবদ্দশায় বিভিন্ন, পত্র-পত্রিকা, সংকলন ও ব্যক্তি উদ্যোগে বেশকিছু সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। তবে গ্রন্থ আকারে মলাটবদ্ধ হয়নি ইতোপূর্বে। কবি আহমদ বাসির এই উদ্যোগটি গ্রহণ করেন। তার সম্পাদনায় মর্নিং ব্রিজ প্রকাশনী থেকে ২০১৭ সালে মতিউর রহমান মল্লিকের "সাক্ষাৎকার" নামে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন শিল্পী হামিদুল ইসলাম। বইটির মূল্য-৩০০ টাকা। সম্পাদক বইটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের উৎসর্গ করেছেন।

গ্রন্থটিতে ইতিবৃত্ত, ভূমিকা, আটটি প্রকাশিত সাক্ষাৎকার, দুটি অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকার সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থটির ভূমিকায় সম্পাদক কবি আহমদ বাসির বলেন- "...এই দায়িত্ববোধ থেকেই কবি 'মতিউর রহমান মল্লিকের সাক্ষাৎকার' গ্রন্থটি প্রণয়নের প্রেরণা লাভ করি। কবির সঙ্গে দীর্ঘ এক যুগের ঘনিষ্ঠতার ফলে তাঁর বিভিন্ন সাক্ষাৎকার সম্পর্কে আমি অবগত ছিলাম। এগুলোর গুরুত্ব ও তাৎপর্য আমার কাছে অপরিসীম। কেননা, সাক্ষাৎকারের ভিতর দিয়ে একজন ব্যক্তির যতো কাছে যাওয়া যায়, যতো ভালোভাবে তাকে আবিষ্কার করা যায়, অনেক সময় অন্য মাধ্যমে এতোটা সম্ভব হয় না। তাছাড়া সাক্ষাৎকারে এমন সব বিষয়ই উঠে আসে যা অন্যভাবে জানা যায় না বলেই সাক্ষাৎকার নেয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়।"

কবি আহমদ বাসির সম্পাদিত 'মতিউর রহমান মল্লিকের সাক্ষাৎকার' গ্রন্থের সাক্ষাৎকারসমূহ ছাড়াও আরো ৪টি সাক্ষাৎকার যা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত সাক্ষাৎকারসমূহ অগ্রন্থিত সাক্ষাৎকার শিরোনামে গ্রন্থভুক্ত করা হলো।

www.nagorikpathagar.org

এই সাক্ষাৎকার গ্রন্থটিতে মূলত মতিউর রহমান মল্লিকের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে দীর্ঘ পথপরিক্রমার আনন্দ-বেদনা ও অভিজ্ঞতার নানান অনুষঙ্গ উঠে এসেছে একান্ত আলাপচারিতায়।

কবি মতিউর রহমান মল্লিক স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রায় চার দশক ধরে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করেছেন। তবে তিনি যে সময় সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কাজ শুরু করেন সেইসময় পরিস্থিতি ছিলো এ কাজের জন্য সবদিক থেকেই প্রতিকূল। ইসলামপন্থী সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের জন্য একটি মন্বন্তর বলা চলে। সেই প্রতিকূলতার মধ্যেই তিনি হাল ধরেন বাংলাদেশের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের। টানাপোড়েনের সেই ক্রান্তিকালে কাজ করতে গিয়ে নানান বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। কখনো কখনো হোঁচট খেয়ে পড়েছেন, কিন্তু হতাশ হননি। আবার কখনো এই বাধাকেই আশির্বাদ হিসেবে নিয়েছিলেন। কষ্ট পেয়েছেন ঠিকই। তবে থেমে থাকেননি। মহান আল্লাহর একান্ত মেহেরবাণীতে একনিষ্ঠ শ্রম, পরম ধৈর্য আর নানাবিধ ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে সকল প্রতিকূলতা কাটিয়ে সাহিত্য সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একটি সৃজনধারা তৈরি করতে সক্ষম হন তিনি। বর্তমানে সারাদেশব্যাপী একটি সুস্থধারার সাহিত্য সাংস্কৃতিক আন্দোলনের গতিময় পথচলা প্রবহমান।

কবি মতিউর রহমান মল্লিক যে সময়ে সারাদেশে বিশুদ্ধ ইসলামী চেতনার সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে জাগিয়ে তুললেন, ম্রিয়মান জাতিসত্তা ও ইতিহাস-ঐতিহ্যকে আবার নতুন করে জাতির সামনে উপস্থাপন করলেন, সে সময় তার গুরুত্ব সবাই সমানভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি অথবা অনেকেই না দেখার ভান করে মতিউর রহমান মল্লিককে এড়িয়ে গেছেন। তারপরেও যারা মতিউর রহমান মল্লিককে উপলব্ধি করতে পেরেছেন তাদের সাময়িকী ও সাহিত্যপত্রে তুলে ধরেছেন প্রিয় কবির সেইসব গুরুত্বপূর্ণ কথামালা।

আর এইসব সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে আমাদের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অনেক বিতর্কিত বিষয়ের সমাধান। একটি আদর্শ ও ঐতিহ্যবাদী সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সুস্পষ্ট কর্মপদ্ধতিও তিনি পেশ করেছেন। কবির অভিজ্ঞতা ও সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ভবিষৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের রূপরেখাও পাওয়া যায় এই গ্রন্থে। মতিউর রহমান মল্লিক একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আভাসও দিয়ে গেছেন। তাঁর উত্তরসূরিরা সারাদেশে ইসলামী সাহিত্য–সংস্কৃতির প্রতি মানুষের ভালোবাসা, আগ্রহকে পুঁজি করে প্রবহমান এ উজ্জীবনী গতিধারাকে আরো শাণিত করতে সক্ষম হবে। আন্দোলনকে বিপ্লবের দিকে ত্বরান্বিত করবে। ইনশাআল্লাহ।

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

প্রকাশিত সাক্ষাৎকার

আগামী শতকের গান হবে নেতৃত্বদানকারী ইসলামী গান/ ২৭৫
মতিউর রহমান মল্লিকের সঙ্গে কিছুক্ষণ/ ২৮২
ছড়া ও কবিতার মধ্যে আমি কোনো পার্থক্য করি না/ ২৮৭
প্রকৃত সাহিত্যই ইসলামী সাহিত্য/ ২৮৯
একান্ত সাক্ষাৎকারে কবি মতিউর রহমান মল্লিক/ ৩০৮
ঢাকা হবে বিশ্ব কবিতার এক অপরিহার্য বিচরণ ক্ষেত্র/ ৩১৩
গান কোকিলের বৈঠকে/ ৩১৫
মতিউর রহমান মল্লিক-এর প্রিয় বিষয়াবলী/ ৩২৬

অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকার

সব ভাষার আকর্ষণীয় সুরগুলিই আমাকে আকর্ষণ করে/ ৩২৯
মুখোমুখি মতিউর রহমান মল্লিক/ ৩৩৪

অগ্রন্থিত সাক্ষাৎকার

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের সাক্ষাৎকার/৩৫০
গানের মধ্যে আমি সবসময় গভীর এবং অপ্রতিরোধ্য আবেগ অনুভব করি/৩৬৩
ইসলামের আলো গ্রহণ করেই আমাদের সাংস্কৃতিক অন্ধকার দূর করতে হবে/৩৭২
কবি মতিউর রহমান মল্লিকের মুখোমুখি/ ৩৭৬

তথ্যসূত্র :

www.nagorikpathagar.org

[প্রকাশিত সাক্ষাৎকার]

আগামী শতকের গান হবে নেতৃত্বদানকারী ইসলামী গান

পৃথিবী পার হলো একটি সহস্রাব্দ; চলছে নতুন শতক। এই শতকে আমাদের গল্প-কবিতা, রাজনীতি, দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ কি হবে এ নিয়ে চলছে আমাদের পূর্ব প্রস্তুতি, সুন্দর পরিকল্পনা। ...আগামী শতাব্দী হবে ইসলামের শতাব্দী। অতএব সেই শতাব্দীর গানকেও হতে হবে নেতৃত্বদানকারী ইসলামী গান; আর এ নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম, ইসলামী ঘরানার বিজ্ঞ ব্যক্তি, অসংখ্য সঙ্গীত রচয়িতা ও কণ্ঠশিল্পী মতিউর রহমান মল্লিকের সাথে। তিনি সুর সঙ্গীত নিয়ে আমাদের প্রতিনিধি মৃধা আলাউদ্দিন এর কাছে যে সাক্ষাৎকার দেন তা নিম্নে আমরা মুদ্রণ করলাম।

■ **কবি, গীতিকার, সুরকার কোন্ পরিচয়ে আপনি স্বাচ্ছন্দবোধ করেন?**

– মজার প্রশ্ন, এই প্রশ্নের জন্য তোমাকে স্বাগত জানাই। একজন মানুষের কাছে যেমন তার সব সন্তানই সমান প্রিয়, তেমনি একজন লেখকের কাছে তার সব লেখাই প্রিয়। তবুও আমি বলব, কবিতার সঙ্গে আমার যে যোগসূত্র- সেই যোগসূত্রকেই আমি সবচেয়ে গৌরবের, আনন্দের মনে করি।

■ **সঙ্গীতে আপনার গুরু কবে থেকে? এবং সেই গুরুর কিছু বলুন।**

– ছোটবেলা থেকেই গানের প্রতি আমার প্রচণ্ড আগ্রহ ছিলো এবং আমি দেখেছি ছোটবেলায় আমাদের বাড়ির পরিবেশটা ছিলো একটা সাংস্কৃতিক পরিবেশ। বড় ভাই (কবি আহমদ আলী মল্লিক) নামকরা একজন কবি। ফররুখ আহমদ তাঁকে ঢাকায় আসার জন্য অনুরোধ করেছিলেন; কিন্তু স্কুল শিক্ষক হওয়াতে তিনি ঢাকায় বসবাস করতে পারেননি। আমার এ বড় ভাই বিশ্বসাহিত্যের সাথেও গভীরভাবে পরিচিত। বিশাল লাইব্রেরি ছিলো আমাদের বাড়িতে। সেই সাথে ছোটবেলায়ই আমি পেয়েছিলাম ফিলিপস রেডিও, সেই ফিলিপস

www.nagorikpathagar.org

রেডিও'র প্রতি আমার প্রচণ্ড আগ্রহ ছিলো। বড় ভাই যখন স্কুলে চলে যেতেন তখন আমি রেডিও শুনতাম।

আমাদের গ্রামে অনেকগুলো কারিগর ছিলো। বিড়ির কারিগর। এই কারিগরদের বাড়িতে সব সময় ভিড় জমে থাকত। সাধারণ মানুষ গল্প-গুজব করার জন্য এইসব জায়গায় বসতো, আড্ডা দিতো। এদের সাথে ছিল রেডিও। আমি এদের আড্ডায় থাকতাম; কিন্তু আমার মূল লক্ষ্য ছিল রেডিও। আমার মনে আছে, কখনো কখনো আমার দুপুরে খাওয়া হতো না। একটি কর্মপর্বের পরে খানিকটা বিরতি দিয়ে আরেকটা কর্মপর্ব আরম্ভ হতো এবং আমি ঐ বিরতির সময়ও রেডিওর পাশে বসে থাকতাম গান শোনার জন্য। এইভাবে কেনো জানি গানের সাথে আমার প্রচণ্ড ভাব সৃষ্টি হয়েছিল; পরে আমি আম্মার কাছে শুনেছি, আব্বা জারীগান লিখতেন এবং ছোট চাচা (ঈমান উদ্দিন মল্লিক)- খুব সুন্দর একটা মানুষ ছিলেন; খুব সুন্দর কন্ঠের অধিকারী ছিলেন- তিনিই আব্বার ঐ জারীগুলো সুর দিয়ে গাইতেন। আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে অনেকেই এই জারী গানের সাথে যুক্ত ছিলেন। মোটকথা পারিবারিকভাবে আমাদের একটি জারী গাওয়ার দল ছিলো। সেই দল যেমন পরিচালনা করেছেন আমার চাচা; আর সেই দলের গানের রসদ জুগিয়েছেন আমার আব্বা– ফলে আমার রক্তের মধ্যে সুরের প্রভাব ছিলো, গানের আকর্ষণ ছিলো। গান কবে থেকে শুরু করেছিলাম এটা নির্দিষ্ট করে বলা যাচ্ছে না। তবে খুব ছোটবেলা থেকেই গান লিখতে আরম্ভ করি; ইসলামী আন্দোলনের সাথে যুক্ত হবার আগে আমি প্রেমের গান লিখতাম। অর্থাৎ প্রেমের গান দিয়েই আমার গানের জীবন শুরু।

■ **আপনারা সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করতে গেলেন কেনো? এটা কি সেই সময়ে খুব জরুরি ছিলো?**

– শুধু জরুরি কেনো? জরুরির চেয়ে জরুরি ছিলো। কেননা, আমরা যখন সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করি তখন দেশে ইসলামী গানের প্রতি প্রচণ্ড অবহেলা ছিল– না রেডিওতে ইসলামী গানের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হতো, না টিভিতে। বলতে গেলে ইসলামী গানকে রেডিও, টিভি থেকে খুব কৌশলে সরিয়ে রাখা হত। হামদ-নাত গাওয়া হতো ঠিকই কিন্তু ইসলামী গানের যে ধারা বহমান ছিলো তা যেনো হঠাৎ করে বন্ধ করে দেয়া হলো। অর্থাৎ তখন সেটা জরুরি ছিলো; একান্ত জরুরি, যা ইসলামের দুশমনরাও এখন অস্বীকার করতে পারবে না।

■ **বর্তমানে সমাজে সাইমুমের প্রভাব কতটুকু?**

– প্রশ্নটি আমাকে যথেষ্ট ভাবিয়ে তুলেছে। এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমার তো

www.nagorikpathagar.org

মনে হয় যথেষ্ট সময় নেয়া দরকার। সময় নেয়া দরকার, প্রশ্নের জবাবটি ব্যাখ্যা করে বলার জন্য। তবুও আমি সংক্ষেপে বলি– সাইমুমের প্রভাব, সাইমুমের পরিচিতি, ঠিক ততোদূর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে যতোদূর পর্যন্ত ইসলামী আন্দোলন, আন্দোলনের বিবিধ বিষয় ছড়িয়ে গেছে। আরো স্পষ্ট করে বলতে চাই এইভাবে যে, সাইমুম যেহেতু ইসলাম, ইসলামী আন্দোলনকে সামনে রেখে পথ চলা শুরু করেছিলো, সে জন্য সাইমুমের আবেদনটা সত্যিকার অর্থে ইসলামকে যারা ভালোবাসে, ইসলামের প্রতি যাদের মমত্ব আছে, ঠিক সেই সব মানুষ পর্যন্ত।

সাইমুমের প্রভাবটা সমাজে কতোটুকু পড়েছিল তা আমি আমার একটা গল্প দিয়ে বোঝাতে চাই। আমি একবার আমার গ্রামের পথ দিয়ে হাঁটছিলাম, হঠাৎ শুনি এক তরুণ খুব মিষ্টি সুরে গান গাইছে– মুসলিম আমি সংগ্রামী আমি/ আমি চির রণবীর। পেছন থেকে আমার মনে হলো যে, ও আমাদের অশোকই (আমার হিন্দু বন্ধু) হবে। আমি হতবাক হয়ে গেলাম; অশোক এ গান গাইবে কেন? দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলাম, কাছাকাছি গিয়ে দেখি, হ্যাঁ, সত্যি সে আমাদের অশোক। আমি বললাম, অশোক! তুমি এ গান গাইছো কেনো? অশোক বললো- আরে গান তো গানই; গাইতে ভালো লাগছে, গাইছি। আমি সেদিন অনুভব করেছিলাম সত্যিকারভাবে যদি ভালো গান লেখা যায় ও ভালো সুর দেওয়া যায়, তাহলে সেই গানের প্রতি মানুষের আকর্ষণ থাকে, থাকবে। আমি কি এ ঘটনা দিয়ে বোঝাতে পারলাম যে, সাইমুম সমাজে কতোটা প্রভাব ফেলেছে?

■ **সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আপনারা কি নতুন কোনো মাত্রা যোগ করেছেন?**

– অবশ্যই নতুন মাত্রা যোগ করেছি। কেননা, এই বাংলাদেশে খালি গলায় অর্থাৎ মিউজিক ছাড়া গান ছিলো না। আমরা এসেই খালি গলায় গান শুরু করেছি; মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি। এটা কি নতুন মাত্রা হলো না? আজকে যে ইসলামী গানের ক্যাসেট অহরহ পাওয়া যাচ্ছে, রেডিও টিভিতে ইসলামী গানের প্রচলন শুরু হয়েছে, এর পেছনে সাইমুমের অবদান অনেক।

অথবা আজকে যে রেডিও টিভিতে সমবেতভাবে ইসলামী গানের জলসা– সেও ঐ সাইমুমেরই অবদান। এতো গেলো একদিক; আমরা আরো একদিকে নতুন মাত্রা যোগ করেছি বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আর তা হলো ইসলামী গানের প্রতি ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকে বিরূপ প্রভাব ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিলো, পুরোপুরি একটা ষড়যন্ত্র চালানো হয়েছিল। কিন্তু সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠীর জন্য সেই ষড়যন্ত্র কার্যকর করা যায়নি। এটাও আমাদের একটা জয়– শুধু যে ইসলামপন্থীরাই ইসলামী গান শুনছে তা নয়; দেশের অসংখ্য মানুষ আজ ইসলামী গান শুনছে,

www.nagorikpathagar.org

দেশে একটা ইসলামী গানের বাজার তৈরি হয়েছে। ইসলামী গানের ক্যাসেট এখন প্রায় প্রতিটি ক্যাসেটের দোকানে পাওয়া যাচ্ছে। আগে এ রকম ইসলামী গানের ক্যাসেট খুঁজেই পাওয়া যেতো না; এখন ব্যবসার খাতিরেই দোকানে ইসলামী গানের ক্যাসেট রাখে; এখানেও আমাদের বিজয়; এখানেও আমরা নতুন মাত্রা যোগ করেছি।

এসব ছাড়াও সাইমুম আরো একটি বড় কাজ করেছে– তা হলো তারা সমগ্র জনতাকে নিয়ে নিজেদের দিকে ফিরছে; আর এই ফেরা দেখে অন্যরাও ঘরে ফেরার তাগিদ অনুভব করছে। মানুষ মূলের কাছে ফিরছে। অর্থাৎ সাইমুম চেয়েছে, মাটি ও মানুষের সুর তুলে আনতে। এ ক্ষেত্রেও তারা জয়ী বলেই মনে করি। যেমন, জারীর সুর, পল্লীগীতির সুর সাইমুম অনেক যত্নের সাথে তুলে এনেছে; যে কাজটি একদিন আব্বাস উদ্দীন করেছিলেন, আবদুল আলীম করেছিলেন। বড় বড় আরো শিল্পীরাও করেছিলেন। একেবারে মাটির সুর, মানুষের সুর, গ্রামবাংলার সুর সাইমুম খুব যত্নের সাথে সংগ্রহ করেছে। সাইমুমের মতো এ কাজটি পাঞ্জেরী ও প্রত্যয় শিল্পীগোষ্ঠীও করে যাচ্ছে। এখানে একটি কথা বলা দরকার, যারা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখে তারা মাটির সাথেও সম্পর্ক রাখে। আর এর মধ্যবর্তী যারা তারা না আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখে, না মাটির সাথে। অর্থাৎ সাইমুম যে মাত্রা যোগ করেছে, তা হলো তারা আবার মাটি ও মানুষের সাথে যোগ সৃষ্টি করেছে; তারা আল্লাহর সাথে যোগ সৃষ্টি করেছে, গানে নতুন মাত্রা সৃষ্টি করেছে।

■ **ইসলামী রেনেসাঁস বা পুনর্জাগরণে সঙ্গীতের গুরুত্ব কতটুকু?**

– ইসলামী পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে সঙ্গীতের গুরুত্ব কতটুকু এটা বলার আগে ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, প্রচারের ক্ষেত্রে সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক দিকগুলো কতোটা গুরুত্বপূর্ণ ছিলো সে ব্যাপারে দু'একটা কথা বলা যায়। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামী আন্দোলনের জন্য সব শ্রেণির মানুষের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন এবং ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সব অঙ্গনের মানুষকেই তিনি কাছে ডেকেছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগের একটা ঘটনা সব সময় আমাকে আলোড়িত করে এবং এ ঘটনাটির মধ্য দিয়ে আমি বুঝতে পেরেছি যে, ইসলামী রেনেসাঁস বা পুনর্জাগরণে সঙ্গীত, সাহিত্যকলার গুরুত্ব কতোটা ছিল। একবার এক দলপতি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো– হে মোহাম্মদ! তুমি তোমার কবিদেরকে ডাক, বক্তাদের ডাক এবং আমিও আমার কবিদের ডাকি, বক্তাদের ডাকি। যারা জয়ী হবে তারাই হবে সত্যবাদী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবাইকে ডাকলেন এবং এক সময় সভা শেষ

www.nagorikpathagar.org

হলে ঐ দলপতি বললো, এক্ষুণি আমরা সবাই মিলে তোমার কাছে ইসলাম গ্রহণ করছি– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

এ রকম অনেক ঘটনা রয়েছে যার মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবিদের অপরিহার্যতা, শিল্পীদের অপরিহার্যতা গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। অর্থাৎ কোনো দেশে যখন বিপ্লব হয়, তখন সে দেশের মানুষের যে আশা-আকাঙ্ক্ষা তার অনেকটা পূরণ করে শিল্পী, সাহিত্যিক, গায়করা। সুতরাং রেনেসাঁস বা পুনর্জাগরণের সময় সঙ্গীত বা শিল্প-সাহিত্যের ভূমিকা অপরিসীম। যেমন– আমাদের দেশ যখন স্বাধীন হলো বৃটিশদের কবল থেকে তখন নজরুলের যে ভূমিকা, আব্বাস উদ্দীনের যে ভূমিকা, মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব-এর সেই একই ভূমিকা ছিলো।

■ **স্যাটেলাইটের এ যুগে ইসলামী সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ কতটুকু?**

– সোজা উত্তর ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ যতটা উজ্জ্বল, ইসলামী বিপ্লবের ভবিষ্যৎ যতটা উজ্জ্বল ইসলামী সঙ্গীতের ভবিষ্যতও ততোটা উজ্জ্বল।

■ **সামনেই একবিংশ শতাব্দী। নতুন শতাব্দীর গান নিয়ে কি ভাবছেন?**

– ইসলামী গান যেমন বিপ্লবের হাতিয়ার তেমনি ইসলামী গান হচ্ছে মানুষের ভিতরে যে মানুষটা আছে তাকে জাগ্রত করার হাতিয়ার। আজকাল তো গানকে রোগীর পথ্য হিসাবেও ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ গান নিয়ে মানুষের নতুন করে ভাবতে হচ্ছে এবং ভাবাটাই স্বাভাবিক। একটি নতুন শতাব্দী আসছে, সেই শতাব্দীর মানুষের চিন্তা এবং চেতনায় একটা পরিবর্তন আসবে এটা স্বাভাবিক। চিন্তার মৌলিকত্ব ঠিক থাকবে; কিন্তু যুগের যে চাহিদা তা পূরণ করতে হবে। আগেও একটা শতাব্দী এসেছিলো; তখন মানুষ নতুন করে সাজিয়েছিলো– আমরাও তাই করবো। অর্থাৎ আমরা চাই নতুন শতাব্দীর আবেদনকে পূরণ করতে, চাহিদাকে মান্য করতে। যুগের চাহিদা থেকে পিছিয়ে পড়তে পারবো না, যদি পড়ি সে হবে আমাদের বোকামি। তাছাড়া নতুন শতাব্দী যদি হয় ইসলামের শতাব্দী তাহলে স্বাভাবিকভাবেই ধরে নিতে হবে যে, ইসলাম- রাজনীতি, সংস্কৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব দেবে, সে কারণেই তাকে শিল্প-সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রেও নেতৃত্ব দিতে হবে।

অতএব এ শতকে আমরা সেই ধরনের গান রচনা করবো এবং সেই সব সুর সংযোজন করবো যে সব গান সমস্ত গানের নেতৃত্ব দেবে, যে সব সুর সমস্ত সুরের নেতৃত্ব দেবে। তার মানে আমরা ভাবছি নেতৃত্বদানকারী গানের ব্যাপারে, সুরের ব্যাপারে।

www.nagorikpathagar.org

■ ফররুখ আহমদ সম্পর্কে কিছু বলুন।

– আসলে ফররুখ আহমদ-এর ব্যাপারে আমরা যখন কাজ করি, তখন স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মাঝে একটা বেদনা জেগে ওঠে। এজরা পাউন্ড একজন পশ্চিমা জগতের বড় কবি; পুঁজিবাদের বিরুদ্ধেও এজরা পাউন্ড কথা বলেছেন; তার মানে আজকে পশ্চিমের যে আদর্শ সে আদর্শকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করেছিলেন এজরা পাউন্ড। অর্থাৎ একজন বড় কবিরই শোভা পায় পৃথিবীকে ভেঙেচুরে নতুন করে গড়বার- এজরা পাউন্ড তা করেছিলেন। তারা এজরা পাউন্ডকে পরিত্যাগ করেনি। হিন্দুরা তো মাইকেলকে, রবীন্দ্রনাথকে পরিত্যাগ করেনি– রবীন্দ্রনাথ একেশ্বরবাদী ছিলেন, ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী ছিলেন। কই তবুও তো হিন্দুরা তাঁকে বর্জন করেনি! করেনি এজন্যে যে, তিনি একজন বড় কবি– যদিও আমি মনে করি কবি হিসেবে বাংলা সাহিত্যে নজরুলের চেয়ে বড় কোনো কবি নেই। শুধু কবি নন, গানের ক্ষেত্রেও তাঁর রয়েছে বিশাল বিরাট ভাণ্ডার। মূলত ফররুখ আহমদ এতো বড় কবি হওয়ার পরও কিছু কিছু তথাকথিত বুদ্ধিজীবী তাঁকে খাটো করে দেখার প্রয়াস পাচ্ছে। কিন্তু এই দেখাটা গর্হিত। তাঁর গান আজ অবহেলিত। অথচ তাঁর অসংখ্য গান রয়ে গেছে। এক সময় রেডিওতে তাঁর অসংখ্য গান প্রচারিত হয়েছে। আজ হচ্ছে না। ওস্তাদ আবদুল লতিফরা এক সময় তাঁর গানে সুর দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর কয়টা গানের সুর তারা দিয়েছিলেন? অসংখ্য গান রয়ে গেছে অগোচরেই। সেই গানগুলো সুর দেওয়ার তাকিদ কারো নেই। গানগুলো উদ্ধার করার তাকিদও কারো নেই। তাঁর গান এখন আর রেডিও-টিভিতে প্রচার হচ্ছে না। কিন্তু ফররুখ আহমদকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না । দেশপ্রেমিক এবং ইসলাম প্রিয় মানুষ তাঁকে তাঁর উপযুক্ত আসনে বসাবেই। যেমন নজরুলকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারেনি। আমার খুবই ভালো লাগছে ফররুখ আহমদকে নিয়ে প্রশ্ন করার জন্য। তোমাকে ধন্যবাদ।

■ ধন্যবাদ আপনাকেও বিশ্বসাহিত্যের সাথে ফররুখ আহমদকে মিলিয়ে দেখার জন্য। আমার এবারের প্রশ্ন- 'তোমার সৃষ্টি যদি হয় এতো সুন্দর/ না জানি তাহলে তুমি কতো সুন্দর' গানটি যখন আপনি লিখেছেন, তখন কি ভেবেছেন যে, এ গানটি এতো বিপুল খ্যাতি অর্জন করবে? যদি ভাবতেন তবে কি এটা আরো দরদ দিয়ে লিখতেন?

– আমি তখন উত্তরায় থাকি। এখন উত্তরায় যে বাড়ি-ঘরগুলো দেখা যায়, তার তিন ভাগের একভাগও তখন ছিলো না। উত্তরা থেকে যখন সকাল বেলা বাসে করে ঢাকায় আসতাম, নতুন এয়ারপোর্ট পেরিয়ে পূর্ব দিকে তাকালে বড় একটা বিল চোখে পড়ত। ঐ বিলের পানি আর সবুজের সমারোহ দেখেই আমার ঐ গানের জন্ম। বলা যায় এটি লেখা গান নয়; দেখা গান। আর দরদের কথা বলছ? একজন সৃষ্টিশীল মানুষ তার সমস্ত সৃষ্টিকেই প্রচণ্ড দরদ আর নিপুণতার

www.nagorikpathagar.org

সাথে গড়ে তোলেন। প্রশ্নের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। কেননা, আমি একটি গানের প্রেক্ষাপট বলতে পারলাম।

■ **ইসলামী গান ছাড়াও আপনি কি অন্য কোন গান শোনেন?**

– কেনো শুনব না? অবশ্যই শুনি। শুনি এই জন্য যে, সুরের বৈচিত্র্য আমার জানা দরকার এবং আধুনিক সুরের সাথে, সর্বাধুনিক সুরের সাথে আমার পরিচিতি দরকার। তাই আমি সময় সুযোগ করে দেশি-বিদেশি অনেক রকম গানই শুনি। শুনতে হয়।

■ **আমার সর্বশেষ প্রশ্ন, দারুসসালাম সম্পর্কে কিছু বলুন।**

– দারুসসালাম সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয়, দারুসসালাম একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করতে যাচ্ছে; সম্পূর্ণ করতে যাচ্ছে। দারুস সালাম একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে চলছে; যে বৈশিষ্ট্য নিয়ে চলাটাকে আজ-কাল অনেকেই পছন্দ করবে না জানি, তবুও তাকে পথ চলতেই হবে।

দারুসসালাম সম্পর্কে আমি প্রথমে গালিব হাসানের কাছ থেকে অবহিত হই। সত্যি কথা বলতে কি, গালিবের নাম না দেখলে হয়তো আমি দারুসসালামকে অতো গভীরভাবে গ্রহণ করতাম না। যে ক'টা সংখ্যা আমার হাতে এসেছে আমি খুব আগ্রহ ভরেই তা পর্যবেক্ষণ করেছি। সর্বশেষ দারুসসালামকে আমার আন্তরিক অভিবাদন, শুভেচ্ছা।

দারুসসালামের পক্ষ থেকে আপনাকেও অসংখ্য সালাম, শুভেচ্ছা।

www.nagorikpathagar.org

মতিউর রহমান মল্লিকের সঙ্গে কিছুক্ষণ

কবি মতিউর রহমান মল্লিককে সাহিত্যের পাঠকদের কাছে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। এই প্রথিতযশা কবি-গীতিকারের সঙ্গে বিগত ০৭.১০.২০০০ ইং মাইজদী স্কুল হেলথ ক্লিনিকে কথা বলার সুযোগ করে দেন ফুলকুঁড়ি আসর নোয়াখালী শাখার দুই প্রাক্তন পরিচালক তিতুমীর দুলাল ও মোহাম্মদ উল্যাহ সোহাগ। এ দুজনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। **– এফ এম মোহাম্মদ নূরুল হক**

■ **আপনার লেখালেখির শুরু সম্পর্কে জানতে চাই।**

– আমি লেখালেখি শুরু করেছি একেবারে শৈশবকাল থেকে। আমার আব্বা ছিলেন গাঁয়ের কবি। চাচা ছিলেন গাঁয়ের লেখক। আব্বা কবিতা লিখতেন, গান লিখতেন। সেগুলো চাচা সুর করে আত্মীয়-স্বজনের ভেতর থেকে কিছু লোক জড়ো করে গ্রামে গ্রামে গেয়ে বেড়াতেন। আমার বড় ভাই কবি ছিলেন। বড় মাপের কবি। সুতরাং একটি সাহিত্যিক পরিবেশে আমি বড় হয়েছিলাম। ছোটবেলা থেকে লেখালেখির ব্যাপারে আমার মধ্যে আগ্রহ জন্মেছিল।

■ **আপনিতো প্রধানত কবি এবং গীতিকার, আমরা আপনাকে কোন পরিচয়ে চিনবো?**

– এ ধরনের প্রশ্ন আমাকে আরও করা হয়েছে। এবং বিভিন্নভাবে আমি উত্তর দিয়েছি। আজকে আমি অন্যভাবে উত্তর দিতে চাই। কবির কাজ কবিতা লেখা, গীতিকারের কাজ গান লেখা। এখন সময়ই বলে দেবে যাকে কবি বলা হয়েছে সে কি কবি নাকি গীতিকার। যাকে গীতিকার বলা হয়েছে সে কি গীতিকার না কবি। একটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কবি না হয়ে গান লেখা যায় না। কবি এবং গীতিকারের মধ্যে আমি কোনো পার্থক্য দেখি না। যে ছন্দ জানে না সে তো গান লিখতেই পারবে না। সুতরাং কবি আর গীতিকারের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। গীতিকার হওয়ার জন্য যেমন কবি হওয়া প্রয়োজন; আবার কবি হওয়ার জন্যেও তেমন গীতলতা প্রয়োজন। এখন আপনারা আমাকে কী নামে ডাকবেন, সে দায়িত্ব আপনাদের।

www.nagorikpathagar.org

■ **আপনার একটি কবিতার শেষ দুই পঙক্তি- 'এশিয়াই পুরয়িতা রোদরু ছায়ার / ইউরোপ তলে তলে বারুদের ঘ্রাণ'- এখন আপনার কাছে জানতে চাইবো, এই কবিতা লেখার পেছনে কোন্ বিশেষ বোধ কাজ করেছে?**

– অবশ্যই বোধ কাজ করেছে। নবী রাসূলগণের অধিকাংশের আবির্ভাব এশিয়াতে। এশিয়াতেই মানবতা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, ধর্মের বড় বড় মানুষেরা এশিয়াতেই জন্মলাভ করেছেন। সেদিন আমি যখন ৮৫ তে লন্ডনে যাই, তখন আমার এই বিষয়টি মনে পড়েছে– ইউরোপে সব বড় বড় যুদ্ধের আয়োজন হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধ ইউরোপেই হয়েছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ইউরোপেই হয়েছে এবং তৃতীয় মহাযুদ্ধ ইউরোপ থেকেই হবে হয়তো। সেজন্যই আমি মনে করি যে, মানবতার সত্যিকারের কাজ এশিয়াতেই হয়েছে। হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশিয়াতেই এসেছিলেন। যদিও আদর্শের জন্য কোনো আঞ্চলিকতার প্রশ্ন অবান্তর কিন্তু আমরা আঞ্চলিকতাকে যদি আঞ্চলিক দৃষ্টিতে বিবেচনা করি তাহলে বর্তমান সময়ে আমরা দেখবো যে এশিয়াতেই মূলত মানবতার জন্য বিপুল পরিমাণে কাজ হচ্ছে এবং এ কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ইউরোপ যতোই মানবতাবাদের কথা বলুক না কেনো আমরা তাদের দিকে লক্ষ্য করলে দেখবো যে বাইরে বাইরে তারা খুব মানবতার বুলি আওড়ায়, ভিতরে ভিতরে তারা ঠিকই যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে ভুল করে না। আমেরিকা হচ্ছে ইউরোপের বশংবদ।

আমেরিকাকে ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না আদর্শিক দিক থেকে। আমেরিকার লোকেরা যে আদর্শে বিশ্বাসী ইউরোপের লোকেরাও একই আদর্শের বিশ্বাসী। এখন আমরা আমেরিকাকে দেখতে পারি, এইতো আমাদের দেশের গ্যাস নিয়ে তালবাহানা শুরু করেছে। আমাদের গ্যাস আমরা কি করবো না করবো সেটা আমরা বুঝবো। তুমি যেচে এসে উপদেশ দেওয়ার কে? আমরা যাদের কাছে খুশি আমাদের গ্যাস বিক্রি করবো, যাদের কাছে খুশি গ্যাস বিক্রি করবো না। রেখে দেবো। তুমি কে? এই যে ভিতরে ভিতরে গণ্ডগোল পাকানোর ক্ষেত্রে অগ্রসর সেটা আমরা এখন বুঝতে শুরু করেছি এবং আমেরিকা যে কতো মারাত্মক সেটা বোঝার সুযোগ সামনে আমাদের আছে।

■ **বর্তমানে শামসুর রাহমান এবং আল মাহমুদকে নিয়ে যে টানা-হেঁচড়া এবং কাদা ছোড়াছুড়ি চলছে এ ব্যাপারটাকে আপনি কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছেন?**

– দেখুন এ ব্যাপারে সত্য কথা হলো, কবি একটা ফ্যাকটর অবশ্যই। কিন্তু কবি দাঁড়িয়ে যান তার কবিতার কারণে। কবিতার শক্তি হলো কবিতাই।

www.nagorikpathagar.org

কবির শক্তি কবিতাই। একজন কবি সে যতো সুন্দর দেখতে হোক না কেন এবং যত নাদুস-নুদুস হোক না কেনো, তার কবিতা যদি ভালো না হয় তাহলে তাঁকে কেউ গ্রহণ করবে না। আবার একজন কবি সে যদি... ঐ কি বলে আফ্রিকার কালো লোকদের মতোও হয়; কিন্তু তার কবিতা যদি শক্তিশালী হয় তাহলে সে কবিতাকে মানুষ লুফে নিবে। কালো মানুষদের ভেতর থেকে অনেক বড় বড় কবির জন্ম হয়েছে এবং তারা বিশ্বনন্দিত হয়েছেন। মোটকথা হলো কবিতাই আসল। শামসুর রাহমান এবং আল মাহমুদ নিয়ে যে টানা-হেঁচড়া চলছে সেটা আমার জন্য কোনো মাথাব্যথা নয়। কারণ শামসুর রাহমানের চেয়ে আল মাহমুদ যে বেঁচে যাবেন, টিকে যাবেন এটা আল মাহমুদের চেহারা দেখিয়ে নয় তার কবিতা এবং কবিতার কারণেই আল মাহমুদ টিকে যাবেন। সবাই স্বীকার করে, ঐ বামরাও স্বীকার করে রামরাও স্বীকার করে যে, শামসুর রাহমানের চেয়ে আল মাহমুদ অনেক বড় মাপের কবি। হ্যাঁ একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, শামসুর রাহমানও কবি, শামসুর রাহমানও বড় কবি কিন্তু শামসুর রাহমানের চেয়ে আল মাহমুদ অনেক বড় কবি।

■ **আপনার প্রিয় কবি সম্পর্কে কিছু বলুন।**

– আমি এ ব্যাপারে সত্যি কথাই বলতে চাই। আমার প্রিয় কবি হচ্ছেন হাস্‌সান বিন সাবিত, আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা, কা'ব বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু। এরাই হচ্ছেন আমার প্রিয় কবি। আমি ফররুখ আহমদকে ভালোবাসি, আমি নজরুল ইসলামকে ভালোবাসি, আমি আল মাহমুদকে ভালোবাসি। কিন্তু আমি যাঁদের আদর্শ গ্রহণ করেছি তাঁদের আদর্শইতো নজরুল, ফররুখ, আল মাহমুদরা গ্রহণ করেছেন। আমি মনে করি যে, আমি আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা, কা'ব বিন মালিক এবং হাসসান বিন সাবিতকে আমার প্রিয় কবি হিসেবে গ্রহণ করায় আমার মধ্যে একটা তৃপ্তি আছে এবং আমি এ তৃপ্তি নিয়ে থাকতে চাই।

■ **লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন সম্পর্কে আপনার অভিমত জানতে চাই।**

– হ্যাঁ। এটি একটি চমৎকার প্রশ্ন। আমি লিটল ম্যাগাজিনের পক্ষেই শুধু নই, আমি একটা দেয়াল পত্রিকারও পক্ষে। কারণ একটি দেয়াল পত্রিকাই একটি বড় ধরনের সাহিত্য আন্দোলনের সূচনা করতে পারে। একটি দেয়াল পত্রিকা থেকেই একজন বড় মাপের কবির জন্ম হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের পরিবারে সাহিত্যের চর্চা ছিলো এবং পারিবারিকভাবেই তাদের ঐ দেয়াল পত্রিকা বের করার, সাহিত্য সংকলন বের করার একটি পারিবারিক প্রবণতা ছিল। যার কারণেই রবীন্দ্রনাথের মতো লোক ঠাকুর পরিবার থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তো এটা আমার প্রধান কথা নয়, আমার প্রধান কথা হচ্ছে যে সাহিত্যের

www.nagorikpathagar.org

জন্যে একটা প্রয়াস থাকতে হয় এবং সাহিত্যের প্রয়াস থাকলেই কখনো কখনো এই প্রয়াসের মাধ্যমে বড় বড় মানুষের আবির্ভাব ঘটে। সেজন্যে আমি শুধু লিটল ম্যাগাজিনের পক্ষে নই, আমি দেয়াল পত্রিকারও পক্ষে। ছোট ছোট যে কাজ হয় সাহিত্যের, এই ছোট ছোট কাজের প্রতি আমার অসম্ভব সম্মান এবং ভালোবাসা। কোনো জায়গায় হয়তো তিন/চার জনের একটা কবিতা পাঠের আসর হয়, সেখানে যেতে আনন্দ বোধ করি। কোন জায়গায় হয়তো দেখা গেল যে, ছোট্ট তিন পৃষ্ঠা কি চার পৃষ্ঠার একটা ফোল্ডার না কি বলে? (ফুলকুঁড়ি কেন্দ্রীয় অফিসের বিজ্ঞান ও কৃষি সম্পাদক মিজানুর রহমান স্মরণ করিয়ে দিলেন ফোল্ডার) এই ফোল্ডার বের হয়।

আজকাল তো ফোল্ডার বের করা খুব সহজ। কম্পিউটার পৌঁছে গেছে বাংলাদেশের সর্বত্র। বিশেষ করে শহরগুলোতে এখন যারা দেয়ালিকা বের করতো তাদের জন্য খুব সহজ ফোল্ডার বের করা। এগুলো খুব বড় বড় কাজ। মনে রাখতে হবে, যে দেশের ক্রিকেট টীম অত্যন্ত শক্তিশালী, সে দেশের ক্রিকেটের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, গ্রামে-গঞ্জে যেখানে একটু চত্বর আছে সেখানেই খেলার ধুম পড়ে যায়। বাংলাদেশের গ্রাম গঞ্জে এখন ক্রিকেট ছড়িয়ে গেছে বলেই জাতীয় টীমে আস্তে আস্তে আমরা ভালো প্লেয়ার পাবো।

সেজন্যই লিটল ম্যাগাজিন– এটা হচ্ছে সাহিত্যের সূতিকাগার। এখান থেকে সত্যিকার অর্থে সাহিত্য বেরিয়ে আসে। সে সঙ্গে দেয়ালিকা এবং ছোট ছোট আয়োজনই সাহিত্য আন্দোলনকে শক্তিশালী করে। যে দেশ সাহিত্যের দিক থেকে অগ্রসর সে দেশে ছোট ছোট কাজ সবচেয়ে বেশি হয়। [এ পর্যায়ে এল সি সির সভাপতি কাজী মোহাম্মদ আসাদুল হক এবং সহ সভাপতি এম বাহাউদ্দিন মাহমুদ কবিকে মেঠো পথ-এর একটি কপি প্রদান করেন। কবি বলেন- এই-ইতো চাই, সাহিত্য সংগঠনের কাজ তো এটাই।]

■ **কবি যশ প্রার্থীদের সম্পর্কে আপনার উপদেশ শুনতে চাই।**

– আসলে খ্যাতি অর্জনের লোভ সবারই আছে। রাজনীতিবিদদের কি খ্যাতি অর্জনের লোভ নেই? ব্যবসায়ীদের কি খ্যাতি অর্জনের লোভ নেই? ওয়ায়েজিনদের কি খ্যাতি অর্জনের লোভ নেই? সবারই খ্যাতি অর্জনের লোভ আছে। তো খ্যাতি অর্জনের জন্য যদি কেউ চেষ্টা করে আমি এর মধ্যে একটি কারণে খারাপের কিছু দেখছি না। যে মানুষটা মনে করে যে, আমার লেখা সবাই পড়ুক, তার অবশ্যই খ্যাতি এসে যাবে যেহেতু সে বেশী বেশী এবং ভালো ভালো লেখায় মনোনিবেশ করবে। এ জন্যেই খ্যাতির দিকে বেশি নজর না দিয়ে নজর দেয়া উচিত ভালো লেখালেখির দিকে। ভালো লেখালেখি

www.nagorikpathagar.org

করলেই তো খ্যাতি আসে। সে জন্যই যাদের লেখার মুরোদ নেই তারা যতোই লেখকের অভিনয় করে খ্যাতি অর্জনের চেষ্টা করুক না কেনো সেটা কোনো কাজে আসবে না। সে জন্যই লেখক হিসেবে কবি হিসাবে দুটো দিকে নজর দেয়া উচিত। একটা হলো আমি যেনো সবচেয়ে ভালো লিখি, সেজন্যেই যেনো আমার প্রচেষ্টা থাকে। আর একটা প্রচেষ্টা থাকা উচিত যে, আমার লেখা যেনো সবাই পড়ে। সবার কাছে যেনো আমার লেখা পৌছে যায়। তো একদিকে কবির থাকবে সবচেয়ে ভালো লেখার চেষ্টা আর অন্যদিকে চেষ্টা হচ্ছে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা। অতুইজ্জু মান তাশা অতুজিল্লু মান তাশা– আল্লাহ যাকে খুশি ইজ্জত দেন যাকে খুশি অপমানিত করেন। কোনো লেখক যদি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য লেখে তাহলে তার খ্যাতি এমনিই ছড়িয়ে যায়। তার চেষ্টা করা লাগে না। সত্যিকার অর্থে শক্তিশালী মানুষেরা খ্যাতির পেছনে পাগলপারা হয় না। তারা চেষ্টা করে ভালো লেখার জন্যে। আমার নতুন লেখকদের উদ্দেশ্যে একটিই বক্তব্য সেটা হচ্ছে- তোমরা সবচেয়ে ভালো লেখার চেষ্টা করো। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য লেখো। দেখবে তোমাদের খ্যাতি এমনিই ছড়িয়ে পড়বে।

■ **আমাদেরকে সময় দেয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।**

– আপনাদেরকেও ধন্যবাদ।

www.nagorikpathagar.org

ছড়া ও কবিতার মধ্যে আমি কোনো পার্থক্য করি না

ছড়া পত্রিকা 'নিব'-এর পক্ষ থেকে সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন

– আফসার নিজাম

■ ছড়া রাজনীতিকে কতোটুকু প্রভাবিত করে?

– আমি মনে করি রাজনীতি ছড়াকে প্রভাবিত করে আর ছড়াও রাজনীতিকে প্রভাবিত করে। একজন লেখক ছড়া লিখে যখন জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় তখন সেই ছড়ার ইমেজ জনগণের মাধ্যমে রাজনীতিতে ছড়িয়ে পড়ে রাজনীতিকে প্রভাবিত করে। যেমন– গুডবাই কামরুন চললাম/সামনেই মুক্তির সংগ্রাম

■ ছড়া ও কবিতার মধ্যে পার্থক্য কী?

– ছড়া ও কবিতার মধ্যে আমি কোনো পার্থক্য করি না। কারণ কোনো কোন ছড়া কবিতার বিষয় ধারণ করে কবিতা হয়। আবার কোনো কোনো কবিতা ছড়ার প্যাটার্ন গ্রহণ করে ছড়া হয়ে যায়। অতএব কবিতাই ছড়া, ছড়াই কবিতা।

■ আপনার কালের ছড়ার মূল্যায়ন করুন।

– আমি মনে করি আমার কালে সবচেয়ে ভালো ছড়া লেখা হয়েছে। আমাদের ছড়া বিশ্বাসের কাছে ফিরে এসেছে। তাই আমাদের ছড়া যেমন– নতুনত্ব গ্রহণ করেছে, তার মূল্যায়নও নতুনত্ব দাবি করে।

■ আপনার চোখে আপনার ছড়া...

– আমার ছড়া আমার থেকে পাঠকরা বেশি মূল্যায়ন করতে পারবে। এটা তাদের ওপরই ছেড়ে দিলাম।

www.nagorikpathagar.org

■ **আপনার মতে নব্বই-এর ছড়া, তাদের উদ্দেশ্যে আপনার বক্তব্য**

– নব্বই দশক স্বর্ণগর্ভ দশক। তাদের সবকিছুই প্রচণ্ড শক্তিশালী। ছড়াতেও তারা শক্তিশালী। তাদের উদ্দেশ্যে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি বাণী উচ্চারণ করতে চাই– আল্লাহ তাআলা কোনো কোনো জাতিকে এ কিতাব [কোরআন] দ্বারা উচ্চশির করে দেবেন আর কোনো কোনো জাতিকে এ কিতাব [কোরআন] পরিত্যাগ করার কারণে লাঞ্ছিত করে ছাড়বেন।

■ **নবীন প্রবীণদের মধ্যে কাদের ছড়া ভালো লাগে?**

– আবু সালেহ, রুহুল আমিন খান, সাজজাদ হোসাইন খান, আবদুল হাই শিকদার, মোশাররফ হোসেন খান, আসাদ বিন হাফিজ, আহমদ মতিউর রহমান, লুৎফর রহমান রিটন, গোলাম মোহাম্মদ, লুৎফুল খবীর, নুরুজ্জামান ফিরোজ, জাকির আবু জাফর, আতিক হেলাল, রফিক মুহাম্মদ, আহমদ বাসির, ফয়েজ রেজা, রেদওয়ানুল হক, রকীবুল ইসলাম, জাকারিয়া আজাদ ও তোমার ছড়া আমার ভালো লাগে।

www.nagorikpathagar.org

প্রকৃত সাহিত্যই ইসলামী সাহিত্য

মতিউর রহমান মল্লিক এ দেশের একজন খ্যাতিমান কবি। আশির দশক থেকে নিজস্ব ভাব ও ভাষার সাথে চৈতন্য ও মাধুরী মিশিয়ে শব্দ নিয়ে যে খেলা করে যাচ্ছেন, যে কবিতা সৃষ্টি করে যাচ্ছেন– তাই তাঁকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। কবিতায় তিনি তুলে ধরেন প্রকৃতি, প্রেম, নারী আর ভালোবাসাকে; কবিতার মাধ্যমে আধুনিকতার স্পর্শে নির্মাণ করেছেন এক সুন্দর আকাশ- অনন্য কাব্যভুবন। তার চিন্তার প্রখরতা যেমন গভীর তেমনি ঐতিহ্যিক সচেতনতার মূল অনেক গভীরে প্রোথিত। এই কারণেই তার কবিতা যেমন মর্মস্পর্শী, তেমনি বলিষ্ঠ, দৃঢ়তাপূর্ণ। তার কবিতা সাবলীল অথচ আধুনিক। কবি ছাড়াও মতিউর রহমান মল্লিকের আরো পরিচিতি রয়েছে। তিনি একাধারে গীতিকার, সুরকার এবং প্রাবন্ধিক হিসেবে সমানভাবে খ্যাতিমান। অনুবাদ সাহিত্যেও তার উপস্থিতি ইতোমধ্যে সবার দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম হয়েছে।
সম্প্রতি এক বিকেলে তার কর্মস্থল প্রত্যাশা প্রাঙ্গণে চাঁড়ুলিয়ার পক্ষ থেকে এক দীর্ঘ একান্ত সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। সাক্ষাৎকার নেন

– সরদার ফরিদ আহমদ, রফিক মুহাম্মদ ও ওমর বিশ্বাস।

■ কবিতা কেনো লিখেন?

– খুব কঠিন প্রশ্ন। আবার খুব সহজও। কঠিন এই অর্থে যে এ ধরনের প্রশ্ন আগে কেউ আমাকে করেনি। আর সহজ এই জন্য যে, এটাই তো আমার জীবনের একটি অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কবিতা কেনো লিখি, এর উত্তর আমি আমার নিজের মতো করে দিতে চাই। প্রথমত সাহিত্যের সবগুলো শাখার প্রতিই আমার আকর্ষণ আছে। কিন্তু কেনো যেনো কবিতাতেই আমি খুব তৃপ্তি পাই। একটি কবিতার জন্য আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে পারি। অথচ সাহিত্যের অন্য কোনো শাখায় কাজ করতে গেলে এতো ধৈর্য আমার হয় না। আমার মনে হয়, আমি অস্তিত্বের দিক থেকে কবিতাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয়ত যেহেতু কবিতাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি সে জন্য আমার প্রেমের কথা, যন্ত্রণার কথা, জীবনের কথা, আমার সব কথাই কবিতাকে বলতে ভালো লাগে। যেহেতু কবিতার সাথেই আমি আমার মনের কথা বলি, সে জন্য ভালো লাগার ব্যাপারে সবচেয়ে বড় উত্তর হচ্ছে যার কাছে সব কথা খুলে বলা যায়, তাকে নিয়ে বসবাস করাই সবচেয়ে সুবিধা। কবিতার সঙ্গে আমি বসবাস করি। এ জন্যই কবিতা আমার বেশি ভালো লাগে।

যখন জেনেছি যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম কবিতাকে খুব পছন্দ করতেন। এমনকি কখনো কখনো কেবল কবিতার জন্যই তিনি কোন কোন কবির কাছে চলে যেতেন এবং একেবারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলতেন যে, তুমি কবিতা শোনাও। তোমার কবিতা আমি শুনতে এসেছি- তখন থেকে কবিতার প্রতি আমি গভীর প্রেম, টান অনুভব করি।

■ **আমরা প্রায়ই শুনি এটা নজরুলের ইসলামী কবিতা, এটা ফররুখের ইসলামী কবিতা কিংবা অমুকের ইসলামী কবিতা; তাহলে প্রশ্ন ওঠে বাকিগুলো কি অনৈসলামী কবিতা? ইসলামী কবিতা কোনটা আর অনৈসলামী কবিতাই বা কোনটা?**

– প্রথমত আমাদের মনে রাখতে হবে, কবিতা কবিতাই। এ ধরনের এক প্রশ্নের জবাবে কবি গোলাম মোস্তফা তার এক প্রবন্ধে চমৎকার জবাব দিয়েছেন। প্রকৃত সাহিত্যই আসলে ইসলামী সাহিত্য। সাহিত্যের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কাজ সবই কল্যাণের জন্য। আর ইসলামী আদর্শ তো কল্যাণের জন্যই।

আসলে হয়েছে কি, সাহিত্যের নামে এতো বিপুল পরিমাণে অসৎ সাহিত্যের কাজ হয়েছে- এতো বেশি অপবিত্রতা আনা হয়েছে যে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা পবিত্রতার পরিবেশ তৈরির জন্য আমাদেরকে আলাদাভাবে ইসলামী সাহিত্যের কথা বলতে হচ্ছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়গুলো আসছে এগুলো যদি না থাকতো তাহলে আমাদেরকে আলাদাভাবে ইসলামী সাহিত্যের কথা বলতে হতো না।

মিশরের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ কুতুব শহীদের বিখ্যাত তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন-এ কবিদের সম্পর্কে ইতিবাচক চমৎকার ব্যাখ্যা আছে। সেখানে কবিতা বলতে গোটা সাহিত্যকেই বুঝানো হয়েছে।

ফ্রান্সেও কিন্তু এখনো সাহিত্যিক মানেই কবি। তিনি সাহিত্যের যে শাখাতেই কাজ করুন না কেনো তিনি কবি হিসেবেই পরিচিতি পান। জনগণ তাঁকে কবি হিসেবেই জানে। ফ্রান্সে কবি অত্যন্ত সম্মানজনক উপাধি।

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে সাহিত্য সম্পর্কে যখনই কিছু বলা হয়েছে তখনই মূলত কবিতাকেই সামনে আনা হয়েছে। রাসূলের যুগে

www.nagorikpathagar.org

সকল সাহিত্য সংস্কৃতি মানেই কবিতা। একজন ভালো বক্তাকেও তখন কবি বলা হতো।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, কোরআনে যেখানে কবিদের সম্পর্কে বলা হয়েছে- বুঝতে হবে যে, সেখানে সাহিত্যের সব শাখা সম্পর্কেই বলা হয়েছে। তাফসীর ফী যিলালিল কোরআনে সাইয়েদ কুতুব শহীদ যে কথা বলেছেন তার মূল বক্তব্য হলো- ইসলামী সাহিত্য মানে এই নয় যে, তার বিষয়বস্তু ধর্মীয় হতে হবে। কল্যাণের জন্য, সুন্দরের জন্য, সত্যের জন্য সাহিত্যে যা কিছু বলা হচ্ছে তাই ইসলামী বিষয়বস্তু এবং সেটাই ইসলামী সাহিত্য।

■ **আপনি ইসলামী সাহিত্য এবং অনৈসলামী সাহিত্যের পার্থক্যটা চমৎকার করে বললেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যাটা আমাদের সাহিত্যের অঙ্গনে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়নি। ফলে অনেকের মধ্যেই এই নিয়ে বিভ্রান্তি আছে।**

– আসলে এটা সত্য। এর কারণ হলো, আমাদের দেশে পূর্ণাঙ্গ ইসলামের চর্চা তেমন একটা হয়নি। যিনি ইসলামী রাজনীতির চর্চা করেন, দেখা যায় যে, তিনি ইসলামের রাজনীতিটাকেই ভালো করে রপ্ত করেছেন। আবার যিনি ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে জানেন তিনি কেবল সেটাই বিশদভাবে জানার চেষ্টা করেন। দুঃখজনক হলো ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতির উপর আলাদাভাবে কাজ করার মতো যোগ্য এবং অনুসরণীয় কোনো ব্যক্তিত্ব আমাদের সমাজে আসেনি।

■ **তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন ইসলামী ও অনৈসলামীক সাহিত্যের পার্থক্যটা জানতে হলে টোটাল ইসলামকে বুঝতে হবে।**

– হ্যাঁ, তাই।

■ **বিচ্ছিন্নভাবে হলে হবে না?**

– মোটেও নয়। অন্তত গোটা ইসলাম সম্পর্কেই একটা ক্লিয়ার কনসেপ্ট থাকতে হবে। ইসলাম একটা বিশাল ও ব্যাপক বিষয়। এটা এমন যে, এটা কোথাও গিয়ে থেমে যায় না, রুদ্ধ হয় না। যেমন- জ্ঞান বিজ্ঞানের পথ কখনো রুদ্ধ হয়নি। সময়ের সাথে সাথে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রও প্রসারিত হচ্ছে। ইসলাম হলো বিজ্ঞানভিত্তিক জীবনাদর্শ। কাজেই ইসলামের প্রতিটি শাখা উপশাখাই অনন্তকাল ধরে নতুন নতুন প্রশ্নের উত্তর দেবে।

আগেকার ইসলামী চিন্তাবিদরা কবিতাকে দারুণ গুরুত্ব দিতেন। একবার ইমাম তাইমিয়া এক নাস্তিক কবির আল্লাহ'র বিপক্ষে একটি কবিতার জবাবে আল্লাহ'র পক্ষে একশটি কবিতা শুনিয়েছিলেন। তখনকার দিনের ইসলামী

www.nagorikpathagar.org

চিন্তাবিদদের এই ছিলো অভ্যাস। তারা ইসলামের পরিপূর্ণ পরিধিকে স্পর্শ করার চেষ্টা করেছেন। এ ব্যাপারে নির্দেশও আছে। কোরআনে বলা হয়েছে– তুমি কি আমার কিতাবের একটা অংশকে মানবে, আর একটা অংশকে বর্জন করবে? এই যে কনসেপশন– এটাই আসল। ইসলামকে ভালোবাসতে হলে তার সবকিছুকেই ভালোবাসতে হবে। তার সবদিকই স্পর্শ করতে হবে। অবাক হতে হয় যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের প্রয়োজনীয় কোনো বিষয়কেই বাদ দেননি এবং বলে যাননি এমন কোনো বিষয়ও নেই।

■ **আমাদের দেশের অনেক ইসলামী চিন্তাবিদ, রাজনীতিবিদ সাহিত্যকে রীতি মতো উপেক্ষা করেন। তাদের কেউ কেউ সাহিত্য চর্চাটাকে পাগল টাইপের লোকের কাজ বলে মনে করেন। এই ধরনের উদ্ভট, অজ্ঞতাপূর্ণ, হেঁয়ালী চিন্তা-ভাবনা তাদের মাথায় আসে কী করে? এর পরিণতিই বা কী হতে পারে?**

– আমাদের দেশে ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশদ ব্যাখ্যা হয়েছে। কিন্তু আফসোস সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা এসব নিয়ে আমাদের এখানে আলাদা ভাবে একটা পরিপূর্ণ চিন্তা দেওয়ার মতো কাজ হয়নি। আপনি ইসলামী অর্থনীতির ওপর বই পাবেন, কিন্তু ইসলামী সাহিত্যের ওপর যদি একটা পূর্ণাঙ্গ বই চান, পাবেন না।

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বলি। সাহিত্যের ওপর সাইয়েদ কুতুব ও মোহাম্মদ কুতুবের লেখা চমৎকার একটি বই আছে। গত ১০ বছর ধরে আমি বইটি অনুবাদ করানোর চেষ্টা করে আসছি। যারা ভালো আরবি জানেন তাদের কাছে আমি ধর্ণা দিয়েছি। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের শিক্ষকদের কাছেও গিয়েছি। তারা তাদের ব্যস্ততার কথা বলে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আপনারা হয়তো জানেন কিংবা শুনেছেন, সাইয়েদ কুতুব ও মোহাম্মদ কুতুবের আরবি অত্যন্ত উচ্চমানের। এর অনুবাদ করাটা ততো সহজ নয়। যে কেউ ইচ্ছে করলেই ভালো অনুবাদ করতে পারবে না।

দেশের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ইসলামী রাজনীতি, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী সমাজনীতির ওপর নানান বই প্রকাশ করেছে। তাদের কেউই ইসলামী সাহিত্যের ওপর কোনো বই বের করেনি। সত্যি কথা বলতে কি, এ পর্যন্ত আবদুল মান্নান তালিব বা দু'একজন সচেতন ব্যক্তি ছাড়া কেউই এ ব্যাপারে কিছুই করেনি।

এ ব্যাপারে আলেম সমাজের একটা দায়িত্ব ছিল। কিন্তু সম্ভবত সমাজের নানান অসঙ্গতির দিকে বেশি করে তাকাতে গিয়ে এই দিকে তারা আর সেভাবে দৃষ্টি দিতে পারেনি।

www.nagorikpathagar.org

■ এবার কবিতার দিকে আসি। একজন কবি হিসেবে বাংলাদেশের বর্তমান কবিতাকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

– আমি আমার নিজের অনুভূতির কথাই বলতে চাই। আমি যেমন বাংলা কবিতার পাঠক– তেমনি আমার সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যভাষার কবিতারও পাঠক। বিশ্বসাহিত্যের প্রতি আমার একটা অন্য ধরনের আলাদা আকর্ষণ আছে। সে জন্যই আমি বিভিন্ন দেশের কবিতা–যেগুলো বাংলায় অনুবাদ হয়– আমি পাঠ করার চেষ্টা করি। অবশ্য আমাদের দেশে ভালো অনুবাদের পরিমাণটা কম। বিশেষ করে কবিতার অনুবাদ বেশ দুর্বল। সৈয়দ আলী আহসান, আল মাহমুদের মতো অনুবাদ ক'জনের হাতে আসে? আমি আসলে কবিতার একজন প্রশংসনীয় পাঠক। আমার একটা আদর্শ আছে, তবে কবিতা পাঠের ক্ষেত্রে আমি সব ধরনের কবিতাই পড়ি। আমাদের দেশের সব কবিদের কবিতাই আগ্রহ সহকারে পড়ি। আমার মনে হয়েছে, বিশ্বের যেসব ভাষার কবিতাকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে তার থেকে বাংলা কবিতা মোটেই পিছিয়ে নেই। বরং বিশ্বকবিতার সমকক্ষ বাংলাভাষার কবিতা। আর আমাদের সৌভাগ্য যে, বাংলাভাষায় আমরা বড় বড় অনেক কবি পেয়েছি।

■ প্রশ্নটা কিন্তু বাংলাভাষার কবিতা নয়, বাংলাদেশের কবিতা সম্পর্কে ছিল–

– ঠিকই আছে। বাংলাদেশের কবিতাচর্চা তুলনামূলক এখন ব্যাপক হচ্ছে। একসময় কবিতাচর্চাটা ঢাকা এবং দেশের দু'একটি প্রধান শহরে সীমাবদ্ধ ছিলো। আমি লোকটা একজন পরিব্রাজক। দেশের প্রায় সকল অঞ্চলে আমার যাবার সৌভাগ্য হয়েছে এবং আমি যেহেতু সাহিত্য প্রেমিক লোক সে জন্য যেখানেই গিয়েছি সেখানেই স্থানীয় কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের সাথে মেশার, কথা বলার চেষ্টা করেছি। আমি দেখেছি সেখানে অনেকেই চমৎকার কবিতা লিখছে। এরা যদি ঢাকাতে থাকতো তাহলে তাদের পরিচিতি ঢাকার অনেক কবিকেই ছাড়িয়ে যেতো। আমি বলবো, অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় বাংলাদেশে কাব্যচর্চা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক এবং এটা অনেক বেশি হচ্ছে। আর এসব কবিতা মানগত দিক থেকে উৎরে যাচ্ছে।

শুধু ঢাকা নয়, দেশের বিভিন্ন শহরগুলো থেকে বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকা- যাকে আমরা লিটল ম্যাগ বলি– বের হচ্ছে। সেখানে কিন্তু কবিতাকেই বেশি প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। আমি বলতে চাই, বাংলাদেশের ভাগ্য একদিন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছবে যে, ঢাকাকে বর্জন করে আন্তর্জাতিক কোনো সাহিত্য সম্মেলন বা আন্তর্জাতিক সাহিত্য উদ্যোগ হবে না।

www.nagorikpathagar.org

■ আপনি বললেন বাংলাদেশে কবিতাচর্চা অনেক বেশি হচ্ছে এবং কবিতার মানও বেড়েছে। কিন্তু কিছুদিন আগে ভারতের কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, বাংলাদেশে কবিতা বর্তমানে স্লোগানধর্মী।

– প্রথমত, আমাদের দেশের কবিতা নিয়ে কে কি বললো আমি তা মোটেই পাত্তা দিতে চাই না। কারণ আমাদের দেশের কবিতা সম্পর্কে তিনিই মন্তব্য করতে পারেন যিনি আমাদের দেশের সব কবিতার খোঁজ রাখেন। বাইরের একজনের পক্ষে আমাদের দেশের সব কবিতার খোঁজ রাখা সম্ভব নয়। আর সবকিছুর খবর না রেখে যিনিই মন্তব্য করুন না কেনো- সেটা কোনো গ্রহণযোগ্য মন্তব্য হবে না। সুনীল বড়জোর শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, সৈয়দ শামসুল হক- এরকম বাছাই করা কবির কবিতা পড়েছেন। আর বাংলাদেশের বাকি বিশাল কাব্যজগত যেখানে পড়ে আছে- তার খোঁজ তিনি কতোটুকু রাখেন? কাজেই তার মন্তব্য আমি গ্রাহ্য করতে চাই না।

দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গ থেকে যারা আসেন তাদের প্রায় সবাই ব্রাহ্মণ। আর ব্রাহ্মণদের স্বভাবই হলো নিজেদেরকে বড় করে দেখানো এবং অন্যদের ছোট করে দেখা। সুনীলের মন্তব্য আসলে ব্রাহ্মণসুলভ মন্তব্য। এ ধরনের মন্তব্যের বিরুদ্ধে আমাদের সোচ্চার হওয়া উচিত এবং সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা উচিত।

■ আপনি কিন্তু কবিতা কম লেখেন। কারণটা কী?

– হোরেস বলেছেন The poet's fame and fortune sure to gain, If long their beards, incurable their brain. কথাটা ভারি মজার। সহজ করে বলতে গেলে সেই কবিই খ্যাতি অর্জন করবেন, নামকরা হবেন, যে কবির বয়স বেড়ে বেড়ে দাড়ি বড় হয়ে গেছে এবং যে কবির মেধা চিকিৎসাহীন রয়ে গেছে। হোরেসের এই কথা আমার দারুণ লাগে। এখানে হোরেস ওই কবির কথা বলতে চেয়েছেন, যে কবি কবিতা থেকে তার মনোজগতকে সরিয়ে নেয়নি। আমার সবচেয়ে বড় আনন্দ হলো, আমি কখনো কবিতা থেকে সরে যাইনি।

আমি সত্যি সত্যিই বিস্মিত হই, সৈয়দ আলী আহসানের দিকে তাকালে, আল মাহমুদের দিকে তাকালে। অর্থাৎ বড় বড় কবির দিকে তাকালে। তারা মনে হয় দশ হাত দিয়ে লেখেন। আমার নিজেকে ওই বড় কবিদের মতো মনে হয় না। এ কারণেই আমি কম লিখি। আসলে আমি বরাবরই কম লিখি। আপনারা শুনলে হয়তো হাসবেন, আমার কাছে মাঝে মাঝে মনে হয় যে, বিশ বছর বয়সে একটা লোক সাধারণত যা বোঝে আমার সেটা বুঝতে ত্রিশ বছর লেগে যায়। আমি সম্ভবত একটু পিছানো প্রকৃতির। আমার আরেকটা

www.nagorikpathagar.org

সমস্যা আছে, আমার লেখা কবিতা ব্যাপকভাবে ছাপা হয় না। এর পেছনে মূল কারণ, আমি একটু লাজুক প্রকৃতির লোক। সব জায়গায় গিয়ে আমি কবিতা দিতে পারি না। আর আমার পরিচিত মহল তেমন বড় নয়।

- **ব্যক্তি মল্লিক সম্পর্কে আপনি যা বললেন, তা কিন্তু মানতে পারছি না। আপনার খোঁজ কিন্তু সব মহলেই রাখে। যে সময়টায় আপনারা সাহিত্য শুরু করেছিলেন- সেই সময়টা, ওই সময় তো বটেই এখনও নানা কারণে আপনি আলোচিত।**

– আপনার কথা শুনে ভালো লাগছে। এ প্রসঙ্গে আমি আর একটি কথা বলতে চাই- একজন কবিকে যখন বলা হয় কেন কম লেখেন, তখন সেটা কবির জন্য নিঃসন্দেহে একটি আনন্দের ব্যাপার। আমি মোটামুটি লিখে যাচ্ছি। পরিমাণ বাড়ালে হয়তো ভালো হতো। বিশেষ করে আমার কবিতা যারা পড়েন তারা আমার কাছে আরো বেশি দাবি করেন। আমি তাদের দাবি পূরণের চেষ্টা করি।

- **সাক্ষাৎকারের শুরুতে আপনি বলছেন আপনি কবিতা লিখে তৃপ্তি পান। এই তৃপ্তিটা কী রকম?**

– সৃষ্টি সুখের উল্লাসে- এই যে নজরুলের কবিতা, মানে একটা কবিতা যখন হয়ে যায় তখন মনে হয় সমস্ত অস্তিত্ব হেসে উঠছে। এই জন্য আমি কবিতার সঙ্গে নারীর উপমা দিতে খুব পছন্দ করি। সম্প্রতি আমার যে কবিতার বইটি বেরিয়েছে তার ছয়টি লাইন আমি এখানে উল্লেখ করছি-

> যে হাসি দেয় না নারী তাই তুমি দাও
> যে গান গায় না নারী তাই তুমি গাও
> অথবা নারীর মতো তুমি হাসো বলে
> অথবা নারীর মতো গান গাও বলে
> কবিতা তোমার কাছে পড়ে রইলাম
> জীবনের সব জ্বালা পোড়া সইলাম।

আসলে আমি কবিতাকে এবং প্রিয়তমাকে আলাদা করতে পারি না। সত্যি বলতে কি আমি আমার যে কথাটা প্রিয়তমাকে বলতে পারি না- তা আমার কবিতাকে অবলীলায় বলতে পারি।

- **আপনি কবিতাকে ঘনিষ্ঠতর প্রিয়তমা বলেছেন। সাবিনা মল্লিক আপনার কবিতাকে তাহলে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন না তো?**

– একটা সুবিধা হচ্ছে কি, সাবিনা নিজেই তো সাহিত্যের জগতের লোক। ভালো গল্প লেখে। সাহিত্যের সব শাখায় ওর একটা আকর্ষণ আছে। এক

www.nagorikpathagar.org

সময় কবিতা লিখতো। আমি আল্লাহর অসীম শুকরিয়া আদায় করি যে, একজন সাহিত্যমনা স্ত্রী আমার সৌভাগ্য হয়েছে।

■ **এই সুযোগে কিন্তু আপনি ভাবীর গুণগানও গেয়ে ফেললেন।**

– না না। সত্যি যা, তাই বলেছি। সাবিনার কারণে আমার পরিবারে সবসময়ই সাহিত্যের অনুকূল একটা পরিবেশ বিরাজ করে। আমার যখন প্রথম বইটা বের হয়, তখন সেই বইয়ের একটার পর একটা কবিতা আমি পড়ে গেছি, সাবিনা ধৈর্য ধরে শুনে গেছে। মানুষ যেখানে কবিতা শুনতেই চায় না- সেখানে ও যে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে তা ভাবলে অবাক হতে হয়। নতুন কোনো লেখা লিখলে আমি সাবিনাকে শুনাই। সাবিনাকে শুনাই এই কারণে যে, ও কঠোর সমালোচক। সাহিত্যের শিল্পের দিকটা ও ছাড় দিতে মোটেই রাজি নয়। কোনো জায়গায় খারাপ লাগলে ও কিন্তু বলে দেয় যে ওই জায়গা ভালো লাগেনি। এ কারণে আমি ওকে আগ্রহভরে আমার লেখা শোনাই। সাবিনা গল্প লিখলেও আমাকে শোনায়। ছড়াটড়া লিখলে আমি আমার ছেলেমেয়েদের শোনাই। ওরাও কঠিন সমালোচক।

■ **ভাবীর লেখার কঠিন সমালোচনা কি আপনি করতে পারেন?**

– না, ভাই। আমি আসলে যথার্থ সমালোচক নই। আমাদের এই সমাজে যেখানে লেখালেখির কোনো মূল্যায়ন নেই। কবি, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিকদের যেখানে কোনো মর্যাদা নেই, সেখানে কেউ কিছু লিখলে আমার আর সমালোচনা করতে ইচ্ছে করে না। আমি মনে করি, আমার কঠোর সমালোচনার কারণে কারো লেখার ক্ষতি হতে পারে, সে উৎসাহ হারাতে পারে। এটা আমি চাই না।

■ **এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি, ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে কোনো কোনো তরুণ লেখক সরাসরি অমুক কবি, অমুক কবি না এমন একটা রায় দিয়ে দেয়। আপনারা কিন্তু সেটা করেন না। এমনকি আবদুল মান্নান সৈয়দের মতো প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য সমালোচকও। আরো মজার ব্যাপার এসব তরুণদের অনেকেরই এখনও একটি বই পর্যন্ত বেরোয়নি। এই প্রবণতাটা কেনো হয়েছে, আর এর পরিণতিটাই বা কী?**

– একটি চমৎকার প্রশ্ন করেছেন। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়ছে। এক হাতুড়ে ডাক্তার রোগীদের নির্দ্বিধায় অপারেশন করতো। সেই এলাকায় এলেন একজন উচ্চশিক্ষিত ডাক্তার। তিনি দেখলেন তার কাছে কোনো রোগী আসছে না, সব যাচ্ছে ওই হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে। তিনি খোঁজ নিয়ে জানলেন, ওই ডাক্তার আসলে অপারেশনের কোনো কিছুই জানে না। না জেনেই অপারেশন চালিয়ে যাচ্ছে। উচ্চশিক্ষিত ডাক্তার ভাবলেন, হাতুড়ে

www.nagorikpathagar.org

ডাক্তারকে অপারেশনের নিয়ম কানুন শেখালে কেমন হয়। তিনি যা ভাবলেন, তাই শুরু করলেন অর্থাৎ ওই হাতুড়ে ডাক্তারকে ট্রেনিং দেওয়া শুরু করলেন। হাতুড়ে ডাক্তার অনেক কিছু শিখলো। কিন্তু পরে দেখা গেল ওই হাতুড়ে ডাক্তার আর অপারেশন করতে পারছে না। কারণ সে অপারেশনের নিয়ম জেনেছে এবং এ কারণে নির্দ্বিধায় অপারেশন করতে ভয় পাচ্ছে।

এই যে যারা চূড়ান্ত মতামত দেয় তাদের জন্য আমার দুঃখ হয়। আমার মনে হয় তাদের এই ধরনের মতামত দেয়ার পেছনে প্রথম কারণ হলো এরা সাহিত্যের বিশাল জগৎ সম্পর্কে অজ্ঞ। এদের পড়াশোনা কম। দু'একটি ভালো বই হয়তো এরা পড়েছে। সেখান থেকে একটা ধারণা নিয়ে বসে আছে। কিন্তু এই ধারণা যে যথেষ্ট নয়- এটা বোঝার মতো, উপলব্ধি করার মতো তাদের কোনো বোধ নেই। বরং উল্টো তারা ভেবে বসে আছে, তারা সাহিত্যের সব জেনে গেছে। মূর্খ হলে যা হয় আর কি।

আরো একটি কথা, এরা কোনো সাহিত্যিকের সাহিত্যিক মূল্যায়ন করে না। এরা ব্যক্তিকে মূল্যায়ন করে মন্তব্য করে। আসলে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কোন সাহিত্যিকের সাহিত্য ছাড়া যদি ব্যক্তির দিকে নজর যায়, তাহলে সেটাকে আর সঠিক মন্তব্য বলে ধরে নেয়া যায় না। আমার মনে হয়, যারা এই ধরনের কঠিন মন্তব্য করে তারা শুধু তার কবিতা বা সাহিত্যকে সামনে রেখে সমালোচনা করে না- করে ওই ব্যক্তির কোন আচরণকে সামনে রেখে। ধরুন, আমি রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিয়ে আলোচনা করবো। আমি যদি এক্ষেত্রে রাজনৈতিক রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করতে যাই তাহলে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে সমালোচনা করা হবে- সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথকে নয়।

■ **রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিকদের মতো সাহিত্যিকরা আজ দুভাগে ভাগ হয়ে গেছেন। এখন আর একজন লেখককে তার সাহিত্যকর্ম নিয়ে বিচার করা হয় না। তিনি কোন গোষ্ঠীর লোক সেটাই প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা কিন্তু দু'পক্ষই করছে। এই যে মেরুকরণ থেকে একেবারে পৃথকীকরণ এটাকে আপনি কিভাবে দেখেন?**

– এই ধরনের বিভাজন খুবই ক্ষতিকর। আসলে আমরা যখন আমাদের পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় এবং বৈশ্বিক দায়িত্ব ভুলে যাই তখন এই ধরনের বিভাজন টানি। এটা হয় শিক্ষার অভাবে- প্রকৃত শিক্ষার অভাবে। এই প্রসঙ্গে নবাব সলিমুল্লাহর একটি কথা মনে পড়ে। তিনি এক সময় বলেছিলেন, আমাদের দেশের উন্নতি হবে সেদিনই- যেদিন আমাদের রাজনীতি পরিচালনা করবে শিক্ষা। তিনি চেয়েছিলেন, আমাদের দেশের রাজনীতির মূল টার্গেট হোক শিক্ষা। আমাদের দেশের নানা আদর্শ বা মতাদর্শ ভিত্তিক রাজনীতি হচ্ছে।

www.nagorikpathagar.org

এসব রাজনীতির টার্গেট যদি একটাই হতো- আমরা সমস্ত মানুষকে শিক্ষিত করবো, আমরা মানুষকে সত্যিকারের মানুষ বানাবো, মানুষকে ভালোবাসবো তাহলে এই ধরনের বিভাজন বলুন, মেরুকরণ বলুন বা পৃথকীকরণ বলুন, কোনোটারই প্রশ্ন উঠতো না।

সব মানুষের প্রতি আমাদের একটা দায়িত্ব আছে। মানবজাতির একটি শক্তিমান সদস্য হিসেবে বিশ্বের প্রতিটি মানুষের প্রতি আমার দরদ রয়েছে। আমাদের সমাজ থেকে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রকৃত শিক্ষা চলে গেছে। একই সাথে রাজনীতির শিক্ষাও। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাই। যে ফররুখ আহমদকে মৌলবাদী বলে গাল দেয়া হচ্ছে এবং তার কবিতাকে পাঠ্যপুস্তক থেকে বাদ দেয়া হচ্ছে সেই ফররুখ আহমদের সঙ্গে তখনকার সাহিত্যিকদের সম্পর্কটা কেমন ছিল? দেখা গেল ফররুখ আহমদ সমকাল অফিসে সিকান্দার আবু জাফরের সাথে আড্ডা দিচ্ছেন। হয়তো রেডিও স্টেশনে সিরাজুল ইসলাম সামনে পেয়েছেন- ধরে বসিয়ে চা খাওয়াচ্ছেন। সিরাজুল ইসলামও সেখানে চা খাচ্ছেন, আড্ডা মারছেন, গল্প করছেন।

আমার কি মনে হয় জানেন, টোটাল মানবতার চর্চাটা সম্ভবত ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। এর পেছনে দুটো কারণ, এখন প্রকৃত শিক্ষার চর্চা হচ্ছে না এবং প্রকৃত আদর্শের চর্চা হচ্ছে না। ইসলামের যথার্থ চর্চা হচ্ছে না। হ্যাঁ এ কথা ঠিক ইসলামের যতোটুকু চর্চা হচ্ছে তার ফলও আমরা পাচ্ছি। আমি যেহেতু ইসলামকে ভালোবাসি সেজন্য আমি আমার দেশকে ভালোবাসি। আমার দেশের মানুষকে ভালোবাসি। একই সাথে আমি গোটা পৃথিবীর মানুষকে ভালোবাসি। একটি মানুষ হয়তো ভিয়েতনামে নিহত হচ্ছে, আমার বুকের মধ্যে চিৎকার জমা হচ্ছে। আফগানিস্তানে একজন মানুষের নিহত হওয়ার খবর শুনে আমার অন্তর কেঁদে উঠেছে। কে নিহত হলো সেটা বড় কথা, তিনি কোন দলের সেটা বড় কথা নয়। কোনো লোক নিহত হবার খবর শুনলেই আমার রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সেই হাদীসটা মনে পড়ে যায় একটা মানুষকে মারা মানে গোটা মানবতাকে মেরে ফেলা। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, সেই মানুষটির জন্য জাহান্নামে যাওয়া অনিবার্য, যে মানুষটি কোনো হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে একটি ইঙ্গিতও করেছে।

■ **আপনি দেশের বিকল্প ধারার একজন প্রধান গীতিকার। অনেক স্মরণীয় হৃদয়স্পর্শী গান আপনি লিখেছেন। আদর্শের সঙ্গে আধুনিক গানের সংযোগ ঘটিয়েছেন। এসব অসাধারণ গানের সাথে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে না। বাদ্যযন্ত্র থাকা বা না থাকাকে আপনি কিভাবে দেখেন?**

www.nagorikpathagar.org

– এই ধরনের প্রশ্নে আমি খানিকটা বিব্রতবোধ করি। আমার জীবনযাপনের একটা নিয়ম আছে। নিয়মটা আসলে আমার নয়- ওটা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে নেয়া। যখন দুটো মত থাকে তখন সহজটাকে আমি গ্রহণ করি। ব্যাখ্যা করলে এ রকম দাঁড়ায়: যখন কোনো একটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত বা মতামত গ্রহণের দরকার হতো তখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহজটাকেই গ্রহণ করতেন।

আমি যখন দেখি, কোন একটি বিষয়ে দুটো মত আছে এবং দুটো মতের পেছনেই কোরআন হাদীসের যুক্তি আছে অথবা যুক্তি আছে ইজমা-কিয়াসের, এসব ক্ষেত্রে আমি যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করি। যেমন- মেয়েদের পর্দার ব্যাপারে কেউ বলেন, বোরকা তো পরতেই হবে- সেই সাথে মুখও ঢাকতে হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, মুখ ঢাকার দরকার নেই। ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলাইহে ফতোয়া দিয়েছেন যে, মুখ না ঢাকলেও চলে। কিন্তু মালেকি, হাম্বলী মাজহাবে মুখ ঢাকার পক্ষে যৌক্তিক করা হয়েছে। এই অবস্থায় আমি কি করবো? এইখানে আমি যে চিন্তাটা করি তা হলো বর্তমানে মেয়েরা যে পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে তাতে তারা সম্মানই রক্ষা করতে পারছে না। সেখানে কেউ যদি মুখ না ঢেকে বোরকা পরে চলে, তবুও আমার ভালো লাগে যে, মুখ ঢাকেনি, কিন্তু বোরকা তো পরেছে। এমনকি কেউ বোরকা পরেনি, ওড়না পরেছে তাতেও আমার ভালো লাগে এই ভেবে যে, আমাদেরই এক বোন অন্তত ওড়না পরেছে। আজ যেখানে আকাশ মিডিয়া পুরো সমাজকে উলঙ্গ করার চেষ্টা করছে সেখানে তো পর্দা রক্ষা করাটাই কঠিন। আর আমার ধারণা আজ যিনি ওড়না পরেছেন, তিনি একদিন বোরকাও পরবেন।

■ **আমাদের প্রশ্নের উত্তর সরাসরি দেয়ার উপায় কি নেই?**

– আছে। কিন্তু একটা কথা আছে। উপদেশের চেয়ে উদাহরণ শক্তিশালী। সেই কারণে উদাহরণ দিচ্ছি। তো যে বোরকা পরছে, মুখ ঢাকছে না। আমার কাছে যেটা মনে হয়, সে তো বোরকাই পরেছে, মুখ ঢাকবে কি ঢাকবে না সেটা তার ওপরই ছেড়ে দেই। সে যদি প্রয়োজন বোধ করে মুখ ঢাকার, তো ঢাকবে।

■ **তার মানে গানের ক্ষেত্রে বাদ্য থাকতেও পারে নাও পারে?**

– দু'টোরই মত আছে।

■ **আচ্ছা, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে মেয়েরা মুখ ঢাকতো কি? আর ওই সময় গানে বাজনা বাজানো হতো কি না? যদি বাজাতো তাহলে এখন সমস্যাটা কোথায়?**

– আমি এখানে যে বিষয়টা পরিষ্কার করে বলতে চাই তাহলো গানের ক্ষেত্রে

www.nagorikpathagar.org

আসল কোনটা? আসলটা মিউজিক? আমি কি বাজনা শুনতে চাচ্ছি নাকি গান শুনতে চাচ্ছি? মূলটা কী?

■ **গান কিন্তু তিনটা মিলিয়ে।**

– গান যখন বাজনা সহযোগে পরিবেশন করা হয় তখন সেটা হয়ে যায় সঙ্গীত। সঙ্গীত এবং গানে পার্থক্য আছে। যেখানে বাজনা ব্যবহার করা হচ্ছে সেটাই সঙ্গীত। আর যেখানে বাজনা নেই সেটাই গান। বাজনার ব্যাপারে দুটো মত আছে। মাওলানা আকরম খাঁ'র মতো আমাদের দেশের বেশ কয়েকজন বড় স্কলার বাজনাকে জায়েজ বলেছেন। এমনকি সারা দুনিয়ায় গৃহীত আলেম, পাশ্চাত্য ও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত ড. কারদাভীর একটি বক্তব্য আমার ভালো লেগেছে। যদিও আমি সেই বক্তব্যকে আমার চর্চায় আনিনি। তিনি বলেছেন, ইসলামের স্বার্থে, মানবতার স্বার্থে, কল্যাণের স্বার্থে, শান্তির স্বার্থে- সোজা কথায় সুন্দরের স্বার্থে, সততার স্বার্থে বিশেষ করে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের প্রশ্নে যতো রকমের বাজনা আছে তার সবই ব্যবহার করা যায়।

■ **বিকল্প ধারার গানগুলোতে নকল সুরের প্রাধান্য। মৌলিক সুর নেই বললেই চলে। কারণটা কী?**

– মৌলিক সুর দু'ধরনের লোক তৈরি করে। এক, স্বভাবসুলভ সুরকার। আপনারা হয়তো দেখে থাকবেন গ্রাম অঞ্চলে অনেক গায়ক আছেন যারা কোনোদিন সারগাম শেখেনি। কিন্তু তারা নতুন নতুন সুরে গান করছে। এরাই স্বভাব সুরকার। গান আসলেই আল্লাহর একটি বিশেষ দান। প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় যখন গান শুরু করেন তখন তিনি সারগাম করতে পারতেন না, হারমোনিয়াম বাজাতে পারতেন না। দীর্ঘকাল তার গানের সময় অন্যে হারমোনিয়াম বাজাতেন। সত্যিকারভাবে, মৌলিকভাবে সুরের দিক থেকে যারা দক্ষ তারা কিন্তু সুর তৈরি করতে পারেন। আমি আমার অনেক গানের সুর করেছি। এসব গান শুনে বেশ কয়েকজন খ্যাতিমান গানের ওস্তাদ আমাকে বলেছেন, আপনি গানের মূল জিনিসটা জানেন। এ কারণেই আপনি এটা করতে পেরেছেন। আমি মূল বিষয়টা জানি কি জানি না, তা আমি স্বীকার বা অস্বীকার কোনোটাই করি না।

আমার অবশ্য বেশ ক'জন ওস্তাদ ছিলেন- যাদের কাছ থেকে আমি সরাসরি গান শিখেছি। আমি আসলে গানের বাণীটাকেই বড় বলে মনে করি। রবীন্দ্রনাথের গানকে অনেকে গান বলতে রাজি নন, গীতিকবিতা বলতে আগ্রহী। কারণ আপনারা খেয়াল করলে দেখবেন যে, রবীন্দ্রনাথের গানের চেয়ে বাণীই প্রধান। তার গানে বাদ্যযন্ত্রের মাত্রাটা সুরের নিচে থাকে।

www.nagorikpathagar.org

সঙ্গীত ও গীতিকবিতাতে পার্থক্য আছে। আমরা সেই বিতর্কে যাচ্ছি না। আমার কথা হলো পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে বিবেচনা করেই আমাদেরকে অগ্রসর হতে হয়েছে এবং অগ্রসর হচ্ছি। আমি মনে করি যে, আমরা যারা গানের ক্ষেত্রে একটা নতুন ধারা তৈরি করতে চেয়েছিলাম তারা চাই যে, সে ধারাটা থাকুক। সঙ্গীতের একটা বিশাল ক্ষেত্র আছে। সেই ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারার মানুষ কাজ করছে। আমি কোনো ধারাকেই অস্বীকার করি না। কিন্তু আমার ধারাটাকে আমি আরো উজ্জীবিত করতে চাই। রেডিও, টেলিভিশন থেকে অনেক গায়ক আমার সাথে যোগাযোগ করে বলেছেন মল্লিক ভাই, আপনি আমাদের গান দিন, আমরা গাইবো। তবে সেই গানে বাজনা ব্যবহার করবো। আমি তাদের বলেছি, আমি দ্বীনের জন্য, সত্যের জন্য, সুন্দরের জন্য, আদর্শের জন্য গান লিখি এখন আপনারা সেটা কিভাবে ব্যবহার করবেন আমি জানি না। আমি যেটা মনে করি সেটা হচ্ছে, আল্লাহর দ্বীনের কথা, সত্যের কথা, মানবতার কথা বলতে হবে এবং যেখানে যে ক্ষেত্রটি আমার জন্য উপযুক্ত আমি সেটাই সেখানে ব্যবহার করবো।

■ ভাবী (সাবিনা মল্লিক) নাকি আপনার গান শুনেই পাগল হয়েছিলেন?

– বিয়ের আগে আমাদের জানাশোনা ছিলো না। সাবিনার ভাই ছিলো আমার বন্ধু। সাবিনার মতো ওর যে একটা বোন আছে আমি জানতামই না। অবশ্য ওই পরিবারের সবাই আমাকে চিনতো জানতো। আসলে তারা আমার নামের সাথে পরিচিত ছিল। বিয়ের আগে আমি ওদের বাসায় কখনও যাইনি। এরপর যখন আমার জন্য একটা প্রস্তাব গেল তখন ওদের পরিবারের সবাই রাজি হলো। একথা বলতে হবে যে, এই রাজির পেছনে আমার বন্ধুর বিশেষ ভূমিকা ছিল। আপনাদের জানা থাকা ভালো যে, বিয়ের আগে সাবিনার সাথে আমার কোনো ধরনের জানাশোনা ছিল না।

■ নাবিক পত্রিকায় ভাবী আপনাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন, তোমাকে লেগেছে এতো যে ভালো- আপনারও নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে।

– আমি লেখকের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। নাবিক পত্রিকা সাবিনাকে এ ধরনের একটি লেখা লিখতে বলেছিলো। ও লিখেছে। আমি কোনো রকম সাজেশনই দিইনি। এই লেখায় দু'একটি বাক্য এমন আছে আমি জানতাম ওই বাক্যগুলো আমাকে প্রশ্নের মুখোমুখি করবে। যেমন আজকে করা হলো। সাবিনা লেখাটা তৈরি করে সরাসরি নাবিককে দিয়েছে। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন স্ত্রী'র কাছে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। আমার ক্ষেত্রে সেই সাক্ষ্য যদি এখনই শুরু হয়ে যায় তো অসুবিধা কোথায়?

www.nagorikpathagar.org

■ আপনি বলেছেন কবিতা ও প্রিয়তমাকে একইভাবে দেখেন। যদি নাম্বার দিতে বলি কোনটা এক নাম্বারে রাখবেন?

– খুব জটিল প্রশ্ন। আপনারা তো আবার সরাসরি জবাব চান। প্রশ্নও করেন সোজাসাপটা। সত্যি কথা বলছি যে, এই মুহূর্তে আমার পক্ষে দুটোকে বিভাজন করা মুশকিল।

■ আপনার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'অনবরত বৃক্ষের গান' বের হলো। কেমন লাগছে?

– আমার ছেলেমেয়ে জন্মগ্রহণের পর আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করেছি। তাও সীমিতভাবে। আর আমার এই কাব্যগ্রন্থটি বের হবার পর যখনই সুযোগ পাচ্ছি পরিচিত জনদের মিষ্টি খাওয়াচ্ছি।

■ আপনার কাব্যগ্রন্থ 'আবর্তিত তৃণলতা' ১৯৮৭ সালে বের হয়। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ বের হলো ২০০১ সালে। মাঝপথে দীর্ঘ ১৪ বছরের বিরতি। এই দীর্ঘ বিরতির কারণটি কি?

– আমি সবসময় চেয়েছি আমার বই সম্মানজনকভাবে বের হোক। আমার কখনও রয়্যালিটির প্রতি আকর্ষণ নেই। বই লিখে বিপুল অর্থের মালিক হবো- এই চিন্তা কখনোই আমার মাথায় আসেনি। এ প্রসঙ্গে ইয়াকুব আলী চৌধুরীর একটি কথা মনে পড়ছে। তিনি তার একটি প্রবন্ধে বলেছেন যে, তিনি সাহিত্যচর্চাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার চেয়ে সেবা হিসেবে গ্রহণ করার ওপর সবসময় গুরুত্ব দিয়েছেন। আমার কাছে এই বক্তব্য ভালো লেগেছে।

আমি সাহিত্যচর্চাকে মানবতার সেবা, সুন্দরের সেবা হিসেবেই দেখি। আমি চেষ্টা করেছি আমার বইটা যেনো সম্মানজনকভাবে বের হয়। অনেকেই এই চৌদ্দ বছরে বই চেয়েছেন। আমি তাদের নানান কৌশলে ফেরত দিয়েছি। এই নিয়ে আমার স্ত্রীর সাথে একবার বচসা হয়েছে। ও বলেছে, তোমার বই প্রকাশ করতে চাচ্ছে, আর তুমি বই দিচ্ছো না। আমার চিন্তা ছিলো নিজেই বই বের করবো। কিন্তু তার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তা আমি যোগাড় করতে পারিনি। যা হোক বিপরীত উচ্চারণ আমার পিছু লাগলো এবং শেষ পর্যন্ত ওরা রাজি করাতে পেরেছে। এ ব্যাপারে কবি গোলাম মোহাম্মদের একটি ভূমিকা আছে।

■ আপনার প্রথম কাব্যগ্রন্থে (আবর্তিত তৃণলতা) একটা গীতিকবিতার ধাঁচ রয়েছে। স্বাভাবিক ছন্দবদ্ধ বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ (অনবরত বৃক্ষের গান) দেখলাম একটু ভিন্ন মাত্রার, ভিন্ন আঙ্গিকের কবিতা। আর এতে গদ্য কবিতার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

www.nagorikpathagar.org

– কবি মাত্রই তো নতুনত্বের সন্ধানী এবং পরীক্ষার ব্যাপারে উৎসাহী। আমি মনে করি একজন কবি তার শেষ জীবন পর্যন্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যান। প্রথম কাব্যগ্রন্থের কবিতা লেখা হয়েছিলো আমার জীবনের সবচেয়ে রোমান্টিক সময়ে। আর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের কবিতায় আমার অভিজ্ঞতাটা বেশি এসেছে।

■ **আপনার দুটো কাব্যগ্রন্থেই প্রকৃতিকে বিশেষভাবে স্থান দিয়েছেন। এই যে আপনার প্রকৃতি প্রেম এটা কী করে হলো?**

– সব কথা আমি বলতে চাই না। কিছু কথা গোপন রাখতে চাই। এরপরও দু'চারটি কথা বলি। আমি প্রকৃতিকে অসম্ভব রকম ভালোবাসি। প্রকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে জীবনে আমার নানান অভিজ্ঞতা হয়েছে। যখন প্রথম সমুদ্র দেখতে গেলাম তখন আমার মাথা ধরে গেল। আমি আসলে এতো সৌন্দর্য সহ্য করতে পারছিলাম না। একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে সিলেটের জাফলং এ, হরিপুরে। আমি একটি বিষয় লক্ষ্য করেছি যে, প্রচণ্ড আবেগ এবং ভালোবাসা যেখানে কাজ করে সেখানে আমি যেনো কেমন এলোমেলো হয়ে যাই। সুন্দরবনের বিশাল ভুবন দেখে আমার মুখ থেকে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বেরিয়ে আসছিলো। আল্লাহ এতো সুন্দর জিনিস তৈরি করেছেন। প্রকৃতি আমাকে সাংঘাতিকভাবে উদ্বেলিত করে। আমি একটা কথা কাউকে জানাইনি, আজ বলছি, আমার মন যখন খুব খারাপ থাকে, মনের ওপর নানান আঘাত আসতে থাকে, তখন আমি আকাশের দিকে তাকাই।

■ **ওই গানটি তো আপনার- তোমার সৃষ্টি যদি হয় এতো সুন্দর, না জানি তাহলে তুমি কতো সুন্দর।**

– হ্যাঁ। আমি আকাশের দিকে তাকাই। আকাশের দিকে তাকালে আমার ভেতর কী সুন্দর একটা স্বতঃস্ফূর্ততা সৃষ্টি হয় এবং আমি স্বাভাবিক হয়ে যাই।

■ **তারপরও 'অনবরত বৃক্ষের গান'-এ 'একটি হৃদয় অলির মতো, কলির মতো, মেঘনা নদীর পলির মতো...' এই ধরণের কবিতা নেই কেন?**

– এই ধরনের কবিতা সব বইতে থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আর কবিতার ভালো লাগার বিষয়টি অন্য ধরনের। একজন হয়তো একটি কবিতা পছন্দ করছেন, আরেকজন অন্যটি। অনেকে আপনাদের উল্লেখিত কবিতাটা পছন্দ করেছেন। অনেকে আবার আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর লেখা কবিতাটির প্রশংসা করেছেন। মাওলানা সাঈদী'র এই কবিতা দারুণ পছন্দ। তিনি বিভিন্ন মাহফিলে ওই কবিতাটির অংশ বিশেষ বলে থাকেন। তবে কথা হলো- আমার মন কখনোই প্রকৃতি থেকে দূরে থাকে না। গত ২৫ বছর ধরে

www.nagorikpathagar.org

ঢাকা শহরে আছি। কিন্তু আমার মনটা সব সময় পড়ে থাকে নদীর কাছে, ধানের ক্ষেতে, বাঁশ বাগানে।

■ **সাহিত্যের জগতে বিভিন্ন ইজমের কথা শুনি। আপনি কি এসব ইজমে বিশ্বাসী?**

– সাহিত্যের ইজমগুলো সাহিত্যকে এগিয়ে দিয়েছে। সাহিত্যের নতুন নতুন দিগন্ত সৃষ্টি করেছে। সাহিত্যের ইজমকে আমি অস্বীকার করি না কিন্তু কোনো একটি বিশেষ ইজমকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে মনে করাকে আমি অপরাধ বলে মনে করি।

■ **কাব্যিক ফতোয়া অর্থাৎ অমুক কবি অমুক কবি না এসবকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন?**

– আমি এ ধরনের ফতোয়া বা মূল্যায়নকে পাত্তাই দেই না। এক্ষেত্রে আমি একটি কথা বলতে চাই, মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যখন নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দেখি তখন আমার কাছে মনে হয়, যারা পারস্পরিক কোনো বিষয় বা মতকে কেন্দ্র করে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়, তখন আমি চুপ করে একটা কথাই ভাবি, মানবতার মূল দুশমন কারা? এবং আমাদের লড়াইটা আসলে কাদের বিরুদ্ধে? এ বিষয়টি যদি আমাদের কাছে স্পষ্ট থাকতো তাহলে আমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতাম না।

■ **কবিদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে দশকওয়ারি বিভাজনটাকে কিভাবে দেখেন?**

– দশকওয়ারি বিভাজনকে আমি মূল্যায়ন করি মূলত আমাদের পরিচিতির ক্ষেত্রে। আমরা যেমন বংশ, গোত্র কিংবা অঞ্চল পরিচয় দিয়ে নিজেদেরকে পরিচিত করি তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রে দশকওয়ারি বিভাজনটা সেরকম; কিন্তু কোনো দশকই সাহিত্যের ক্ষেত্রে সবকিছু নয়। ক'জন বলতে পারবে যে, টলস্টয় কোন দশকের? তাহলে টলস্টয়ের সাহিত্যের মূল্যায়ন কিভাবে হবে? আসলে দশকওয়ারি বিভাজনটা সাহিত্যের মূল্যায়ন কিন্তু নয়।

■ **কেউ কেউ আশির দশক সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে থাকেন। আপনি নিজে একজন আশির দশকের কবি হিসেবে এটাকে কিভাবে দেখেন?**

– একটি কঠিন কথা বলি। নাস্তিকদের স্বভাব হলো পূর্ববর্তীদের অবদানকে অস্বীকার করা। কমিউনিস্টদের মধ্যে এই প্রবণতাটা আমরা ভালোভাবেই দেখেছি। সোভিয়েত ইউনিয়নে লেনিনের পরে স্ট্যালিন ক্ষমতায় এসে লেনিনকে নানাভাবে অস্বীকার করেন। আর স্ট্যালিনের পর ক্রুশ্চেভ এসে

www.nagorikpathagar.org

তো স্ট্যালিনের ইমেজকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে চেয়েছেন। এই ধরনের অস্বীকারের প্রবণতা মারাত্মক।

এ ক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষা হলো পূর্ববর্তীদের অবদান স্বীকার করা। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মুসলমান হতে হলে পূর্ববর্তী সব নবীদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। তিনি মুসলমান হওয়ার জন্য এটাকে শর্ত করে দিলেন। এই স্বীকার করাটা মানে হলো তাদের সম্মান করা, ভালোবাসা। তাদেরকে জানা। আর ভালোবাসা মানেই তো আরেকজনকে জানার জন্য নিবেদিত প্রাণ হওয়া। একজনকে না জানলে তাঁকে ভালোবাসা যায় না। পূর্ববর্তীদের অবদান স্বীকার রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি সুন্নাহ। আমরা এই সুন্নাহ থেকে সরে এসেছি।

আমি মনে করি, যে যে কালেই আসুন না কেনো, তার পরিশ্রমটা আমাদের জন্য কল্যাণকর হয়েছে। তিনি আমাদের কাজকে এগিয়ে দিয়ে গেছেন। এই চিন্তা যদি করি তাহলে পূর্ববর্তীদের প্রতি আর অশ্রদ্ধা থাকে না। হ্যাঁ, তিনি কতোটুকু করেছেন, তা সাহিত্যের বিচারে আমি বিচার করতে পারি, কিন্তু অস্বীকার করতে পারি না। ফররুখ আহমদ একটি নতুন আঙ্গিক এনে দিয়েছেন বলেই আমরা নতুন কিছু পেয়েছি। এখন ওই আঙ্গিক সচল কি অচল তা পরের কথা। কিন্তু ফররুখ আহমদকে তো অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। আমি আমার আগের কবিদের সম্মান করি, আর অস্বীকারের তো প্রশ্নই আসে না। আমার পরের কবিদের ক্ষেত্রেও আমার একই ভাবনা।

■ **আপনি কি তরুণদের কবিতা পড়েন?**

– আমি তরুণদের কবিতা কেবল পড়ি না, গিলি।

■ **বর্তমান সময়ের তরুণ কবিদের সম্পর্কে বলুন।**

– নব্বইয়ের দশক নিয়ে আমার ভিতরে রীতিমতো একটা অহংকার দানা বেঁধে উঠেছে। আমি মনে করি, আমরা যে স্বপ্ন দেখেছিলাম সেই স্বপ্ন সম্ভবত এরাই পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত করবে। আমি আরেকটি বিষয় খেয়াল করেছি, আদর্শবাদীরাই নব্বই দশকে ভালো কবি। গোটা বাংলাদেশের সাহিত্যের মোড় কিন্তু ঘুরে যাচ্ছে। অনেকে খেয়াল করেছেন কি না জানি না।

নব্বই দশকে যারা লিখছেন তারা কারো দয়া ভিক্ষা করেন না। আমি এদেরকে অত্যন্ত স্বাধীনচেতা দেখছি। তারা আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। এরা আমার কবিতার ভুল ধরলেও তা অত্যন্ত অকপটে বলে। এরা তীক্ষ্ণ মেধাবী। আমার কি মনে হয় জানেন, এরা একটা তুলকালাম কাণ্ড করে বসবে এবং তা অবশ্যই ইতিবাচক। বলা হচ্ছে, ঢাকা বাংলা সাহিত্যের রাজধানী। আমি

www.nagorikpathagar.org

মনে করি, নব্বই দশকের কবিরাই হবে এই রাজধানীর সেনাপতি এই রাজধানীর যথার্থ সৈনিক।

■ **আপনি তো চমৎকার অনুবাদ করেন। ওই সব অনুবাদের গদ্যও দারুণ। আপনি গল্প উপন্যাসে আসছেন না কেন?**

– যারা গল্প-উপন্যাস লিখেন তাদেরকে আমার অসম্ভব শক্তিশালী বলে মনে হয়। আমার খুব হিংসা লাগে আমিও যদি এরকম গল্প উপন্যাস লিখতে পারতাম!

■ **ভাবীতো গল্পকার। তার মানে আপনি তাকেও হিংসা করেন।**

– হ্যাঁ। হিংসা করি এই কারণে- ও খুব সুন্দর গল্প লেখে। আসলে হিংসা করার মতো। আমার একটি পরিকল্পনা আছে। পরিকল্পনাটি হলো আমি কথাসাহিত্য ও নাট্য সাহিত্যে কাজ করবো। এর জন্য আমি প্রস্তুতি নিচ্ছি।

■ **আপনার এই নতুন পরিকল্পনাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি।**

– ধন্যবাদ। আপনারা অনুবাদ নিয়ে কথা তুলেছেন। আমি অনুবাদ করি কেন? আমি মনে করি, বাংলা সাহিত্যকে যদি সমৃদ্ধ করতে হয় এবং সত্যিকার অর্থে বাংলা সাহিত্যকে যদি বিশ্বজয়ী সাহিত্য হিসেবে পরিচিত করতে হয় তাহলে কেবল ইংরেজি কেনো তাবত প্রধান প্রধান ভাষায় অনুবাদ হওয়া দরকার। ইংরেজি সাহিত্যের মাতব্বরীর কারণটাও কিন্তু অনুবাদ। কারণ বিশ্বের সেরা সাহিত্যগুলো অনুবাদের মাধ্যমে তাদের হাতে চলে যাচ্ছে।

আমার কি মনে হয় জানেন, নোবেল পুরস্কারটাতে একটি দারুণ কৌশল রয়েছে। কোনো সাহিত্যিক যখন এই পুরস্কারটা পাচ্ছেন, তখনই তার গোটা সাহিত্য অনুবাদ হয়ে যাচ্ছে। কোনো সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্মের অনুবাদ হওয়া মানে ওই দেশের গোটা সাহিত্যেরই অনুবাদ হওয়া। চীনের যখন একজন সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন তখন গোটা চীনের সাহিত্যই আলোচনায় চলে আসলো।

■ **আমাদের দেশের শিশুসাহিত্য সম্পর্কে কিছু বলুন।**

– আমাদের দেশের শিশুসাহিত্য অত্যন্ত শক্তিশালী। আজ পর্যন্ত শিশুসাহিত্য নিয়ে যে কাজ হয়েছে তা মোটেই কম নয়। বরং পরিমাণে বিপুল। সমস্যা হলো, শিশুসাহিত্যে আমাদের এখানে কাজের তুলনায় প্রকাশনা কম। যেহেতু আমাদের এখানে সাহিত্যের অঙ্গন ভাগ হয়েছে– যদি ভাগ না হতো তাহলে তার সমৃদ্ধিটা আমরা অনুভব করতে পারতাম। আবার '৪৭ এর পরে যারা শিশুসাহিত্যের চর্চা করেছিলেন তারা আদর্শবাদী ছিলেন। আর

www.nagorikpathagar.org

এ কারণেই তাদেরকে বাদ দিয়ে বর্তমানে যারা কাজ করছে তাদের নিয়েই লাফালাফি হচ্ছে।

খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে, অনেক লেখকেরই বহু পাণ্ডুলিপি পড়ে আছে প্রকাশের অপেক্ষায়। কিন্তু সমস্যা হলো প্রকাশক কোথায়? কে প্রকাশ করবে? শিশুসাহিত্যকে যদি যথাযথভাবে মর্যাদার সাথে প্রকাশ করা যেতো তাহলে আমরা এর সমৃদ্ধিটা টের পেতাম।

■ **আপনি অনেক মূল্যবান সময় আমাদের দিয়েছেন। এজন্য চাঁদুলিয়ার পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ।**

– আমি চাঁদুলিয়ার সাফল্য কামনা করি। চাঁদুলিয়ার এই ধরনের নতুন ও প্রশংসনীয় উদ্যোগ দেখে আমার মধ্যে বিপুল আনন্দ কাজ করছে। চাঁদুলিয়া যুগের চাহিদা পূরণে যথার্থ ভূমিকা পালন করুক আল্লাহর কাছে আমি এই দোয়াই করি। আপনাদেরকে আমি একেবারে অন্তরের অন্তস্তল থেকে শুভেচ্ছা জানাই, ভালোবাসা জানাই।

www.nagorikpathagar.org

একান্ত সাক্ষাৎকারে
কবি মতিউর রহমান মল্লিক

যিনি আশির দশকের অন্যতম শ্রেষ্ঠকবি। ইসলামী সংস্কৃতির খ্যাতিমান ও অগ্রনায়ক কবি, ইসলামী গানের অগ্রদূত কবি, সাহিত্যিক, গল্পকার, গায়ক, সুরকার, গীতিকার, সুবক্তা ও সিদ্ধহস্তের অনুবাদক, বর্তমান বাংলাদেশ সংস্কৃতি কেন্দ্রের সদস্য সচিব, এক সময় পত্রিকার পাতা উল্টালেই যার নাম চকচকিয়ে উঠতো তিনি সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব কবি মতিউর রহমান মল্লিক। নোয়াখালীর সাথে যার প্রাণ ক্রমাগতভাবে মিলিত, নোয়াখালীর প্রতি যার প্রবল আকর্ষণ, তিনিই এবার আমাদের নোয়াখালীর মুখোমুখি হয়েছেন। সাক্ষাৎকারটি গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে তার হাতের লেখার মাধ্যমে দিয়েছেন। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন 'আমাদের নোয়াখালী'র পক্ষ থেকে– আবুল খায়ের নাঈমুদ্দীন ও মহিববুল হক ফরিদ।

■ **আপনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।**

– আমার মূল নাম মোহাম্মদ আবুল মতিন এবং ডাকনাম মতি। আত্মীয়-স্বজনরা এখনো আমাকে মতি বলেই ডাকে। অনেকে আমাকে মল্লিক বলেও ডেকে থাকেন। লেখালেখি শুরু করেছিলাম মতিউর রহমান মল্লিক নামে। মতিউর রহমান নাম রাখার ক্ষেত্রে চৌমুহনী নিবাসী আমার ওস্তাদ হযরত মাওলানা আবদুর রব সাহেবের আগ্রহ সবচেয়ে বেশি কাজ করেছিলো। মল্লিক আমার বংশের নাম।

www.nagorikpathagar.org

আমার গ্রামের বাড়ি বাগেরহাটে। লেখাপড়া করেছি, বিশেষ করে আমার গ্রামের মাদরাসা বারুইপাড়া সিদ্দিকীয়া সিনিয়ার মাদরাসায়, বাগেরহাট পি. সি কলেজে এবং ঢাকার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে। চাকরি করেছি সাপ্তাহিক সোনার বাংলায় সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে, মাসিক কলমে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে, নতুন কলমের সম্পাদক হিসেবে, ইবনে সিনা ট্রাস্টের সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা হিসেবে। বর্তমানে বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্রের সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করছি।

■ আপনি কোন বয়স থেকে লেখালেখি শুরু করেন?

– সম্ভবত দশ/বারো বছর বয়স থেকেই। অবশ্য সাহিত্যপাঠ, একেবারে নির্ভেজাল সাহিত্যপাঠ শুরু করেছিলাম আরো আগে।

■ লেখালেখির জগতে আসার পেছনে কার প্রেরণায় বেশি উৎসাহিত হয়েছেন?

– আমার আব্বা ছিলেন সত্যিকার অর্থেই একজন গীতিকবি, ছোট চাচা ছিলেন খ্যাতিমান গায়ক। আর আমেরিকা প্রবাসী আমার বড় ভাই হচ্ছেন একজন যথার্থ আধুনিক কবি এবং বাংলাভাষার সুপণ্ডিত। লেখালেখির জগতে আসার পেছনে প্রথমত আমার বড় ভাইয়ের প্রেরণাই বেশি কাজ করেছে। পরবর্তী পর্যায়ে আমার নিকটতম নেতৃবৃন্দের উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা এই জগতে আমাকে আরো এগিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া নিজের আনন্দ-বেদনা প্রকাশ করার আগ্রহের এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে ভূমিকা রাখার বিষয়টিও উল্লেখ করা যায়।

■ আপনার লিখিত সাহিত্য শাখার মধ্যে কোন শাখাটিতে আপনি পরিতৃপ্ত?

– পরিতৃপ্ত হবার মতো লেখালেখি আমার আজো হয়েছে বলে মনে করি না। তবে আপনার প্রশ্নের মধ্যে যদি এই ইঙ্গিত থেকে থাকে যে, 'আপনি সাহিত্যের কোন শাখায় কাজ করে আনন্দ পান?' তাহলে তার জবাবে বলবো গান কবিতা এবং ছড়ার মধ্যে ডুবে থাকতে আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে। তবে সব শাখার প্রতিই আমার মনের টান সমান।

■ আপনি কবি হিসেবে খ্যাত জানি; কিন্তু অন্যান্য শাখায়ও আপনার লেখালেখির হাত দেখেছি, এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করুন।

– আসলে সাহিত্য হচ্ছে সত্য এবং সুন্দরের সাধনার জন্যে। এই সাধনা সাহিত্যের সব শাখাতেই এবং সব শাখার মাধ্যমেই করা উচিত। কিন্তু ঠিকঠাক মতো পারছি না যে, এমন একটি কষ্ট আমাকে তাড়িয়ে ফিরছে নিত্যদিন।

www.nagorikpathagar.org

■ এক সময় বিভিন্ন সংকলন আর পত্রিকার পাতা উল্টালেই আপনার নাম দেখতাম। ইদানিং তেমন চোখে পড়ে না কেন?

– আগের মতো নিয়মিত লিখতে পারছি না। শরীর ভেঙে গেছে। তাছাড়া সময়ের প্রায় পুরোটাই দিয়ে দিতে হয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক নানান কর্মসূচি বাস্তবায়নে। ব্যস্ত থাকি।

■ দেশের বাইরে সফর করেছেন কি না? করলে কোন কোন দেশ?

– ১৯৮৫ সালে বৃটেন, ইয়াং মুসলিম অর্গানাইজেশনের দাওয়াতে, উত্তরণ শিল্পীগোষ্ঠী লন্ডনের দাওয়াতে। ১৯৯২ সালে ভারতে, স্টুডেন্টস ইসলামীক মুভমেন্ট অব ইন্ডিয়ার দাওয়াতে। ২০০০ সালে পশ্চিমবঙ্গে 'ইকবাল পরিষদ' কোলকাতার দাওয়াতে।

■ সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে কবি-সাহিত্যিকদের মান পরিবর্তন হতে দেখা যায়, এ প্রসঙ্গে আপনার মতামত কী?

– সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে অনেকেরই পরিবর্তন হয়ে থাকে। ব্যবসায়ীদের, রাজনীতিবিদদের এবং এককথায় সব ধরনের সুবিধাবাদীদের। কেবল ঈমানদাররাই সর্ব অবস্থায় টিকে থাকে, টিকে থাকে তাদের নীতি এবং নিষ্ঠার ওপর।

■ আপনাকে কিছু লেখার অনুবাদ করতে দেখা গেছে, এতে আপনি কতোটুকু সফল বলে মনে করেন?

– আমি মূলত উর্দু থেকে অনুবাদ করি। অনুবাদে খুব সহজে সাফল্য লাভ করা যায় না। এ ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করেছি বলে মনে করি না। অনুবাদ করার আগ্রহ এসেছে আমার বিদেশি সাহিত্য পড়বার প্রতি আগ্রহ থেকে।

■ শিশুসাহিত্য প্রসঙ্গে আপনি কী ভাবছেন?

– আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির ওপর সবচেয়ে বড় আঘাত আসছে শিশু সাহিত্যের মাধ্যমে। এ ব্যাপারে সবারই সচেতন হওয়া উচিত। আমিও কিছু করতে পারি কিনা এক্ষেত্রে, সত্যি সত্যিই ভাবছি।

■ গান শোনেন কি? শুনলে কী ধরনের?

– নোয়াখালীর আঞ্চলিক গান আমার খুবই প্রিয়। একটি গান তো আমি প্রায়ই গেয়ে থাকি- ইন্না নিল্লাহ মাইজদীর বাস বোঁত বোঁত করি যায়, কন্টেকটারে লটকি লটকি হেসিঙ্গার বোলায়।"

মাটির সুর অর্থাৎ পল্লীসুর এবং সে সঙ্গে আঞ্চলিক গান আমাকে খুব টানে। কালামে ইকবাল, কাওয়ালী এবং গজল আমার প্রিয়। নজরুলের গানও।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী গানের প্রতি আমার দুর্বলতা সবচেয়ে বেশি। সম্ভবত সেই কারণে সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী, ব্যতিক্রম শিল্পীগোষ্ঠীসহ সারাদেশের ইসলামী শিল্পীগোষ্ঠীগুলোর গান আমি গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনে থাকি। (উল্লেখ্য, তার একক কণ্ঠে একাধিক নিজের লিখিত, সুরারোপিত গানের ক্যাসেট রয়েছে।)

■ **আপনার পছন্দের একজন কবির নাম উল্লেখ করুন।**

– আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু।

■ **আপনার জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা বলবেন কী?**

– আমি তখন গ্রামের বাড়ি থাকি। ঐ সময় মুসলিম আমি সংগ্রামী আমি/আমি চির রণবীর– গানটি লিখেছি মাত্র। একদিন শুনি কে যেনো ঐ গানটি গেয়ে গেয়ে আমাদের বাজারের দিকে যাচ্ছে। এগিয়ে গিয়ে দেখি গায়ক আমাদেরই এক বন্ধু।

নিঃশব্দে গান শুনতে শুনতে এক পর্যায়ে হো হো করে হেসে উঠে বললাম– তুমি গাচ্ছো এই গান, তুমি না হিন্দু? অশোক বললো- আরে রাখো ঐসব হিন্দু-ফিন্দু। ভালো লাগছে তাই গাচ্ছি।

■ **ভবিষ্যৎ কবিতা সম্পর্কে বলুন।**

– কবিতা বিকাশের দিকে আরো দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। এই গতি বিজয়ের গতি। এ গতি ঠেকাবার ক্ষমতা কারো নেই।

■ **আপনি একজন গায়ক, গীতিকার, সুবক্তা, অনুবাদক ও সিদ্ধহস্ত লেখক। কিন্তু কোনটি আপনার প্রিয়?**

– এ ব্যাপারে আগেই ইংগিত দিয়েছি।

■ **ইংরেজি ভাষার কবিদের মধ্যে আপনার পছন্দনীয় একজনের নাম বলবেন কি?**

– টি এস এলিয়ট। এই জন্যে যে, তার লেখায় তার বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। অবিশ্বাসী কবিদের আমি পছন্দ করি না।

■ **আপনিতো নোয়াখালী সফর করেছেন, জেলাটি কেমন লাগলো কিংবা আপনার স্মৃতিতে যা রয়েছে তার সংক্ষিপ্ত কিছু বলবেন কি?**

– অন্তত তিনবার সফর করেছি। একবার করমুল্লায়, আল কোরআন সম্মেলনে; একবার মাইজদী সীরাতুন্নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেমিনারে; আর একবার ফুলকুঁড়ি আসরের একটি অনুষ্ঠানে।

www.nagorikpathagar.org

নোয়াখালীর প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাকে প্রবলভাবে টানে। আমাদের বাগেরহাটের সাথে কোথায় যেনো একটা মিল আছে। এখানকার গাছ-গাছালির সঙ্গে, বিশেষ করে সুপারি-নারিকেল গাছের সঙ্গে। মনে পড়ে করমুল্লা থেকে মাইজদী আসার পথে একবার এমন কিছু গ্রাম আমি দেখেছিলাম যেখানে ছুটে যাবার জন্য প্রাণ আমার এখনো কেঁদে ওঠে।

নোয়াখালীর মানুষ সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধাবোধ ছোটবেলা থেকেই। আমার পরম শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ হযরত মাওলানা আবদুর রব সাহেবের বাড়ি নোয়াখালী, আমার কাব্য পৃথিবীর এক নিঃস্বার্থ অভিভাবক অধ্যাপক ফজলে আজীম সাহেবের বাড়ি নোয়াখালী, আমার রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু আবু নাসের মোহাম্মদ আবদুজ্জাহের ভাইয়ের শ্বশুর বাড়ি নোয়াখালী, আমার শ্রদ্ধেয় মুরব্বি অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী ভাইয়ের বাড়ি নোয়াখালী, আমার একান্ত প্রিয়জন মাওলানা আবদুল মোনায়েম ভাইয়ের বাড়ি নোয়াখালী, আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সাজ্জাদুর রহমান আতিকী ভাইয়ের বাড়ি নোয়াখালী, আমার এক শ্যালক সম্প্রতি নোয়াখালী বিয়ে করেছেন, এইসব নানা কারণে নোয়াখালীর সাথে আমার সম্পর্কের ধারাবাহিকতা ক্রমাগতভাবেই বৃদ্ধি পাচ্ছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে হৃদয়ের টান।

www.nagorikpathagar.org

ঢাকা হবে বিশ্ব কবিতার এক অপরিহার্য বিচরণ ক্ষেত্র

ত্রিশের দশকীয় আধুনিকতার পথ ধরে বাংলা কবিতায় প্রবেশ করেছে সংশয় ও নাস্তিকতা। সমাজতন্ত্রের উত্থানের এই যুগে মানুষের মৌলিক ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করার প্রবণতা আমাদের কবিরা অনেকটা আয়ত্ত করেছেন; যদিও এর মাঝখানে অনেক বড় বড় ব্যতিক্রম আমরা লক্ষ্য করেছি। আধুনিক বিশ্ব, মানবতার নামে যে নৈরাজ্য ও হতাশার জন্ম দিয়েছে, বিংশ শতকের মানুষেরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন নামে এর হাত থেকে মুক্তির সংগ্রাম চালিয়েছে; কিন্তু মানুষ তাদের স্বপ্নের চরাচর ও বিশ্বাসের পটভূমি খুঁজে পায়নি। এই শতকের শেষ দিকে এসে মানুষের দ্রোহ ও সংগ্রাম প্রাধান্য বিস্তার করেছে। 'রোঁলা' লিখেছেন ঊনিশ শ' ষোল সালের দোসরা নভেম্বর 'হে ইউরোপ, বিদায়...তুমি আজ কবরে পথ হাতড়ে ফিরছ, কবরেই তোমার স্থান, কবরেই তোমার শয্যা। জগতের নেতৃত্ব ভার অন্যে গ্রহণ করুক। কিন্তু দুর্ভাগ্য জগতের, এখনো ইউরোপ, রোঁলার ভাষায় যারা কবরের যাত্রী, তারাই জগতের নেতৃত্ব দিচ্ছে। কিন্তু বিংশ শতকের শেষের দিকে এই দ্রোহ ও সংগ্রাম মুখরতা ক্রমশ একটা প্ল্যাটফর্ম খুঁজে পাচ্ছে। এই সংগ্রামী মানুষেরাই আগামী শতকে পৃথিবীর নেতৃত্ব দেবে, এ কথা এখন বিশ্বের তাবৎ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরাই বলে বেড়াচ্ছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও ভাষার পাশাপাশি বাংলা কবিতায় এই জেগে ওঠার প্রবণতা, এই সংগ্রাম কোনো নতুন সংকেতে আবির্ভূত হবে কি? মূলত একবিংশ শতকের বাংলা কবিতাকে, কে কিভাবে আশা করছেন এ বিষয়ে আমাদের নিম্নোক্ত আয়োজন পঞ্চাশের আল মাহমুদ থেকে শুরু করে এ সময়ের তরুণতম (যারা চলতি শতকে কাব্যচর্চার প্রত্যয় নিয়ে হাতে খড়ি নিচ্ছেন) কয়েকজনের মুখোমুখি হয়েছি। আসুন আমরা উপলব্ধি করার চেষ্টা করি তাদের বক্তব্য।

– আহমদ বাসির

www.nagorikpathagar.org

মতিউর রহমান মল্লিক

কবিতা সব সময়ই সুন্দরের কথা বলে, সত্যের কথা বলে, মানবতার কথা বলে। কবিতা সব সময়ই প্রেমের কথা বলে, ভালোবাসার কথা বলে, হৃদয়ের কথা বলে। সুতরাং কবিতা সব সময়ই অপরিহার্য, নির্মাণের পক্ষে। পৃথিবীর অনেকেই কবিতাকে নির্মাণের বিপক্ষে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে ঠিক যতোবার চেষ্টা করেছে, ততোবারই। গোটা পৃথিবী এখন বিধ্বংসীদের হাতে জিম্মি। এই অবস্থায় আবার মুক্তির বারতা নিয়ে কবিতা এগিয়ে আসবে স্বাধীনতার হাতিয়ার হয়ে। কে না জানে যে, স্বাধীনতার জন্য বিশ্বময় এখন লড়াই করে ফিরছে বিশ্বাসীরা। সুতরাং এই হাতিয়ারে সবচেয়ে বেশি সুসজ্জিত হবে বাংলা ভাষা-ভাষী লড়াকু কবিরা।

ইতিহাসের উপর আমার যে পঠন-পাঠন এবং বর্তমান পৃথিবীর গতিশীলতার উপর আমার যে আমূল পর্যবেক্ষণ; তাতে আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, ঢাকা শুধু বাংলা কবিতার নেতৃত্বের রাজধানীই হবে না বরং সে হবে বিশ্বকবিতার এক অপরিহার্য বিচরণ ক্ষেত্র। সোজা কথায় ঢাকা শুধু বাংলা ভাষার রাজধানীই হবে না বিশ্বভাষার নেতৃত্বের জন্যও সে উন্মোচন করবে নতুন সূর্যের নতুন দিগন্ত।

www.nagorikpathagar.org

গান কোকিলের বৈঠকে

কবি মতিউর রহমান মল্লিক– বিশ্বাসের নিখাদ চেতনায় উজ্জীবিত মানুষের সঙ্গীত অনুপ্রেরণার অন্যতম স্থপতি। কাজী নজরুল ইসলাম, গোলাম মোস্তফা, ফররুখ আহমদের পথ ধরে গানের অঙ্গনে তার দৃপ্ত পদচারণা আজ সমৃদ্ধ, বর্ষীয়ান আর পরিপূর্ণতায় ভরপুর। মতিউর রহমান মল্লিক একাধারে গীতিকার, সুরকার এবং শিল্পী। পুষ্পিত গানের বাগিচায় তিনি যেন উচ্ছ্বসিত কোকিল। এক কর্মব্যস্ত পড়ন্ত বিকেলে তার কথার মজলিসে বসে ধন্য হয়েছি। প্রশ্নের উল্টোপিঠে তার কথামালার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসেছে ইসলামী সঙ্গীতের নানা দিক, অভিজ্ঞতা, দৃষ্টিভঙ্গি আর আমাদের চলার পথের দিকনির্দেশনা।

–আমিরুল মোমেনীন মানিক

■ **কার অনুপ্রেরণায় কিভাবে আপনি সঙ্গীত জগতে প্রবেশ করলেন?**

– বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। খুব সুন্দর একটি প্রশ্ন। এই প্রশ্ন বিভিন্ন সময়ে বহুজনের কাছ থেকে শুনে থাকি। আসলে এই একই প্রশ্নের নানান প্রেক্ষাপটে নানান রকম উত্তর হতে পারে। কিন্তু সবগুলো উত্তরের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। আমাদের পরিবারটা হচ্ছে– সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে আলোকিত পরিবার। আমার আব্বা কবিতা লিখতেন এবং বিশেষ করে আব্বা জারী গান লিখতেন। এবং আমার ছোটচাচা আমাদের আরো কিছু আত্মীয়-স্বজন নিয়ে এই জারী গান গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পাড়ায় পাড়ায় গেয়ে বেড়াতেন।

অন্যদিকে আমার আম্মা ছড়া কেটে কথা বলার মানুষ ছিলেন। তাৎক্ষণিকভাবে ছড়ায় ছড়ায় মিলিয়ে কথা বলে আমার মা আসরকে সরগরম করতেন। আমার বড় ভাই খুব বড় একজন কবি। কবি ফররুখ আহমদ বেঁচে থাকতে তার পরিচালিত অনুষ্ঠানে সেই পাকিস্তান আমলে কবিতা পড়েছিলেন। এবং

www.nagorikpathagar.org

ফররুখ আহমদ পছন্দ করেছিলেন। আমি যখন গ্রামে যাই, দেখা গেল গ্রামেরই কোন বৃদ্ধ জন, খুব ভালো চোখে দেখেন না, আমি যাচ্ছি আওয়াজ হচ্ছে– জিজ্ঞেস করলেন কে যায়? আমি বললাম- আমি মতি। তিনি চিনতে পারলেন না। কোন্ মতি? তখন বলতে হয়– আমি কবি সাহেবের ছোট ভাই। এই হলো আমাদের পরিবার। আমি এমন পরিবারে জন্মানোর সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম। সেই ৬০-এর দশকে কিংবা তারও আগে কিংবা ৫০-এর দশকে আমাদের বাড়িতে রেডিও চলে এসেছে। আমার এখনো মনে আছে, আমার বড় ভাই রেডিও শুনতেন। রক্তের সঙ্গে মিশে ছিল সুর।

এই রেডিও আমাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে। এমনকি বুঝতেও পারতাম না যে, কেনো ঐ অল্প বয়সে আধুনিক গান আমার খুবই ভালো লাগত, ভালো লাগত নজরুলের গান, ভালো লাগতো পল্লীর সুর মেশানো গান। বড় ভাই কবিতা লিখতেন রাত জেগে জেগে। ভাবী সারারাত বড় ভাইকে নানাভাবে সহযোগিতা করতেন। পান বানিয়ে পাশে বসে থাকতেন, বড় ভাই পান খেতেন। এই দৃশ্যটা আমার খুব ভালো লাগতো। আমিও চেষ্টা করতাম, কিছু লেখা যায় কিনা? একসময় কবিতা লিখে ফেললাম। বড় ভাইকে দেখালাম, বড় ভাই বললেন, তুমি আধুনিক কবিতা পড় এবং আধুনিক কবিতা লেখার চেষ্টা কর। এখনকার সময় আধুনিক কবিতা লেখার সময়। এই কথাটি আমার ভিতরে খুব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সে জন্যই ছোটবেলা থেকেই আমি আধুনিক কবিতা লেখার চেষ্টা করতাম। গানের বিষয়ে আগেই বলেছি যে, গানের সাথে আমার রক্তের সম্পর্ক। রেডিও শুনে শুনে ইচ্ছে জাগ্রত হয়েছিল যে, আমিও কি এরকম সুর করে গান লিখতে পারি না? যেহেতু আধুনিক গান বেশি করে শুনতাম সেহেতু আধুনিক গান দিয়েই আমার গান লেখার যাত্রা শুরু হয়েছে।

অন্যদিকে আরও একটি বিষয়ের অবতারণা করা দরকার। আমাদের গ্রামটা আসলেই সাংস্কৃতিক গ্রাম। আমার বেশ কিছু বন্ধু-বান্ধব ছিলো যারা অসাধারণ গান গাইতে পারত। এদের মধ্যে শাহ মতিয়ার রহমান খুবই চমৎকার গলার অধিকারী ছিলো। ও আমার ছোটকালের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমরা প্রায় একই বয়সী। এই শাহ মতিয়ার রহমান ফারাজীর চমৎকার গলা ছিলো। নজরুলের গানের গলা। ওর কণ্ঠে যখন নজরুলের গান শুনতাম বা এখনো শুনি আমি অবাক হয়ে যাই যে, এই মতিয়ার ফারাজী আমাদের গ্রামের একজন শ্রেষ্ঠশিল্পী। অসাধারণ পল্লীগীতি গাইতে পারতো। এখনও পল্লীগীতি গেয়ে থাকে। গরিবের ঘরের ছেলে বলে এখন সে ওষুধ ফেরি করে বিক্রি করে। এবং তার ওষুধ বিক্রি করার অন্যতম হাতিয়ার হল পল্লীগান। সে যখন পল্লীগান ধরে কোন বাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে, তখন সাধারণভাবেই লোকজন

www.nagorikpathagar.org

জড়ো হয়ে যায়। এত সুন্দর পল্লীগীতি আমি আবদুল আলীমের কণ্ঠ ছাড়া আর অন্য কারো কণ্ঠে শুনেছি বলে মনে হয় না। রজব আলীর প্রতি এখনো আমার খুব মায়া লাগে যে, আমি তাকে কাজে লাগাতে পারলাম না। অন্যদিকে আকবর আজাদ, আমাদের এলাকার একজন রাজনৈতিক নেতা। কিন্তু যখন সে শৈশবে ছিলো, কৈশোরে ছিলো, তখন খুব ভালো গান গাইতে পারতো। খুব ভালো গলা ছিলো তার। ভরাট গলা।

সেই গলাটা এখন তার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছে। ও খুব সুন্দর বক্তৃতা পারে। মোটকথা হলো, একদিকে শ্রেষ্ঠ কয়েকজন শিল্পী আমাদের গ্রামে ছিলো; অন্যদিকে আরেকজন অসাধারণ বাঁশের বাঁশি বাজাতে পারতো। আমি তার মত অসাধারণ বাঁশের বাঁশি বাজানেওয়ালা খুব কম দেখেছি। সে এখন যশোরে বাড়ি করেছে, গাড়ি চালায়। এই সব শিল্পীর পাশাপাশি এমন কিছু বন্ধু-বান্ধব ছিলো যারা খুব ভালো লিখত।

আমার একজন বন্ধু ছিলো সমীর কুমার ঘোষ। সমীর এখন পশ্চিমবঙ্গেই আছে। শুনেছি সিপিএম-এর বড় নেতা হয়েছে। এই সমীরের চরিত্রটা ছিলো চমৎকার কোমলতায় পরিপূর্ণ। সুন্দর একটা চেহারা ছিলো তার। অসাধারণ মেধাবী। স্কুলের মধ্যে সে ফার্স্ট হতো। ওর সাথে আমার একটি গভীর বন্ধুত্ব জমে উঠেছিল দুটি কারণে। একটি হলো– আমার বড় ভাইয়ের ছাত্র, অন্যটি হলো– ও কবিতা লেখে, আমিও কবিতা লিখি। খুলনার বিভিন্ন পত্রিকায় ওর কবিতা বেশি পরিমাণে প্রকাশিত হতো। কিন্তু কেনো যেনো আমার কবিতার প্রতি সমীর খুব দুর্বল ছিলো। আমিও ওর কবিতার প্রতি দুর্বল ছিলাম। ও ছিলো সবকিছু নিয়ে। ও ছোটবেলাতেই বিপুল গল্প লিখেছে। তার বাঁধাই করা খাতা ভর্তি ছিলো গল্প। কোন একটি খাতায় ছিলো কবিতা। আমি ওরকম সাজিয়ে গুছিয়ে কখনো লেখালেখি সংরক্ষণ করিনি। এটা আমার একটা বড় ধরনের দুর্বলতা। আমি এখনও আমার লেখাগুলোকে গুছিয়ে রাখি না।

■ **আপনার কথার মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে, এই অঙ্গনে আসার পেছনে আপনার পরিবার ও পরিবেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এখন অন্য প্রসঙ্গে যাচ্ছি। আমরা জানি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনেক সাহাবী কবি ছিলেন। এখন জানতে চাচ্ছি যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের মধ্যে এমন কোন সাহাবী কি ছিলেন যারা নিয়মিত গান গাইতেন? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এবং অন্যান্য সাহাবীদের গান শুনাতেন? ইতিহাসে এমন কোন তথ্য পাওয়া যায় কি?**

www.nagorikpathagar.org

– খুব সুন্দর প্রশ্ন। সম্প্রতি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফিকহ বিষয়ক একটি গ্রন্থ বের হয়েছে। এই গ্রন্থটি পড়তে গিয়ে আমি একদিন হতবাক হয়ে গেলাম। এ গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এমন কোন সাহাবী বাকি ছিলেন না যিনি সুরের ব্যবহার করেননি।

আমি তো হাদীসে পেয়ে থাকি যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআনকে মধুর সুরে তেলাওয়াতের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। সুরের প্রয়োগের ব্যাপারে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যে উৎসাহ এতে প্রমাণিত হয় যে, সুরকে যথার্থ ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মতি ছিল। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগের কবিরা প্রচণ্ড মেধাবী ছিলেন। তাদের অধিকাংশ কবিতাই ছিলো মুখে মুখে রচিত। রাসূলে করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরও ৩০ কিংবা তারও উর্ধ্বে কিছু লাইন আছে। যে লাইনগুলো তিনি কঠোর পরিশ্রমের সময় সাহাবীদের শুনাতেন। যেমন খন্দক যুদ্ধের খন্দক খননের সময়। সেই সময়েও সাহাবীরা মুখে মুখে কবিতার লাইন রচনা করে তালে তালে গেয়েছেন।

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম মুখে মুখে কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- আনা নাবিয়্যুন লা কাজিব, ওয়া আনা ইবনু আবদিল মুত্তালিব। এই যে কাজিবের সাথে মুত্তালিবের অন্ত্যমিল, এই ধরনের অন্ত্যমিল সম্পন্ন আরও বেশ কিছু লাইন তিনি মুখে মুখে রচনা করেছিলেন। এখনো আমরা যদি সন্ধান করি, তা পেয়ে যেতে পারি। একটা কথা স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে উপস্থাপিত কবিতাগুলো ঐ সময় কবিরা সুর লাগিয়ে পরিবেশন করতেন। যেখানে সুরের প্রয়োজন সেখানে তারা সুরের ব্যবহার করতেন, আর যেখানে বলিষ্ঠভাবে উচ্চারণের প্রয়োজন সেখানে বলিষ্ঠভাবে উচ্চারণ করতেন। সুতরাং বলা যায় যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে, সাহাবীদের যুগে সুরকে কাজে লাগানো হয়েছিলো।

সুরতো আল্লাহরই দান। পাখিদের কণ্ঠে সুর আছে। পাখিদের যে সুর, সে সুরকে তো কেউ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে না। তবে, মানুষের কণ্ঠে আল্লাহ যে সুর দিয়েছেন তা কেনো নিষিদ্ধ হবে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মধুর কণ্ঠে তার কালাম থেকে বেহেস্তবাসীদেরকে একদিন শোনাবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আগে দাউদ আলাইহিস সালাম-এর কণ্ঠে কেতাব থেকে বেহেস্তবাসীর শোনার সুযোগ হবে। দাউদ আলাইহিস সালাম-এর সুর ছিলো

www.nagorikpathagar.org

চমৎকার ও মোহনীয়। দাউদ আলাইহিস সালাম তাঁর কিতাব নদীর কূলে পড়তেন এবং সে সুরে মুগ্ধ হয়ে নদীর মাছেরা ভিড় জমাতো। সুতরাং একটি কথা স্পষ্ট যে, নবীরা সুরকে ব্যবহার করেছেন। নবীরা তাদের কাছে যে কালাম এসেছিলো তা বিশুদ্ধভাবে পরিবেশন করেছেন।

সুর নিষিদ্ধ নয়। বিষয়বস্তু নিষিদ্ধ হতে পারে। একটি সুরের মধ্য দিয়ে মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা যায়। নিষিদ্ধ হল সেই সুর, যে সুর মানুষকে আল্লাহর দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

■ **সাংস্কৃতিক মাধ্যম হিসেব সঙ্গীত কতোটুকু নির্ভরযোগ্য? ব্যক্তিগত জীবনে অন্যান্য সাংস্কৃতিক মাধ্যমের চেয়ে সঙ্গীতকে কেনো বেশি আঁকড়ে ধরলেন?**

– সুর হচ্ছে মানুষের একটি স্বভাবজাত দিক। আমিরুল মোমিনীন, তুমি লক্ষ্য করলে বিষয়টি অনুধাবন করতে পারবে। যে লোকটি সুর পছন্দ করে না, সুরের বিরুদ্ধে বলে, সেই লোকটিও আনমনে সুর করে গান গায়। হঠাৎ দেখবে, সেই লোকটিই হেঁটে যাচ্ছে আর বাজখাই সুরে কিছু একটা পরিবেশন করছে। মানুষের জন্য যে প্রবণতাগুলো দেওয়া হয়েছে, সেগুলো আল্লাহই দিয়েছেন। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই সুর কাজ করে।

■ **তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে, সাংস্কৃতিক মাধ্যম হিসেবে সঙ্গীত মানুষের মধ্যে বেশি প্রভাব ফেলে?**

– সুর চিরকাল ছিলো, সুর চিরকাল থাকবে। সুরকে মানুষ চিরকাল পছন্দ করে, চিরকাল পছন্দ করবে। এখন সুরকে কে কোন পথে পরিচালিত করবে সেটা হলো যার সুর আছে তার ব্যাপার। একজন ঈমানদার তার সুরকে দ্বীনের কাজে লাগাবে। একজন বে-ঈমানদার তার সুরকে আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে কাজে লাগাবে। এই ধারা অনেক আগে থেকেই চলে আসছে। এখনও লক্ষ্য করছি। সুর মানুষকে এমনভাবে আকৃষ্ট করে যে, সুরের তালে তালে মানুষ হারিয়ে যায়। বিশেষ করে তরুণ-তরুণীদের জন্য সুর একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। এই প্রয়োজনীয় বিষয়টি বাদ দেওয়ার মধ্যে কোনো বাহাদুরি নেই। বরং সুরকে কিভাবে সত্যের পক্ষে, সুন্দরের পক্ষে, মানবতার পক্ষে কাজে লাগানো যায়– সেটাই করতে হবে।

■ **সুরের প্রসঙ্গ যখন এসে পড়ল, তখন আমার প্রশ্ন হল ইসলামী গানের সুর কেমন হবে?**

– আমি একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি তোমাকে বোঝাতে চাই। দেখো আমিরুল মোমেনীন, প্রত্যেক দেশেরই একটা বৈশিষ্ট্য আছে। প্রত্যেকটা

www.nagorikpathagar.org

দেশের মানুষের পোশাকে আশাকে একটা স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন— বার্মার লোকদের পোশাক-আশাক আর বাংলাদেশের লোকদের পোশাক-আশাক কিন্তু এক নয়। কোথাও না কোথাও একটা পার্থক্য থেকেই যায়। তাহলে নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পেরেছো যে, প্রত্যেকটি দেশের মানুষের পোশাক-আশাকে একটি স্থানীয় প্রভাব কাজ করে। এই স্থানীয় প্রভাবের ক্ষেত্রে সেদেশের আবহাওয়া ও সংস্কৃতির বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। সুরের ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্য সব দেশেই তুমি লক্ষ্য করবে। আমেরিকার মানুষের সুরের যে ধরন, চীনের মানুষের সুরের ধরনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আমাদের দেশের মানুষের জন্য আমাদের আবহাওয়া ও পরিবেশে লালিত সুরকে প্রাধান্য দিতে হবে।

■ **আপনি বলতে চাচ্ছেন— সুরের কোনো নির্দিষ্ট মানদণ্ড থাকবে না। অঞ্চলভিত্তিক সুরের বিভিন্নতা আসতে পারে।**

– তার মানে স্থানীয় মাটি, স্থানীয় প্রকৃতি, স্থানীয় ঐতিহ্য এসব কিছুকেই প্রথমত প্রাধান্য দিতে হবে। সেই সঙ্গে তোমাকে আরেকটি বিষয় ভাবতে হবে যে, তুমি বিশ্বমুসলিমের একটি অংশ। একদিকে যেমন তুমি দেশীয় নাগরিক, অপরদিকে মুসলিম হওয়ার কারণে তুমি বিশ্বনাগরিক। সুতরাং বিশ্বের সাথে তোমার একটি সম্পর্ক আছে। সুরের ক্ষেত্রেও এটিকে মান্য করতে হবে। তার মানে মুসলিম জাহানের সুরের সাথে তোমাকে পরিচিত হতে হবে। তোমাকে তো তুরস্কের সুর সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে, মালয়েশিয়ার সুর সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে, আরবি সুর সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে। এসব সুরের সাথে তোমার একটি সহজাত সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। দেশীয় সুরের সাথে বিশ্বনাগরিক হিসেবে তোমার অধিকারের সুর যখন একীভূত হয়ে যাবে, তখন তুমি তোমার সুরের মধ্যে আলাদা একটি ব্যঞ্জনা খুঁজে পাবে। অবশ্যই তোমাকে গোটা বিশ্বের সুরকে আবিষ্কার করতে হবে। এবং তা তুমি অবহেলা করতে পারো না।

■ **আপনি দেশীয় ঐতিহ্য এবং ধর্মীয় ঐতিহ্যের সমন্বয়ের কথা বলতে চাচ্ছেন?**

– হ্যাঁ। সেই সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের বৈচিত্র্যময় সুরের প্রতি আগ্রহ থাকতে হবে।

■ **আমি এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় বলছি। ধরুন, আমি জন্মগতভাবে আমেরিকার একজন মুসলমান। কিন্তু আমরা জানি যে, আমেরিকার লোকজ সঙ্গীত হলো জ্যাজ। জ্যাজ সঙ্গীত থেকেই পরবর্তীতে রক**

www.nagorikpathagar.org

সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়েছে। তাহলে আমেরিকায় ইসলামী সঙ্গীতের সুর কেমন হবে? সেখানকার গানে দেশীয় ঐতিহ্য ও ইসলামী ঐতিহ্যের সমন্বয় থাকবে কি না?

– অবশ্যই। কেননা আমেরিকা তো একটা ভূ-খণ্ডকে কেন্দ্র করে। এই ভূ-খণ্ডটা কার? আল্লাহর। আল্লাহর ভূ-খণ্ডের যাবতীয় সম্পদ আল্লাহর এক বান্দা কাজে লাগাবে, এতে দোষের কি? তোমাকে যে জিনিসটা জানতে হবে, সেটি হলো সুরের কোনো দোষ নেই। সুরের দোষ হবে তখনই যখন সুরের সাথে বিশেষ কোনো বিশ্বাস জড়িত থাকে। তুমি সেই সুরকে গ্রহণ করতে পার না, যে সুরটা পৌত্তলিকতার সাথে জড়িয়ে আছে, শিরক্-এর সাথে জড়িয়ে আছে, বিজাতীয় আদর্শের সাথে জড়িয়ে আছে। যেমন– গীতা পড়বার একটি ঢং আছে। তুমি তো গীতা পড়বার ঢংটিকে কোরআন পড়বার ঢং হিসেবে গ্রহণ করতে পারো না। তুমি নিশ্চয়ই জানো, নামের ক্ষেত্রে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি দারুণ আকর্ষণ ছিল। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে যখন কেউ যেতো অপরিচিত হলে প্রথমে তিনি তার নাম জিজ্ঞাসা করতেন। আগন্তুকের ভালো নাম হলে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখমণ্ডলে আলো ছড়িয়ে পড়তো। আর যখন খারাপ নাম হতো তখন তার মুখের ভাষায় বোঝা যেতো যে, তিনি সন্তুষ্ট হননি। একবার এক সাহাবী এলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কি? সাহাবী বললেন– আমার নাম শিহাব (অগ্নিশিখা)। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– আজ থেকে তোমার নাম হিশাম (দানশীল)। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামের পরিবর্তন করেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, মানুষের নাম তার স্বভাবের উপর প্রভাব ফেলে।

যার একটি সুন্দর নাম আছে এবং সেই নামের একটি সুন্দর অর্থ আছে, তার চরিত্রের উপর সেই নামের প্রভাব রয়েছে। শিহাব নাম রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেনো পরিবর্তন করলেন? যারা বড় বড় মনীষী তারা বলেছেন– শিহাব নামের অর্থ হলো স্ফুলিঙ্গ। কারো নাম স্ফুলিঙ্গ হোক এটা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাননি। স্ফুলিঙ্গের যে কাজ, সেই কাজ একজন মানুষের হতে পারে না। অতএব নামের ক্ষেত্রে যে আদর্শ সেই আদর্শ সুরের ক্ষেত্রেও। তুমি জান যে, আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নাম রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিখেছেন আবদুর রহমান। তিনি যখন মুসলিম ছিলেন না– কেউ বলেন, তখন তার নাম ছিলো আবদুল উজ্জা, আবার কেউ বলেন, আবদে শামস। উজ্জা ছিলো সেই সময়কার একটি মূর্তি। আবদে শামস মানে সূর্যের দাস। সুরের ক্ষেত্রেও এই ধারাটিকে সামনে রাখতে পারো।

www.nagorikpathagar.org

■ **কাজী নজরুল ইসলাম, ফররুখ আহমদ, গোলাম মোস্তফা, সিরাজুল ইসলাম এবং আপনার গানের মতো সমৃদ্ধ গান আর সৃষ্টি হচ্ছে না কেন?**

– গান কিন্তু এক ধরনের কবিতা। গানে বাণী থাকতে হয়। গানে আকর্ষণীয় ভাষা থাকতে হয়। দেখো, কিছু কিছু গান শুনে মানুষ পাগল হয়ে যায়। তোমাকে ভাবতে হবে যে, কেনো পাগল হচ্ছে? একজন মানুষ একটি গানের জন্য তখনই পাগল হয় যখন গানটিতে তার হৃদয়ের কথা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আমাকে যে ভালোবাসে, আমাকে যে শ্রদ্ধা করে, আমার সুখ, দুঃখ যে গ্রহণ করে তাকে তো আমি ভালোবাসবোই। তুমি যে গান লিখছো, যে গান সুর করছো, তাতে যদি দেশজোড়া শ্রোতার চাহিদা পূরণের বিষয় থাকে তাহলে কেনো সেই গান মানুষ গ্রহণ করবে না? আব্বাস উদ্দীন ভাওয়াইয়া গানকে সুপ্রিয় করেছিলেন, জাতে তুলেছিলেন। আমার শেষ কথা হচ্ছে– মানুষের বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করো, মানুষের কষ্টকে তুমি গ্রহণ করো এবং দুঃখকে বোঝার চেষ্টা করো। তুমি মানুষের হয়ে মানুষের কথা বলো, মানুষের সুখ পরিবেশন করো এবং এভাবে যদি কথা ও সুরের সৃষ্টি করতে পারো তাহলে মানুষ কেনো গ্রহণ করবে না?

■ **গানে বাদ্যযন্ত্রের বিষয়টা কেমনভাবে দেখছেন?**

– এটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নিঃসন্দেহে একটি জটিল প্রশ্ন। আগের দিনের বড় বড় আলেমদের মধ্যে এ সম্পর্কে দুই ধরনের মত ছিল। কেউ কেউ মনে করতেন– বাদ্যযন্ত্র হারাম বিষয়। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে এমন বলেছেন যে, আমি বাদ্যযন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য পৃথিবীতে এসেছি। অনেকে এটাকে সামনে রেখে বলেন যে, বাদ্যযন্ত্রের কোনো সুযোগ নেই। অন্যদিকে অনেক আলেম মনে করেন যে, বাজনার কোনো দোষ নেই। দোষ হলো এটি কে, কিভাবে, কোথায় ব্যবহার করছে। দ্বীনের বিরুদ্ধে যে বাজনা ব্যবহৃত হয় সেটি নিঃসন্দেহে নাজায়েজ। কিন্তু যে বাজনা মানুষকে আল্লাহর পথে অনুপ্রাণিত করার কাজে লাগে, তা কেনো অবৈধ হবে? এ বিষয়টি নিয়ে আগের দিনেও বড় বড় আলেমগণ প্রশ্ন রেখেছেন। বর্তমান সময়ের অনেক বড় বড় আলেম এ কথা বলে থাকেন । বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আলেম, শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ আল্লামা কারজাভী বলেছেন, ইসলামী বিপ্লবের জন্য, কিংবা কল্যাণমূলক কোনো কাজের ক্ষেত্রে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হলে সেটি হবে মুবাহ। তিনি বাজনার ব্যবহারকে হারাম বা নিষিদ্ধ না করে একটি মধ্যবর্তী সমাধান দিয়েছেন। আমাদের দেশে কিছুদিন আগে বাদ্যযন্ত্রের উপর গবেষণা হয়েছে। মাওলানা আকরম খাঁ মনে করতেন সব ধরনের বাজনাই জায়েজ। মাওলানা আবদুর রহীম এ বিষয়ে গবেষণা করে বলেছেন– যে সব বাদ্যযন্ত্রের নিজস্ব সুর আছে

www.nagorikpathagar.org

সেগুলো নাজায়েজ। অপর দিকে যে সব যন্ত্রের নিজস্ব সুর নেই, অন্যকেউ সেটাকে কাজে লাগিয়ে সুর তৈরি করে, সেটি বৈধ।

■ **নিজের সুর বলতে মাওলানা আবদুর রহীম কী বুঝিয়েছেন?**

– হারমোনিয়ামের নিজের সুর আছে, কিন্তু তবলার নিজের কোনো সুর নেই। একজন তবলাবাদক এটিতে সুর সৃষ্টি করেন। ইদানিং আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করি যে, যারা বলছেন বাজনা বৈধ নয়, তাদের দরজাতে, কম্পিউটারে, মোবাইলে বাজনা ব্যবহৃত হচ্ছে। এক্ষেত্রে কিন্তু কেউ কিছু বলেন না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, অধিকতর প্রয়োজনে যখন কেউ বাজনা ব্যবহার করবে, তখন সেটাকে অবৈধ বলার সুযোগ থাকবে না। এখানে আমি প্রশ্ন রাখতে চাই যে, যেখানে বাজনার প্রয়োজন অত্যাবশ্যকীয় সেখানে আমরা কেনো ব্যবহার করব না?

■ **আব্বাস উদ্দীন, আবদুল আলীমের গাওয়া অসম্ভব জনপ্রিয় ইসলামী গানগুলো তো বাজনা সহযোগেই গাওয়া।**

– অবশ্যই। একবার শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক এক মিলাদের দাওয়াত দিয়েছিলেন বেশ কয়েকজন আলেম ওলামাকে। সেখানে তিনি হামদ নাত গাওয়ার জন্য ডেকেছিলেন কাজী নজরুল ইসলামকে। যারা দাওয়াতে এসেছিলেন তারা চলে যেতে চাচ্ছিলেন। শেরে বাংলা তখন বললেন– আমাদের নজরুল খুব সুন্দর গান গাইতে পারে, সে আল্লাহ রাসূলের (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গানই গাইবে। তারপর নজরুল ইসলাম একটার পর একটা হামদ, নাত, ইসলামী গান গেয়ে যেতে লাগলেন। আর মাওলানা সাহেবরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে রইলেন। আমার এসব কথায় সবাই বুঝে গেছে যে, বাজনার ব্যাপারে আমার পজিটিভ মতামত আছে।

তবে আরও একটি কথা বলতে চাই। সেটি হলো, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমার মতামত যাই হোক, ইসলামী সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো এ মুহূর্তে বাজনার ব্যবহার শুরু করলে ইসলামী আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিনা সেটাও ভাবতে হবে। যারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি দেয় তাদের অতিরিক্ত আবেগে আপ্লুত হলে চলে না। সময়কে বিবেচনা করতে হয়। আমি স্পষ্ট করেই বলতে চাই যে, এদেশে রেডিও টেলিভিশনের জন্য বাজনার প্রয়োজন আছে। এই বাজনাকে কখনোই পরিহার করা যাবে না বলে আমার মনে হয়। এখন রেডিও টেলিভিশনের দিকে লক্ষ্য রেখে আমি যদি এ কাজে উদ্বুদ্ধ করি তাহলে আমার ঠিক হবে না। ইসলামী আন্দোলন অনেক বড় বিষয়। আমাদের সময়কে বিবেচনা করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

■ গানের ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা কতোটুকু?

- আমিরুল মোমেনীন, তুমি বাংলার ছাত্র, তোমার জানার কথা। পৃথিবীতে আমরা যতোগুলো ভাষা শুনি ঐ ভাষাগুলোই আগে এসেছে। তারপর ব্যাকরণ। গোটা দেশের মানুষের মধ্যে কতোজন লোক ব্যাকরণ জানে। যারা শিক্ষিত লোক তারাও কি ব্যাকরণ জানেন? আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক মায়ের ভাষায় কথা বলে, ব্যাকরণের ধার ধারে না। তাদের কথায় কি মানুষ আকৃষ্ট হয় না? গ্রামে-গঞ্জে অসংখ্য শিল্পী আছে, যারা স্বরলিপি জানে না। এদের কি শ্রোতা নেই? এই মহানগরীর অনেক খ্যাতিমান শিল্পীও সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয় না। কিন্তু লঞ্চ, স্টিমারে যারা গান করে, তাদের ভক্ত সংখ্যা অগণিত। এগুলোর দিকে তাকিয়ে বুঝতে হয়, ব্যাকরণের উর্ধ্বে কিছু জিনিস আছে।

■ তাহলে আমাদের গানগুলোর কি শিল্পমান থাকা উচিত নয়?

– গানের ক্ষেত্রে ব্যাকরণ প্রধান হওয়া উচিত নয়। প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত গানের মধ্য দিয়ে আমি কী বলতে চাই, সেটা।

বহু বছর আগে আমি একবার বিবিসির সাক্ষাৎকারে পাশ্চাত্য জগতের প্রচণ্ড জনপ্রিয় একজন শিল্পীর কথা শুনেছিলাম। নাম মনে নেই। একটি পত্রিকায় তার উপর নিবন্ধ পেয়েছিলাম, তা সংরক্ষণও করেছিলাম, তবে এখন তা নেই। বিবিসিতে যিনি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন তিনি ছিলেন বাজনাবিহীন সঙ্গীতের একজন বিশিষ্ট গায়ক। তিনি কখনো বাজনা ব্যবহার করেননি। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো বাজনা কেনো ব্যবহার করেন না? তখন তিনি বলেছিলেন যে, আমার গলায় কি সুর নেই? বাজনার মধ্যে আমার সুর হারিয়ে যায়। আমার শ্রোতা আমার আসল ও অকৃত্রিম সুরটাই শুনতে চায়, বাজনা নয়।

আমাদের গানগুলো এমন আকর্ষণীয় হোক, যাতে বাজনার প্রয়োজন অনুভব না করতে হয়। এটাই আমাদের কাম্য। তুমি নিশ্চয় জানো, আরবি গানের মাধুর্য এসেছে স্প্যানিশ থেকে। মুসলমানদের সোনালি সময়ে নানা ক্ষেত্রে তারা বিচরণ করেছে। আরবির মিষ্টি ভাষা আর মিষ্টি সুরের সাথে সেই সময়ে ওস্তাদগণ সমন্বয় করেছিলেন স্পেনের সুর। সে কারণেই আরবি গানে আরবদেশের ঐতিহ্যিক সুর আর স্প্যানিশ সুরের সংমিশ্রণ খুঁজে পাওয়া যায়। ইখওয়ানুল মুসলিমিন এমন কিছু ইসলামী গান তৈরি করেছে যেসব গানে আধুনিক সুর, মুসলিম ঐতিহ্যের সুর আর স্প্যানিশ সুরের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। আমি মনে করি আমাদের গানগুলোর গতি আনা দরকার। তাল, লয়, মাত্রার সঠিক প্রয়োগ করা দরকার।

www.nagorikpathagar.org

এর অর্থ এই নয়, আমাকে সারারাত ধরে হারমোনিয়াম নিয়ে থাকতে হবে। সারাজীবন হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইছে এমন অনেক শিল্পী আছে, যাদের কাছে গানের সুর করা দুঃসাধ্য ব্যাপার।

সুতরাং হারমোনিয়াম, তবলা আর ব্যাকরণকে যারা সর্বস্ব মনে করে আমি তাদের পক্ষে নই। আমাদের কেউ কেউ তো সুর করছে। আকর্ষণীয় সুর হচ্ছে। ইসলামী গান নিয়ে যারা ব্যঙ্গ করে, তাদের শিকড় কোথায়? যাদের জন্য আমাদের এই গান তারা আকৃষ্ট হলেই আমরা সার্থক। আমাদের কাজ হচ্ছে জনগণের সাথে, কোনো শেকড়বিহীন গোষ্ঠীর সাথে নয়।

ব্যাকরণের ব্যবহার করবো সৌন্দর্যের জন্য। সেই সৌন্দর্য আমরা অন্যভাবে আয়ত্ব করতে পারলে ব্যাকরণের প্রয়োজন কী? নিশ্চয়ই আমি ব্যাকরণের বিপক্ষে নই। সাধনা যারা করে, তারা বিভিন্ন উপায়ে করে। তারা হেকমতের পন্থা অবলম্বন করে।

সা, রে, গা, মা এটাই যে বলতে হবে এমন তো কথা নয়। অন্য কিছুও তো বলা যায়। যেমনঃ ক, খ, গ, ঘ অথবা আলিফ, বা, তা, ছা।

একটা প্রতীক কে সামনে রেখে কাজ করা দরকার। আমাদেরকে সাধনা করতে হবে। মূল কাজ বাদ দিয়ে ব্যাকরণ নিয়ে পড়ে থাকতে আমাদেরকে বাতিলপন্থীরা প্রলুব্ধ করে। গানের বিষয়ে আমার শেষ কথা হলো, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি বাদ্যযন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য পৃথিবীতে এসেছি। এ কথার অর্থ হবে, সেই সব বাদ্যযন্ত্র যে সব বাদ্যযন্ত্র মানুষকে তার মূল কাজ থেকে সরিয়ে দেয়।

www.nagorikpathagar.org

মতিউর রহমান মল্লিক-এর
প্রিয় বিষয়াবলী

'নাবিক' সাহিত্যপত্রের পক্ষ থেকে গ্রন্থনা করেছেন

– ওমর বিশ্বাস

প্রিয়তম মানুষ	: হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।
প্রিয় লেখক	: ইমাম গাজ্জালী রহমাতুল্লাহ আলাইহে, ইমাম আবুল আলা রহমাতুল্লাহ আলাইহে, টলস্টয়, অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান
প্রিয় কবি	: আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, শেখ সাদী রহমাতুল্লাহ আলাইহে, ইকবাল, নজরুল, ফররুখ, সুকান্ত, আল মাহমুদ।
প্রিয় শিল্পী	: মরহুম আব্বাস উদ্দীন আহমদ, উম্মে কুলসুম, ইউসুফ ইসলাম, মেহদী হাসান, সোহরাব হোসেন, তফাজ্জল হোসেন খান, আবুল কাশেম, আবদুল্লাহ মাসুদ, আবদুর রহিম
প্রিয় আবৃত্তিকার	: শফি কামাল, চৌধুরী গোলাম মাওলা
প্রিয় উপস্থাপক	: হানিফ সংকেত, সাইফুল্লাহ মানছুর, নাসীর মাহমুদ, শিবলী সোহায়েল আবদুল্লাহ, শাহীন হাসনাত।
প্রিয় বক্তা	: সৈয়দ আলী আহসান, আবুল কালাম মুহম্মদ ইউসুফ, মতিউর রহমান নিজামী, মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, আবদুল কাদের মোল্লা, এ টি এম আজহারুল ইসলাম, আনোয়ার জাহিদ, সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী, আরিফুল হক, অধ্যাপক আবদুল গফুর, ড. এমাজউদ্দীন আহমদ, শফিউল আলম প্রধান, কবি আসাদ চৌধুরী, কবি আবদুল হাই শিকদার।

www.nagorikpathagar.org

প্রিয় সাহিত্যপত্রিকা সম্পাদক : আবদুল আজীজ আল আমান, কবি ফজল শাহাবুদ্দীন, অধ্যাপক খন্দকার আবদুল মোমেন, ডা. মুহাম্মদ নাসির উদ্দীন, কবি মোশাররফ হোসেন খান, কবি সাজ্জাদ বিপ্লব, খন্দকার আশরাফ হোসেন।

প্রিয় কথাশিল্পী : অধ্যাপক শাহেদ আলী, ডা. জামেদ আলী, মোহাম্মদ লিয়াকত আলী, সমরেশ মজুমদার, ডা. নাজিব ওয়াদুদ

প্রিয় সংগঠক : নুরুল হক, আবু নাসের মোহাম্মদ আবদুজ্জাহের, মীর কাসেম আলী, অধ্যক্ষ মাওলানা আবু তাহের, সিদ্দিক জামাল।

প্রিয় আমলা : শাহ আবদুল হান্নান, এ জেড এম শামসুল আলম, ড. মিয়া মুহম্মদ আইয়ুব

প্রিয় গবেষক : ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. কাজী দীন মুহম্মদ, আবদুল মান্নান তালিব, কবি হাসান আলীম, এ এস এম সিরাজুল ইসলাম, শাহাবুদ্দীন আহমদ, অধ্যাপক আবূ তালিব, অধ্যাপক আবদুল মা'বুদ।

প্রিয় ছড়াকার : কবি রুহুল আমীন খান, কবি সাজজাদ হোসাইন খান, কবি আহমদ মতিউর রহমান, কবি রফিক মুহাম্মদ, কবি ফয়েজ রেজা।

প্রিয় অনুবাদক : সৈয়দ আবদুল মান্নান, কবি আবদুস সাত্তার, সানাউল্লাহ নূরী, ফখরুজ্জামান চৌধুরী, আকরাম ফারুক, মোহাম্মদ মূসা, নাঈম মাহমুদ।

প্রিয় প্রতিভা : অধ্যাপক সালমান আল আযামী, কবি গোলাম মোহাম্মদ, কবি আবু তাহের বেলাল, শিল্পী গোলাম মাওলা, কবি ওমর বিশ্বাস , কবি আজাদ ওবায়দুল্লাহ, আবৃত্তিশিল্পী ওমর ফারুক, আতিয়া ইসলাম।

প্রিয় তারুণ্য : আহমদ বাসির, আফসার নিজামউদ্দীন, নিয়াজ শাহিদী, মুহম্মদ আবুবকর

প্রিয় সহকারী : নূরউদ্দীন মোহাম্মদ সাদেক হোসাইন, হাসান মুর্তাজা, শাহিদ মুবীন, আবদুল্লাহ হাদী, লতিফুল ইসলাম, নেয়ামতউল্লাহ।

প্রিয় সান্নিধ্য : মাওলানা মজিবুর রহমান, মাওলানা তালিবুর রহমান, মৌলভী ইব্রাহিম হাসান, অধ্যাপক হায়দার কবীর, কবি গাজী এনামুল হক, অধ্যক্ষ আবদুল গণি, মাহফুজুর রহমান আখন্দ, হাসান

www.nagorikpathagar.org

আখতার, শরীফ বায়জীদ মাহমুদ, মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম, আজিজুল হক মানিক, ডা. রেদওয়ান, আবদুল্লাহ আল আরিফ, আবু সাঈদ মুহম্মদ ফারুক, ফখরুল ইসলাম ভূইয়া, আবদুল্লাহিল হাদী, আজাদ আবুল কালাম, মুফতি আবদুস সাত্তার, কবি গোলাম মোস্তফা খান, ইয়াকুব বিশ্বাস।

প্রিয় নাট্যকার : আসকার ইবনে শাইখ, আ জ ম ওবায়েদুল্লাহ, আ স ম শাহরিয়ার, আহসান হাবীব খান।

প্রিয় অভিনেতা : আরিফুল হক, ওবায়দুল হক সরকার, খলিলুল্লাহ খান, আহমদ নাসিমুল হুদা নওশাদ, মুস্তাগিছুর রহমান, মাসুদ রানা।

প্রিয় সাংবাদিক : মোবায়েদুর রহমান, জয়নুল আবেদীন আজাদ, সালাহউদ্দীন বাবর, মাসুমুর রহমান খলিলী, গিয়াস উদ্দিন রিমন, শাহীন হাসনাত।

www.nagorikpathagar.org

[অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকার]

সব ভাষার আকর্ষণীয় সুরগুলিই আমাকে আকর্ষণ করে

আধুনিক বাংলা গানের ভুবনে কবি মতিউর রহমান মল্লিক একটি বিশিষ্ট ধারার প্রবর্তক। আধুনিক ইসলামী সঙ্গীত আন্দোলনের তিনি নকীব। ঐতিহ্যবাহী সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠীর তিনিই রূপকার এবং প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। দীর্ঘ তিন দশক যাবত তার সাধনা ও সৃষ্টির বিরাট অংশজুড়ে আছে ইসলামী গানের এক বিচিত্র ভুবন। কাব্যগীতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'গানের কথাকেই গানের সুরের দ্বারা পরিস্ফুট করিয়া তোলা এই শ্রেণির সঙ্গীতের মুখ্য উদ্দেশ্য।'

রবীন্দ্রনাথের আরেকটি মন্তব্যও কাব্যগীতির বৈশিষ্ট্য নির্দেশে তাৎপর্যপূর্ণ, 'এর উৎপত্তি সাহিত্যের ভূমিতে, সুরের আকাশে এর প্রকাশ।' মতিউর রহমান মল্লিক একজন কবি। আপাদমস্তক এই কবির সঙ্গীতের বাণীতে আমরা খুঁজে পাই কবিতারই উপাদান। তিনি নিজেই সুরকার, নিজেই কণ্ঠশিল্পী বলে তার ভাষা ও বাণী পেয়েছে ভিন্নতর কলকণ্ঠ। রবীন্দ্রনাথ, অতুল প্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, গোলাম মোস্তফা, নজরুল ইসলাম, আজিজুর রহমান, ফররুখ আহমদ, সিরাজুল ইসলামের পথ ধরে তিনিও বাংলা গীতিকাব্যের এক অনন্য নির্মাতা।

মতিউর রহমান মল্লিক গান লিখেছেন বিচিত্র বিষয় নিয়ে- হামদ, নাত, ইসলামী জাগরণমূলক গান, প্রার্থনাধর্মী গান, দেশাত্মবোধক গান, শিশুসঙ্গীত, লোকসঙ্গীত, নিসর্গবাদী গান, সংগঠন সঙ্গীতসহ বিচিত্র ভাব-ভাবনা ও বিচিত্র রীতি -নীতির গান।

তার সঙ্গীত রচনার প্রাথমিক জীবনে তিনি বহু সংখ্যক প্রেমের গানও রচনা করেন। তার রচিত গানের সংখ্যা কতো হবে এর কোনো সঠিক হিসাব নেই। তবে, আমাদের ধারণা এই সংখ্যা দুই হাজারের কাছাকাছি।

www.nagorikpathagar.org

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের জনপ্রিয়তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নাই। এক সময় তার গান শুধুমাত্র ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। কালক্রমে সেসব গান ছড়িয়ে পড়েছে বাংলার মুসলমানদের ঘরে ঘরে। মূলত যেখানেই বাংলা ভাষাভাষী মানুষেরা অবস্থান করেছে সেখানেই পৌছে গেছে তার গান। গানকে অবলম্বন করেই তিনি বৃটেন, ফ্রান্স, ভারতসহ বিভিন্ন দেশ সফর করেছেন।

ইসলামী জীবনাদর্শে বিশ্বাসী বলে তার সমস্ত রচনার মধ্য দিয়ে তিনি মূলত ইসলামী মানবিক জীবনবোধকেই প্রস্ফূটিত ও জাগ্রত করার চেষ্টা চালিয়েছেন। তবে ইসলাম যেহেতু একটি সার্বজনীন মানবিক আদর্শ সেহেতু সেই সার্বজনীন মানবিক আদর্শকে ধারণ করেই তার গান মানুষ ও মানবতার কল্যাণ চিন্তা থেকে উৎসারিত।

মতিউর রহমান মল্লিক একটি বিরলপ্রজ প্রতিভা, তার মধ্যে বহুত্বের বিকাশ ঘটেছে। তিনি কবি, গীতিকার, সুরকার, কণ্ঠশিল্পী, সাহিত্যিক, গবেষক, অনুবাদক, বাগ্মী, সংগঠক, সম্পাদক এবং একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অগ্রসেনানী। তাঁর এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন কবি আফসার নিজাম।

– আহমদ বাসির

■ **আপনার 'চলো চলো চলো মুজাহিদ' গানটি রচনার মুহূর্ত নিয়ে অনেক রকম কথা প্রচলিত রয়েছে, আমরা আপনার কাছে শুনতে চাই সে মুহূর্তটি সম্পর্কে।**

– আমি এক সময় বাগেরহাট মহকুমার সভাপতি ছিলাম, তখন মোল্লাহাট থানা ছাড়া আর সব থানাতেই সংগঠন ছিলো। মোল্লাহাট থানায় সংগঠন না থাকায় আমার নিজেরই খুব খারাপ লাগতো। এই কাজ অর্থাৎ মোল্লাহাট থানায় সংগঠন প্রতিষ্ঠার কাজটা কাউকে দিয়েই হচ্ছিল না। শেষে আমি নিজেই মরিয়া হয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করলাম।

এ সময়টা হচ্ছে ১৯৭৩ সম্ভবত। এই সময়ে সংগঠনের আর্থিক অবস্থা এতোটা খারাপ ছিল যে, অনেক সময় নদী পার হওয়ার জন্যে যে সামান্য কয়েক আনার দরকার হতো, তা সংগ্রহ করা সম্ভব হতো না।

তো মোল্লাহাটে বাগেরহাট থেকে পায়ে হেঁটেই রওয়ানা করলাম। রওয়ানা করলাম ভোর রাতে। কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং কয়েকটি এলাকা ঘুরে

www.nagorikpathagar.org

শিল্পী ফরিদী নুমানের মামার বাড়ি মোল্লাহাট থানা সদরের কাছাকাছি বড়গুণ গিয়ে পৌছলাম এবং সেখানেই সংগঠনের একটি শাখা কায়েম করা সম্ভব হলো। গাংনি থেকে আবার শুরু করলাম বাগেরহাটের দিকে যাত্রা। একটিও পয়সা নেই পকেটে, তখন কোনো পাকা রাস্তাও ছিলো না, মাইলের পর মাইল হাঁটছি। পেটে অসম্ভব ক্ষুধা, পা চলছে না। অথচ বাগেরহাট পৌছতে হবে।

মাইলের পর মাইল হাঁটছি আর ভাবছি একজন বিপ্লবী কোনো কিছুকেই তোয়াক্কা করতে পারে না। ক্ষুধা, জ্বালা-যন্ত্রণা কিংবা পথের দূরত্ব তার কাছে কিছুই না। এমনি এক প্রেক্ষাপটে ঐ 'চলো চলো চলো মুজাহিদ' গানটি রচিত হয়েছে।

■ **আপনার রচিত গানের সংখ্যা বর্তমানে কতো হবে?**

– এ পর্যন্ত আমার 'ঝংকার' নামে একটি গানের বই প্রকাশিত হয়েছে। আরও চার পাঁচটি বই ঐ ঝংকারের মতো প্রকাশ করা যায়। কিন্তু কে করবে? ঠিক সংখ্যা কতো এটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। গুণিনি তো।

■ **কি পরিমাণ গানে আপনি সুর দিয়েছেন?**

– বেশ কিছু গানে সুর দিয়েছি। কিন্তু এটারও সঠিক সংখ্যা বলা সম্ভব হচ্ছে না।

■ **আপনার একক অডিও এ্যালবাম বেরিয়েছে কয়েকটি। সেগুলো বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। কিন্তু পরবর্তিতে আপনাকে আর গাইতে দেখা যায় না কেনো?**

– নিজের ক্যাসেট নিজে বের করা আমার হয়ে ওঠে না এবং আমার ক্যাসেট বের করার মতো আগ্রহী কোনো প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে আমি দেখি না। তাছাড়া একটি ক্যাসেট বের করার জন্য যে পরিমাণ অর্থ আমার দরকার, সত্যিকার অর্থেই সে পরিমাণ অর্থ আমার নেই। ভিখারী হতেও ইচ্ছে করে না।

■ **রবীন্দ্র-নজরুলোত্তর বাংলা গানে একক ধারা সৃষ্টি করতে আর কোনো কবিকে আমরা দেখি না, আপনিই একমাত্র। কিন্তু এই ধারাটিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য গান রচনায় আপনার গতিশীল তৎপরতা আমরা লক্ষ্য করি না কেনো?**

– দেখ, একটি ধারা তৈরি করা ছেলে খেলা নয়। এটা আমি বলব না যে, আমি একটি ধারা তৈরি করেছি। বর্তমানে একটু বেশি লেখারই চেষ্টা করছি। একজন গীতিকারের পরিচিতি নির্ভর করে তার গানের প্রচারের ওপর, তার গানের শিল্পীর ওপর। এক সময় আমার গানের প্রচারও ছিল, শিল্পীও ছিল।

www.nagorikpathagar.org

আগের মতো আমার গানের প্রচারও নাই, শিল্পীও নাই। এক সময়তো নিজের গান নিজেই গাইতাম। এখন নানা কারণে সেটাও হয়ে ওঠে না। যে কাজটি কখনো করিনি সেই কাজটি করার চিন্তা ভাবনা করছি– আমি কেবল আমার গানই শেখাবো এখন থেকে এবং তাকেই শেখাবো সত্যিকার অর্থেই যে আমার গান শিখতে চায়।

■ **রোদের ভেতর ইলশে গুড়ি'র মতো নিসর্গপ্রাণ গান আপনি আর লেখেন না কেন?**

– আবারও লিখবো ইনশাআল্লাহ।

■ **'উত্তাপে উজ্জ্বল রক্তিম সময়ের কপোত উড়াই'র মতো দুর্বোধ্য গান রচনা করতে গেলেন কেনো?**

– হ্যাঁ, সুন্দর একটি প্রশ্ন। আসলে আমরা তো গান গাইতে গিয়ে কখনো বাজনার তোয়াক্কা করিনি। ফলে সবসময়ই কিছু সংখ্যক লোক তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছে আমাদেরকে। মোল্লা মুন্সি বলে উড়িয়ে দিয়েছে আমাদের আন্তরিকতাকে। ঐ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য এবং অবজ্ঞাকারী লোকদের জন্যই 'উত্তাপে উজ্জ্বল রক্তিম সময়ের কপোত উড়াই'-এর মতো গান লেখার প্রচেষ্টা আমাদের ছিলো। এসব গানের মধ্য দিয়ে আমরা বোঝাতে চেয়েছিলাম মোল্লা-মুন্সিরাও অনেক কিছু পারে এবং ভালোভাবেই পারে।

■ **সুর করেন কিভাবে?**

– কি করে সুর করেন–এর উত্তরে একদা সুরকার আবদুল আহাদ বলেছিলেন 'যখনই কোনো একটি গানের সুর করার উদ্যোগ আমি নিই তখন সেই গানটি অনেক সময় আমি আমার সঙ্গে রাখি। বাইরে গেলে সঙ্গে রাখি, বাজারে গেলেও সঙ্গে রাখি এবং আমি কখনো কখনো মনে মনে গুনগুনিয়ে সেই গানের একটি সুর নির্ধারণ করি। তারপরে আমি সেটার একটি স্বরলিপি দাঁড় করাই।' আসলে গান আগে না সুর আগে, সুর আগে না গান আগে তাই নিয়ে বিতর্কের অবধি নেই। আমি একটি গানের সুর কখনো আগে দাঁড় করিয়ে ফেলি তার পরে গান লিখি আবার কখনো আগে গান লিখে পরে সুর করি। এবং আমি আমার মতো করেই সুর করি।

■ **কোন্ কোন্ ভাষায় সুর আপনাকে প্রভাবিত করেছে? সেই সব সুরে আপনি কোনো গান রচনা করেছেন?**

– সব ভাষার আকর্ষণীয় সুরগুলোই আমাকে আকর্ষণ করে। তবে, আরবি গানের সুর আমাকে অধিকতর আলোড়িত করে, কেননা আধুনিক আরবি গানের সুর হচ্ছে অকৃত্রিম আরবি সুর ও স্প্যানিস সুরের মিশেল। যে কারণেই

www.nagorikpathagar.org

আরবি গানে এমন একটি গতি আছে যে গতি কোনো হাতিয়ারকে তোয়াক্কা করে না। কাওয়ালী এবং গজল আমাকে গভীরভাবে টানে। গভীরভাবে টানে চীনা গণসঙ্গীত এবং আধুনিক বিপ্লবী ফার্সিগান। এইসব গানের সুর কাজে লাগাবার ইচ্ছে আমার সবসময়ই ছিল।

■ **আব্বাস উদ্দীনের মতো গায়করা যখন বাদ্য ছাড়া গান গাইতেন না তখন আপনাদের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করতে বাধা কোথায় ছিলো? কোথায় আছে?**

– বিষয়টা নিয়ে সত্যিই ভাববার দরকার আছে। আমি মনে করি, যেখানে বাজনার প্রয়োজন নেই, সেখানে বাজনার প্রয়োজন নেই। যেখানে বাজনার প্রয়োজন আছে সেখানে বাজনার প্রয়োজন আছে।

■ **আপনার 'সারা বাংলার গ্রামে গঞ্জে' গানের সুরটা কিভাবে এসেছে?**

– এ গানটির সুর আমিই করেছিলাম। সুরটা কোন প্রচেষ্টা ছাড়াই আমার মধ্যে এসেছিলো।

■ **'ধৈর্য ধারণ করার শক্তি দাও গো মেহেরবান' গানটি শুনলে মনে হয় খুবই কষ্ট ও যন্ত্রণা থেকে এটি লিখেছেন?**

– এ গানটি আসলে গাইতে গাইতে লেখা। ঢাকার বাইরে কোথাও সফরে যাচ্ছিলাম। মনে মনে এভাবেই দোয়া করতে করতে গানটি তৈরি হয়েছে। কষ্ট ও যন্ত্রণার কথা বলছো। সেটা ছিল। সাংস্কৃতিক আন্দোলন করতে গিয়ে আমাদেরকে অনেক বিরূপ পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছে। আমাদেরই কিছু ভাইয়ের নানা কথাবার্তা ও আচরণে মনটা ভারাক্রান্ত ছিলো। এই গানটি দিয়ে সেটা ভারমুক্ত করেছি।

■ **সর্বস্তরের মানুষের কাছে আপনার গানের যে মূল্যায়ন হয়েছে, এতে আপনি কতখানি তৃপ্ত?**

– এটা আমার জন্য সৌভাগ্য, আমি গানের মধ্য দিয়ে মানুষের চৈতন্যকে আন্দোলিত করতে চেয়েছি। চেয়েছি আল্লাহর সন্তোষ অর্জন করতে। আমার এই চাওয়া হচ্ছে একটি মৌলিক চাওয়া। এই চাওয়ার সঙ্গে অন্য কোনো পাওয়া একীভূত হলে আমি মনে করি সেটা আল্লাহর দয়া ছাড়া অন্য কিছুই নয়। আল্লাহ হয়তো তাঁর এক বান্দাকে দিয়ে অন্য এক বান্দার সম্মান এবং মর্যাদাকে বৃদ্ধি করতে চেয়েছেন।

www.nagorikpathagar.org

মুখোমুখি মতিউর রহমান মল্লিক

বিষয়: কবিতা ও চিত্রল প্রজাপতি

২০০৭ সালে কবির চতুর্থ কবিতার বই 'চিত্রল প্রজাপতি' প্রকাশিত হয়। সেই সময়ই এই বইটিকে কেন্দ্র করে কবির একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার পরিকল্পনা করি আমরা কয়েকজন। কবি তাজ ইসলামের সম্পাদনায় 'উৎসঙ্গ সৃজন চিন্তন' থেকে 'স্বরশব্দ' নামে একটি সাহিত্যপত্র প্রকাশ করা হচ্ছিলো। এই সাহিত্যপত্রটির তৃতীয় সংখ্যায় সাক্ষাৎকারটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয়।

পরিকল্পনা অনুযায়ী কবি আফসার নিজাম, কবি শাহাদাৎ তৈয়ব, সম্পাদক তাজ ইসলাম ও আমি কল্যাণপুরের প্রত্যাশা প্রাঙ্গণে কবির অফিস কক্ষে বসে সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করি। 'স্বরশব্দ' সাহিত্যপত্রের পরিসর ছিলো ছোট। ফলে আমার তৈরি প্রশ্নমালাটিও ছিলো ছোট। কিন্তু কবির সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে অনেক কথাই বেরিয়ে এসেছিলো। রেকর্ডে ধারণ করা সাক্ষাৎকারটি লিপিবদ্ধ করেছিলো কবি শাহাদাৎ তৈয়ব। সাক্ষাৎকারটি বেশ দীর্ঘ হওয়ায় স্বরশব্দের তৃতীয় সংখ্যাটি বর্ধিত কলেবরে প্রকাশের চিন্তা করি আমরা। সে অনুযায়ী সাক্ষাৎকারটি কম্পোজও করা হয়েছিলো, যদিও দীর্ঘ দশ বছরেও 'স্বরশব্দ' আর প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। এমনকি সাক্ষাৎকারটি অন্য কোথাও প্রকাশ করারও সুযোগ হয়নি। এটি সম্পাদক তাজ ইসলামের নিকট সযত্নে সংরক্ষিত ছিল।

– আহমদ বাসির

www.nagorikpathagar.org

■ **কবি আল মাহমুদ আপনার কবিতার ব্যাপারে প্রায়ই উচ্ছ্বসিত মন্তব্য করে থাকেন। সৈয়দ আলী আহসানের মতো কবিপণ্ডিতও আপনার কবিতার ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন বলে আমরা জানি। তবুও আপনি, খুব কমই কবিতা লিখে থাকেন। আপনার কাব্যগ্রন্থও খুব কম। এর কারণটা বলবেন?**

– চমৎকার একটি প্রশ্ন। এই প্রশ্নের জন্য আমি শাহাদাৎ তৈয়ব তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। তার সঙ্গে আহমদ বাসির, আফসার নিজাম, সম্পাদক তাজ ইসলামকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। সেই সঙ্গে পাঠকের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ আমার পক্ষ থেকে থাকলো।

আল মাহমুদ ভাইয়ের আমার কবিতা সম্পর্কে মন্তব্য, তার আগে সৈয়দ আলী আহসান স্যারের আমার কবিতা সম্পর্কে আগ্রহের জন্যে আমি সত্যিই সৌভাগ্যবান। একেবারে সত্যিই আমি সৌভাগ্যবান। সৈয়দ আলী আহসান স্যারের আগ্রহ আমার কবিতা সম্পর্কে তাঁর জীবদ্দশায়ই লক্ষ্য করেছিলাম। তাঁর ইন্তেকালের বছর খানেক আগে তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, মল্লিক তুমি তোমার কবিতার বইগুলো আমাকে একটু দাও, আমি দেখি। তো আমি ছিলাম... এবং আমি এখনও আমার ব্যাপারে ভীরু এবং লাজুক। অনেক চিন্তাই করেছিলাম সৈয়দ আলী আহসান স্যার আমার বইগুলো চাওয়ার কারণে। প্রথম চিন্তা করেছিলাম যে, স্যারের মতো বিশাল এক পণ্ডিত আমার কবিতাগুলো দেখবেন আর ভুলত্রুটিগুলো বের করবেন। আমাকে হয়তো বকবেন। আমার জন্য এটা বড় ধরনের একটা লজ্জার বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। তার চেয়ে থাক, কবিতার বই অনেক পরে দিলে হবে। এভাবে আমি একটি চালাকির পথ অবলম্বন করেছিলাম। আসলে চালাকির পথ যে সর্বনাশের পথ হতে পারে সেটা আমি এই ঘটনার থেকেই উপলব্ধি করেছি। সব ব্যাপারে চালাকি হয়তো মানুষ করতে পারে কিন্তু নিজের সৃষ্টির ব্যাপারে এবং নিজের প্রধান কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে চালাকি করা ঠিক নয়। যাই হোক, একদিকে ছিলো ভয়, আরেকদিকে ছিলো লজ্জা। এই দু'টি কারণে আমি স্যারকে বই দেইনি। কিন্তু স্যার যখন আবদুল হাই শিকদার ভাইয়ের উপর চমৎকার একটি প্রবন্ধ লিখলেন তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, স্যারকে যদি বইগুলো সময় মতো দিতাম তাহলে আমার উপরে স্যারের হাত দিয়ে একটি প্রবন্ধ বের হয়ে আসতো। এটা আমার জন্য খুব কল্যাণকর হতো। তো এই চিন্তাটা যখন আমার মাথায় এসেছিলো তখন আমি আমার বইগুলো স্যারকে দেয়ার জন্য চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কেনো যেনো এই দেই, এই দেই করে করে আমার আর দেয়া হয়নি। আজকে খুব দুঃখ লাগে যে, আমাদের রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমি একটা লেখা উদ্ধার করতে পারলাম না।

www.nagorikpathagar.org

আমি সৈয়দ আলী আহসান স্যারকে আমাদের রবীন্দ্রনাথই বলি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমি সৈয়দ আলী আহসান স্যারকে রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বড় মাপের পণ্ডিত বলে মনে করি। এটা আমার ব্যক্তিগত বিষয়। এটা আমি কারো ওপর চাপিয়ে দিতে চাই না।

আর আল মাহমুদ ভাইয়ের প্রসঙ্গ যখন আসে তখন আমি স্বাভাবিকভাবেই আপ্লুত হয়ে যাই। আমি আমার জীবনে কখনও আল মাহমুদ ভাইয়ের কাছ থেকে আমার ব্যাপারে কোনো লেখা উদ্ধারের চেষ্টা করিনি। অসম্ভব রকম আমি আল মাহমুদ ভাইকে কবি হিসেবে শ্রদ্ধা করি, মানুষ হিসেবে ভালোবাসি এবং আমি তাঁকে খুব বড় মাপের কবি বলে মনে করি। এটাও আমার ব্যক্তিগত বিষয়। এটাও আমি কারো ওপর চাপিয়ে দিতে চাই না।

আল মাহমুদ ভাইয়ের প্রসঙ্গ যখন আসে, তখন আমি স্বাভাবিকভাবেই আপ্লুত হয়ে যাই। আমার কেনো যেনো একটি বিশ্বাস জন্মেছে, ২০০২ সালে ফ্রান্স থেকে আসার পরে বিশ্বাস জন্মেছে যে, আল মাহমুদ ভাইয়ের মাধ্যমে হয়তো সাহিত্যিক নোবেল পুরস্কার আমরা দখল করতে পারতাম। ড. ইউনুস যখন নোবেল পুরস্কার পেলেন, তখন কিন্তু আমি খুশি হয়েছিলাম। এই জন্য যে, আমাদের ভেতর থেকে কেউ একজন নোবেল পুরস্কার পেল। ড. ইউনুস, কোন ধরনের মানুষ এগুলো আমি আবিষ্কার করার চেষ্টা করিনি, অন্তত নোবেল প্রাইজের ক্ষেত্রে। আর ড. ইউনুস যখন নোবেলপ্রাইজ পেয়েছিলেন... আল মাহমুদ ভাইয়ের যে যোগ্যতা আছে সে যোগ্যতার পরিধিটা ড. ইউনুসের চেয়ে অনেক অনেক বেশি। কিন্তু যা হয়ে থাকে আমাদের দেশে সেটা হলো, আমরা প্রতিভাকে তুলে ধরতে পারি না। যাই হোক, যে কোনো কারণেই হোক, আমি আল মাহমুদ ভাইয়ের প্রচণ্ড অনুরাগী, তার কবিতার অনুরাগী, তার মানসিকতার অনুরাগী, তার বিশ্বাসের অনুরাগী, তার শক্তির অনুরাগী, তার অসাধারণ কাব্যগুণের অনুরাগী এবং আমি আমার বন্ধু-বান্ধবদের সবসময় বলে থাকি যে, আল মাহমুদ ভাইকে যে আমরা আমাদের সময়ে পেয়েছি, এটা আমাদের পরম সৌভাগ্য এবং আরও একটি বিশ্বাস আমার ভিতরে কাজ করে সেটি হলো, কবি আল মাহমুদ ভাইয়ের একদিন ইন্তেকাল হবে, সবারই ইন্তেকাল হয় এবং আমার একটি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, কবি আল মাহমুদ ভাইয়ের কাজের মধ্যে লেখার মাধ্যমে বিশ্বাসের অধিষ্ঠান আছে। যে আধুনিক কাব্যবোধ অথবা আধুনিক কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে নাট্যময়তা, এই নাট্যময়তার কারণেই একদিন আল মাহমুদ ভাই বাংলাসাহিত্যে জীবনানন্দের চেয়েও বেশি উচ্চারিত হবেন। এ ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আমরা যেমন কবি রবীন্দ্রনাথের কথা উচ্চারণ করি, তেমনি একদিন আল মাহমুদও অপরিহার্য হয়ে যাবেন।

www.nagorikpathagar.org

এসব বড় মাপের মানুষদের আমার কবিতার প্রতি আগ্রহ দেখে আমি অবাক হয়েছি। আমি আজও এটা আবিষ্কার করতে পারিনি যে, আমার কবিতার প্রতি তাদের এই যে আগ্রহ, এই আগ্রহ কেনো? আমি কোনোদিন জিজ্ঞেস করিনি। আমার ঐ স্বভাবসুলভ ভয়ের কারণে এবং লজ্জার কারণে। তবে একটি কথা আমি এখানে স্পষ্ট করে বলতে চাই, কথা হলো কবিতা লেখার ক্ষেত্রে আমি কখনও কৃত্রিমতার আশ্রয় নিইনি। আমি খারাপ লিখি বা ভালো লিখি, আমি যখন কবিতা লিখতে বসি বা সাহিত্যচর্চা করতে বসি, তখন আমি খুব মনোযোগের সাথে সেটা করার চেষ্টা করি।

■ **মল্লিক ভাই, কৃত্রিমতা বলতে কী বোঝাতে চাচ্ছেন?**

– যে কাজটা যেভাবে করার জন্য যতোটা চেষ্টা করা দরকার ততোটা চেষ্টা না করা। আমি একটি ফুল আঁকছি– আমার যতোটুকু শক্তি আছে, এই শক্তিটুকুকে আমি যদি সম্পূর্ণভাবে উজাড় করে না দেই তাহলে আমার যে শক্তি সেই শক্তির সঙ্গে একটি ব্যবধান তৈরি করলাম আমি। যেখানে প্রতিভা এবং শক্তির মধ্যে ব্যবধান তৈরি করা হয়, আমি এই ব্যবধান তৈরি করার বিষয়টাকেই কৃত্রিমতা বলি। যেমন তুমি শাহাদাৎ তৈয়ব ভালো কবিতা লেখ। তুমি ১০টি কবিতার একটি পাণ্ডুলিপি তৈরি করলে, ১০টি কবিতা তুমি লিখলে, ১ দিনের মধ্যেই ১০টা পত্রিকায় তুমি এই কবিতাগুলো ছেপে দিলে। এখন ১ দিনের মধ্যেই ১০ টি কবিতা লেখা সম্ভব। তুমি যখন কবিতা লিখলে তখন ১০ টি কাগজে কবিতা দেয়ার তাড়া যদি তোমার মধ্যে থাকে এবং সে তাড়ার কারণে যদি কবিতার যে দাবি সে দাবি পূরণ না করো তাহলে এই প্রচেষ্টার সঙ্গে কৃত্রিমতা জড়িয়ে গেলো বলে আমার বক্তব্য। নিশ্চয়ই কৃত্রিমতা সম্পর্কে তুমি যেভাবে ধারণা রাখ, আমার চেয়েও বেশি ধারণা রাখো। আর এখানে তো আহমদ বাসির আছে, তারপরে আফসার নিজাম আছে এ সময়ে খুব ভালো কবিতা লিখছে। তাজ ইসলাম আছে, ওর ছড়া খুব শক্তিশালী ছড়া। তো এই ব্যাপারে আমি আর বিশ্লেষণে যেতে চাই না। আমি আমার কবিতা লেখার ক্ষেত্রে, আমি আমার গান লেখার ক্ষেত্রে, আমি দু'চারটা প্রবন্ধও লিখেছি, কখনো কখনো কোনো গান আমি মুখে মুখে রচনা করেছি, কখনো কখনো কোনো প্রবন্ধ আমি মুখে মুখে বলেছি আফসার নিজাম সেটা টাইপ করেছে, আর একেকটি বাক্য আমি তাকে বারবার পড়তে বলেছি। সুতরাং আমি যেখানে মৌখিকভাবে কিছু রচনা করেছি সেখানেও আমি অকৃত্রিম থাকতে চেষ্টা করেছি। কৃত্রিমতার আশ্রয় নেইনি। আজও আমি যতোটুকু যা করি তা যথাযথভাবে করার চেষ্টা করি। চর্চার ক্ষেত্রে এটা আমার একটা স্বভাব।

www.nagorikpathagar.org

আমি তোমাদের মূল প্রসঙ্গের আগে এই পটভূমিটি উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করি। কেননা, তোমরা আমাকে যেভাবে জানো, সব পাঠক হয়তো সেভাবে জানে না। আমি যে কথাটি বলতে চাইছি, সেটি হচ্ছে, আমি যে বিষয়টি ভালো জানি, আমি লেখালেখির ক্ষেত্রে সে বিষয়টিকে প্রধান্য দেই। আমি যে বিষয়ে ভালো জানি না সে বিষয়ে আমি লিখতে যাই না। কখনো কখনো আমাকে হয়তো ফরমায়েশি লেখা লিখতে হয়। হয়তো ফরমায়েশি লেখাটি লিখতে গিয়ে দেখা গেলো সে বিষয়ে আমি অনেক কিছু জানি না। তারপরও আমাকে লিখতে হয়। তোমরা নিজেরাই সাক্ষ্য দেবে যে, তোমাদেরও এ কাজটি করতে হয়। তোমাদের কাছেও বহু লোক আসে লেখা নিতে। সবসময়ে কিন্তু যে মনোযোগ দিয়ে লিখতে চাও সে মনোযোগে লিখতে পারো না। যে লেখাটা লেখার জন্য বিপুল পরিমাণে পড়াশোনা করা দরকার সে পড়াশোনা তো তুমিও করতে পারো না। আমি সবসময় চেয়েছি যে, আমি যা জানি সে বিষয় নিয়েই যেনো লিখতে পারি। যে বিষয়টি আমি জানি সে বিষয়ে যে মনোযোগের কথা বলেছি ঐ মনোযোগটা থাকে। সে জন্যই লেখালেখির ক্ষেত্রে আমি জানাজানিটাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি। সেজন্য আমার কবিতা যাদের ভালো লাগে তাদের ভালো লাগার ব্যাপারে হয়তো এ বিষয়গুলো থাকে। সেজন্য জিজ্ঞেস না করলেও বুঝতে পারি, এ ব্যাপারটি হয়তো আল মাহমুদ ভাইয়ের চোখে পড়েছে, সৈয়দ আলী আহসান স্যারের চোখে পড়ে থাকবে। যারা আমার কবিতার সত্যিকারের পাঠক তারা হয়তো ব্যাপারটি উপলব্ধি করে থাকবে। আমি কিন্তু এ কথাটি বলিনি যে, আমি যে দুটি বিষয় এখানে উত্থাপন করলাম এই দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই আমার কবিতার প্রতি সৈয়দ আলী আহসান স্যার, কবি আল মাহমুদ ভাই আগ্রহী হয়েছেন। এটা আমার একটা আন্দাজ।

■ **সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'চিত্রল প্রজাপতি'সহ এ পর্যন্ত আপনার চারটি কবিতার বই বেরিয়েছে। কিন্তু এর কোনো একটি গ্রন্থও সম্ভবত আপনার একান্ত পরিকল্পনায় প্রকাশিত হয়নি। এর কারণ কি?**

– তোমাদের যে মূল প্রশ্ন, আমি এখন সেখানে আসতে পারি। আসলে কবিতা লেখার ক্ষেত্রে আমি যতোটা মনোযোগী, কবিতা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আমি আগোগোড়াই ততোটা অমনোযোগী। আমার কবিতা আমি সংরক্ষণ করতে পারি না। আরেকটি স্বভাবের খবর হয়তো জানো। আমার যারা ক্লাসমেট, যাদের সাথে আমি পড়াশোনা করেছি; সে মাদরাসার হোক, সে কলেজের হোক, ইউনিভার্সিটিতে হোক; যেখানেই হোক না কেন, আমি যাদের সাথে বড় হয়েছি কিম্বা আল্লাহর পথে গিয়ে যাদের সাথে ওঠা-বসা করেছি, এখনো

www.nagorikpathagar.org

পর্যন্ত ওঠা-বসা করছি, সাহিত্যের অঙ্গনে কাজ করতে গিয়ে আমি যাদের সঙ্গে ওঠা-বসা করেছি, প্রতিদিন কিম্বা আমার বিভিন্ন কাজের সময়ে তাদের সবাইকে আমি মনে করি, তাদের জন্য আমার মনটা কেঁদে ওঠে। হয়তো আমার সেই বন্ধু-বান্ধবরা, আমার আত্মীয়-স্বজনরা কেউ আমেরিকায়, কেউ ইউরোপে, কেউ অস্ট্রেলিয়ায় সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে আছে। আমি যে পথের, যে আদর্শের পথিক সে আদর্শের সহযাত্রীরা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে আছে। সবাইকে আমার মনে পড়ে কিন্তু আমি কারো সঙ্গে চিঠির যোগাযোগ করতে পারি না। মোবাইলের যুগে মোবাইলে যোগাযোগ করতে পারি না। তাদের সবার জন্য আমার প্রাণ কাঁদে।

তো অনেকটা এরকমই আমি আমার কবিতাগুলোও সংরক্ষণ করতে পারিনি। আমার মনে পড়ে আমি নিজে কিছু কবিতা বাছাই করে দিয়েছিলাম আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থের জন্য। আমার হাতে তখন কিছু কবিতা ছিলো ওগুলো দিয়েই আমার প্রথম কবিতার বই বের করি। ঐ কবিতার বইয়ে যে কবিতাগুলো আছে সে কবিতাগুলো ছিল সদ্যপ্রসূত। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের আগে আমি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছাপানো আমার কবিতা বাছাই করতে থাকি। এরপরে দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ বের হয়। এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কবি আহমদ বাসির, কবি আফসার নিজাম, কবি রেদওয়ানুল হক শ্রম দিয়েছে। তারপর কবি নাঈম মাহমুদ শ্রম দিয়েছে 'অনবরত বৃক্ষের গান'-এ। তারপর তৃতীয় যে কাব্যগ্রন্থ 'তোমার ভাষায় তীক্ষ্ণ ছোরা' এই নামটাও আমার নয়। এই নামটা দিয়েছেন কবি গবেষক আবদুল মান্নান তালিব। আর এ তৃতীয় কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতাও আমার বাছাই করা না। আমি এর প্রুফ পর্যন্ত দেখিনি। কবি আফসার নিজাম, কবি আহমদ বাসির, কবি রেদওয়ানুল হক– এরাই বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি করে বাংলা সাহিত্য পরিষদ থেকে ছাপানোর ব্যবস্থা করেছে। আমি কিছুই জানতাম না।

ছাপানোর পরে আমাকে কয়েকটি কপি দেয়া হয়। এরপর 'চিত্রল প্রজাপতি' টায় আমি একটু মনোযোগ দিয়েছিলাম। রেদওয়ানুল হক, আহমদ বাসির, আফসার নিজাম এরাই মূলত কবিতাগুলোকে বাছাই করেছে। আমি দু'একটা কবিতা বাদ-সাদ দিয়ে একটু পরিষ্কার করতে চেয়েছি। আমি আশা করছি যে, পরবর্তী পঞ্চমতম যে গ্রন্থটি বেরোবে সেটা গানের বই হোক বা কবিতার বই হোক আমি আগের তুলনায় বেশি নজর দেবো। বেশকিছু কবিতা বাছাই হয়ে আছে এবং কম্পোজও হয়ে আছে। এগুলো ঐ যেসব কবিদের নাম বলেছি, যারা আমার পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের ব্যাপারে সহযোগিতা করছে, তারাই এগুলো করছে। আমি কবুল করছি যে, কবিতা সংরক্ষণের ব্যাপারে আমি ধারাবাহিক মনোযোগ দিতে পারিনি। কিন্তু আমি মনোযোগ না দিলেও

www.nagorikpathagar.org

অনেকেই মনোযোগ দিয়েছে। সুতরাং আমাকে শুধু অভিযুক্ত করলে তো হবে না। যদি বলা হয় যে, আমি কোনো রকমের মনোযোগ দিইনি, কবুল করে নিলাম যে আমি মনোযোগ দিইনি কিন্তু কেউ কেউ তো মনোযোগ দিয়েছে। সুতরাং আমার কাব্যগ্রন্থ তৈরি করার পেছনে আমার মনোযোগ কম থাকলেও ভালো ভালো কবিদের মনোযোগ নিঃসন্দেহে আছে।

■ **গীতলতার জন্য আল মাহমুদ আপনাকে হাইনরিশ হাইনের সাথে তুলনা করেছেন। কোন কোন সমালোচক আপনার প্রকৃতি ঘনিষ্ঠতাকে রবার্ট ফ্রস্টের সাথেও তুলনা করেছেন। আপনার কবিতার এ দুটি অমূল্য বৈশিষ্ট্যকে আপনি কিভাবে দেখেন?**

– এই যে দু'টো বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে এটা আমার জন্য পরম সৌভাগ্য এবং এ দুটো বিষয় যখন আমার সামনে উত্থাপিত হচ্ছে আমার ভিতরে তখন কান্না জমা হচ্ছে। এতো বড়ো পাওয়া, এটা কল্পনার বাইরে। আর এই পাওয়াটা আমাদের সময়ের বড় বড় মনীষীদের বক্তব্যে পাওয়া তো এককথায় বলতে পারি যে, এটা আসলে একটা অসম্ভব ব্যাপার, যেটা আমি কল্পনাও করিনি। তবে এই মুহূর্তে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের একটি কথা আমার মনে পড়েছে– যে কথাটি তিনি কুরআনে কারীমের মধ্যে, সর্বশ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থের মধ্যে বলে দিয়েছেন– ইন্নাল্লাহা লা ইয়ুদ্বীয়ু আজরাল মুমিনীন– নিঃসন্দেহে আল্লাহ মুমিনদের কোন কাজকে ধ্বংস করেন না। এই প্রত্যয় এবং প্রতীতি আমি সারাজীবন আমার বুকে পোষণ করেছি। এই প্রত্যয় এবং প্রতীতি আমাকে কাজ করার ক্ষেত্রে সুদৃঢ় করেছে। আমি ব্যথা পাই কিন্তু হতাশ হই না।

একটি কথা এখানে তোমাদের প্রশ্নের মধ্যে এসেছে– আমার কবিতার মধ্যে গীতলতা আছে। এটা স্বাভাবিকভাবেই এসেছে বলে আমি মনে করি। ছোটবেলা থেকেই আমি গান খুব পছন্দ করি। বিপুল পরিমাণ গান আমি শুনেছি। হাজার হাজার... লক্ষ লক্ষ... গান শুনেছি বলা যায়। ছোটবেলায় সেই বারো/তেরো বছর বয়সে আমাদের বাড়িতে রেডিও ছিল। আমার বড় ভাই অনেক বড় কবি, এলাকায় কবি সাহেব বললেই সবাই তাঁকে চেনে। হয়তো অনেক দিন পরে গ্রামের বাড়িতে গেলাম। অনেক বুড়ো একজন লোক, চোখে ভালো দেখেন না– আমাকে জিজ্ঞেস করেন– কে যায়? আমি তখন বলি যে, আমি কবি সাহেবের ছোট ভাই। তো এই অসাধারণ পণ্ডিত বড় ভাইকে আমি পেয়েছিলাম। তিনি এক বিশাল লাইব্রেরি করেছিলেন আমাদের বাড়িতে। বিশাল লাইব্রেরি– রবীন্দ্রনাথ আছেন, জীবনানন্দ দাশ আছেন, যেখানে বাংলাসাহিত্যের এমন কেউ নেই যাদের বই নেই। বিশ্বসাহিত্যের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বইপত্র আছে।

www.nagorikpathagar.org

আমি তো বলে থাকি, রবীন্দ্রনাথ পড়া হয়ে গেছে আমার বারো বছর বয়সে, পুরো রবীন্দ্রনাথই আমার পড়া হয়ে গেছে, জীবনানন্দ দাশ পড়া হয়ে গেছে, বঙ্কিমচন্দ্র পড়া হয়ে গেছে, নজরুল পড়া হয়েছে, ফররুখকে পড়েছি, আরো পরে আল মাহমুদকে পড়েছি, আরো পরে এমনকি আমি শামসুর রাহমানকে ভালো করে পড়েছি, সৈয়দ শামসুল হককে ভালো করে পড়েছি এবং তসলিমা নাসরিনকেও আমি প্রচণ্ডরকম করে পড়েছি। কারণ একজন কবিকে চিনতে হলে তার কবিতাকে চিনতে হয়, সে কেমন তা চেনার জন্য তার লেখা অবশ্যই আমাকে পড়তে হবে। আমি আমাদের দেশের যারা ঔপন্যাসিক; সেই শওকত ওসমান, সেই চিলেকোঠার সেপাই, জাঁদরেল এক ঔপন্যাসিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এদের সবার লেখাই আমি পড়েছি। এদের আমি কাকে পছন্দ করি আর না করি, বিশ্বাসের দিক থেকে সেটা স্বতন্ত্র ব্যাপার। কিন্তু পড়াশোনার ব্যাপারে আমি কাউকে বাদ দেই না। একটা কথা বলতেই হবে যে, এ সময় যেমন আল মাহমুদ ভাই আমার প্রচণ্ড আবেগের কবি, ভালোবাসার কবি; তেমনি সুকান্তও আমার এক অসাধারণ ভালোবাসার কবি। সুকান্তকে পড়তে পেরেছি বলেই আমি আমার কবিতার মধ্যে বৈপ্লবিক ধারাকে আমার মতো করে লিখেছি। সুতরাং সুকান্তের আদর্শকে আমি কতো টুকু ভালোবাসি, পড়াশোনার ক্ষেত্রে আমি মোটেই তা পছন্দ করি না। আমি প্রাধান্য দিই বাংলাসাহিত্যের সমস্ত লেখকগণকে লেখাপড়ার ক্ষেত্রে। তো যে প্রশ্নটা এসেছে সেই প্রশ্নটা হলো আমার কবিতায় গীতলতা এসেছে। এটা কিন্তু আমার ইচ্ছাকৃত কোনো ব্যাপার নয়, ছোটবেলা থেকেই আমি গানকে পছন্দ করেছি আর আমি সাহিত্যের জগতে এসেছি গান লিখতে গিয়ে। আমার যখন এগারো কি দশ বছর বয়স তখনই আমার প্রেমের গান, একেবারে কাঁচা প্রেমের গান বিভিন্ন কলেজে বিভিন্ন শিল্পীরা গেয়েছে। সেজন্য আমি গান ভালোবেসে গান লেখা শুরু করেছিলাম। অসংখ্য গান শুনতে শুনতে আমি গানের জন্য পাগল হয়ে গিয়েছি। পরে এক সময় দেখি যে আমার হাত দিয়ে গান বেরুচ্ছে। যদিও আমার প্রথম লেখা ছড়া। ছড়া লেখার পর আমি গানের মধ্যে প্রবেশ করেছি। ঐ দু'একটা ছড়া না লিখলে আমি বলতে পারতাম না আমার সাহিত্য জীবনের শুরু হয়েছে, কাব্য জীবনের শুরু হয়েছে। গানের মধ্য দিয়ে আরো একটি কথা না বললেই নয়। আমার আব্বা কবি ছিলেন এবং আমার আব্বা অসাধারণ জারী লিখতেন। আর আমার চাচা ছিলেন অসাধারণ সুন্দর একটা মানুষ। রোগাক্রান্ত আমার চাচাকে দেখেছিলাম। ইরানীদের চেয়েও সুন্দর মনে হয়েছে আমার কাছে। আমাদের চাচার কণ্ঠস্বর ছিল অসাধারণ। আমাদের ছোট চাচার গলাও ছিল অসাধারণ। আব্বা জারী রচনা করতেন, অল্প সময়ের মধ্যেই চাচা জারী রপ্ত করতেন। আর আব্বা

www.nagorikpathagar.org

চাচা মিলে আমাদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেই একটা জারীর দল ছিল। এই দলটা আমাদের এলাকায় আব্বা চাচাদের আমলে বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে ঘুরে জারী পরিবেশন করতেন সে জন্যেই আমার রক্তের মধ্যে সুরের একটা প্রভাব আছে। আর আমার মা ছিলেন স্বভাবকবি। তিনি যখন গল্প বলতেন, মুখে মুখে ছড়া কাটতেন, ছড়ায় সুর করতেন... আমি ছোটবেলায় দেখতাম যে, মা যখন গল্প করতেন তখন আমাদের পাড়ার মেয়েরা মুখর হয়ে তার গল্প শুনতো গাল হা করে। গালে মাছি যাচ্ছে আর আসছে। আমি দূরে থেকে হাসতাম যে, মা কী গল্প করে। পরে একটু বড় হয়ে আমিও মায়ের ভক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। আমার সবচেয়ে ভালো লাগতো যে, মা যখন গল্প করতে করতে সুর করে ছড়া কাটতেন। তখন আমার অবাক লাগতো যে, আমিও যদি এরকম গল্প করতে করতে সুর করে ছড়া কাটতে পারতাম!

সুতরাং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, আমার পরিবার থেকেই আমি সুরের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। গানের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। সে জন্য গানের প্রতি আমার অসম্ভব টান; এমন টান যে, আমার অফিসে আফসার নিজাম ও আমার অফিসের একজন বড় কর্মকর্তা যখন গান বাজাতে থাকে কিম্বা আমাদের মাসুদ রানা কিম্বা আমাদের মালিক আবদুল লতিফ; যেই হোক, যদি গান করে তাহলে আমি ধমক দেই গান বন্ধ করার জন্য। ওরা মনে করে যে, আমি হয়তো রেগে গেছি– আসলে ব্যাপারটা তা না। আমার কানে গান ভেসে আসলে আমি আর কোনো কাজই করতে পারি না। সে জন্য গীতলতা যে এসেছে সেটা স্বাভাবিকভাবেই এসেছে। এর জন্য আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি এবং এই গীতলতার বিষয়টি আমি লক্ষ্য করেছি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে, আমি লক্ষ্য করেছি নজরুলের মধ্যে। আমি লক্ষ্য করেছি ফররুখ আহমদ গানের ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু গানের ব্যাকরণের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের মতো ছিলেন না। তারপরেও ফররুখ আহমদের অসংখ্য গান আছে। তার কবিতার মধ্যেও গীতলতা আছে। এ ক্ষেত্রে তিনি নিজে সিদ্ধহস্ত না থাকলেও সুরের ব্যাপারে ওস্তাদ আবদুল লতিফ ছিলেন। আর ফররুখ আহমদ বিষয়গুলো জেনে নিয়েছেন, এজন্য ফররুখ আহমদের কবিতায়ও গীতলতা আছে। আফসোস হয় যে, ফররুখ আহমদের অসংখ্য গান পড়ে আছে, সেই গানে কেউ সুর তোলে না।

যাই হোক, আমি মনে করি যে, গীতলতা এটা মানুষ জোর করে আয়ত্ব করতে পারে না। এই গীতলতা আল্লাহ প্রদত্ত দান। আর যে কবির এ সম্পদ আছে সেই কবি সাধারণ মানুষের মধ্যে খুব দ্রুত ছড়িয়ে যায়। আমি তো নজরুল ইসলামের মতো শক্তিশালী নই, আমি তো রবীন্দ্রনাথের মতো শক্তিশালী

www.nagorikpathagar.org

নই, সুতরাং আমার ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে আমি জানি না। আমার এই গীতলতা কি স্বাভাবিকভাবে সাধারণ মানুষের কাছ পর্যন্ত আমাকে পৌঁছে দেবে এটা আমি জানি না। আমি অতো ভালো কবি নই। আমি এই বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়েছি।

■ **সম্প্রতি প্রকাশিত আপনার কাব্যগ্রন্থ 'চিত্রল প্রজাপতি'র পথিক শীর্ষক কবিতায় আপনি প্রশ্ন তুলেছেন, 'বস্তুত একজন কবি কি কেবল কবিই থেকে যাবে?' এ জন্যই কি একজন কবি হয়েও আপনি কবিতা রচনার বাইরেও অনেক কাজের দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন?**

– আসলেই আমার মধ্যে একটি কোমল মন রয়েছে। এই প্রশ্নটি তুমি যখন করছো, তখন আমার মধ্যে কান্না ও বেদনা জমা হয়ে গেছে। আমি অনেক সময় চিন্তা করি, এই পৃথিবীই তো একমাত্র শেষ ঠিকানা নয়। এই পৃথিবীর পরেও বিশাল পৃথিবী তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। দেখো শাহাদাৎ তৈয়ব, আমি তো প্রত্যয়বাদী মানুষ। আর আমি যখন প্রত্যয়বাদী মানুষ তখন আমার মধ্যে কিন্তু পরকালের ধারণা কাজ করে, আমার মধ্যে কিন্তু পরকালের ভয় কাজ করে। সুতরাং আমি শুধু একজন কবিকেই এই প্রশ্ন করিনি, সকল মানুষের জন্যই আমার এ প্রশ্ন। এটি আমার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে, একজন কবি কি শুধু একজন কবিই হবেন? তেমনি একজন খেলোয়াড়ের কাছে আমার প্রশ্ন– খেলোয়াড় কি কেবল খেলোয়াড়ই হবেন? তেমনি একজন আমলার কাছে আমার প্রশ্ন– একজন আমলা কি কেবল আমলাই হবেন? তেমনি আমার একজন বিজ্ঞানীর কাছে প্রশ্ন– একজন বিজ্ঞানী কি কেবল বিজ্ঞানীই হবেন? এই যে আমি ক্রিকেট খেলা পছন্দ করি, আমি ফুটবল খেলা পছন্দ করি... সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি ফুটবল খেলাকে...। তো আমি আমার প্রিয় প্লেয়ারদের দিকেই তাকাই। তারা সারাটা জীবন খেলার মাঠেই দিয়ে দিলো। ঘর-সংসার করার সুযোগটা তারা সেভাবে পায় না। আমাদের দেশের ক্রিকেট আমাদের গৌরব বাড়িয়ে দিয়েছে। এই প্লেয়ারদের মধ্যে দু'জন আত্মীয় আছে আমাদের। বর্তমান সময়ের ক্রিকেট দলের, যারা একেবারে আমার গ্রামের কাছের প্লেয়ার, ওরা হয়তো আমাকে চেনে না আমি ওদেরকে চিনি। তো এদেরকে দেখেছি যে এরা ঘরছাড়া হয়ে আছে, বাড়িছাড়া হয়ে আছে, সারাজীবন এদের খেলাধূলা নিয়েই চিন্তা করতে করতে চলে যাচ্ছে। এরা খেলা ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। কিন্তু তারা তো শুধু একজন খেলোয়াড় নয়, একজন মানুষ; আবার সে তো একজন মানুষই না শুধু, একজন বিশ্বাসী মানুষ। আবার কেবল একজন বিশ্বাসী মানুষই না সে, একজন মুসলমান কিম্বা অন্য কোনো ধর্মাবলম্বী, আবার সে তো কেবল একজন মুসলমানই না, সে তো চূড়ান্তভাবে আল্লাহর সৃষ্টি।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ তাঁকে কীভাবে জীবন যাপন করতে বলেছেন, সে কি তা জানার জন্য চেষ্টা করেছে? সারাটা জীবন সে তার কর্তব্যের বিশেষ জায়গায় ব্যবহার করলো কিন্তু এই মানবতার জন্য সে কী করল? তার আত্মীয়-স্বজনের জন্য সে কী করে গেল? সে কি তা জানার চেষ্টা করছে? সে তার দেশের জন্য সুনাম বয়ে আনলো কিন্তু দেশে দুস্থ মানুষের জন্য কি কিছু করার সুযোগ ছিলো? এই আমার দুঃখী বাংলাদেশের জন্য, এই আমার দুঃখী স্বদেশের জন্য, জর্জরিত স্বদেশের জন্য সে কোন কাজটি করতে পারলো? শুধুমাত্র দেশের জন্য সুনাম বয়ে আনা ছাড়া। কিন্তু যদি আমি পাশ্চাত্য জগতের শিল্পীদের দিকে তাকাই, পাশ্চাত্য জগতের বড় বড় খেলোয়াড়দের দিকে তাকাই, তোমরাও তাদের দিকে তাকিয়ে দেখো- তারা কি তাদের সত্ত্বাটাকে কেবল নিজস্ব প্রতিভার জায়গায় খরচ করে দিয়েছে? তারা কি করেছে? তারা যতোটুকু বুঝেছে- তারা তাদের সারাজীবনের সঞ্চয়কে মানবতার জন্য উৎসর্গ করেছে। কেউ পঙ্গুদের জন্য সারাজীবনের সঞ্চয়কে উৎসর্গ করেছে। কেউ বর্তমান সময়ের যে রোগ, একেবারে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে জটিল রোগ এইডস, দেখা যাচ্ছে এইডসের জন্য, এইডস রোগীদের চিকিৎসার জন্য একজন বড় মাপের মানুষ তার সমূহ সম্পদ রেখে যাচ্ছে। আবার অনেকে রাখছেন না। সেজন্য আমি এই প্রশ্নটা করেছি। মূলত তুমি কি শুধু কবিতাই লিখবার জন্য এই পৃথিবীতে এসেছো? না কি আরো কোনো দায়িত্ব তোমার রয়েছে? তোমার তো একদিন পরকালে জবাব দিতে হবে। জবাব দেবার জন্য কী করেছো? সে জন্য আমি মনে করি- আমার যে বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসের আলোকে আমি যদি আমার জাতির জন্য কোনো কাজ করি, আমি যদি আমার দেশের জন্য কোন কাজ করি, তাহলে এই প্রত্যেকটি কাজের মধ্য দিয়ে আমি কবিতার উপাদান সংগ্রহ করতে পারি। আমার বিশ্বাসের জন্য আমি কবি হিসেবে যখন কবিতা লিখবো- কোন চালাকি করবো না, কোন ফাঁক রাখবো না। তেমনিভাবে, আমি যেখানে যখন কোনো কাজ করবো সে কাজের মধ্যে কোনো ফাঁক রাখবো না।

আমি কবিতা লিখবো পরকালের পরিত্রাণের জন্য, আমি কবিতা লিখবো আমার এই দুঃখী দেশটার দুঃখ জর্জরিত মানুষের জন্য। আমি কবিতা লিখবো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। সুতরাং কবির আরও কোনো দায়িত্ব আছে। এ দায়িত্বকে কবিতা থেকে আমি আলাদা করতে চাই না। আমার জীবন থেকেও আলাদা করতে চাই না। আমার মধ্যে যে উপলব্ধি কাজ করে, সেখানে যদি আমি আমার জীবনকে যথাযথভাবে কোরআনের আলোকে সাজাই, সেভাবে যদি কাজে লাগাই তাহলে আমার সামনে এমন এমন কবিতার উপাদান আসবে, যা অন্যদের সামনে আসবে না। দেশ নিয়ে ভাবতেন বিদ্রোহী

www.nagorikpathagar.org

কবি কাজী নজরুল ইসলাম, সে কারণে দেশের জন্য অসংখ্য লেখা রেখে গেছেন। দেশ নিয়ে ভেবেছেন, জাতির জন্য ভেবেছেন। নজরুল ইসলাম জাতির জন্য এক বিরাট সম্পদ। তেমনিভাবে ফররুখ আহমদ আদর্শকে ভালোবেসেছিলেন, জাতিকে ভালোবেসেছিলেন, সেজন্য তাদের নিয়ে কাজ করার প্রেরণা পাই। আদর্শের জন্য উৎসর্গ করার শিক্ষা পাই।

■ **'চিত্রল প্রজাপতি' কাব্যগ্রন্থে বেশকিছু কবিতা মনে হয় আপনার নিজস্ব রীতিতে রচিত। অধিকাংশই স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তে। এসব কবিতার কোনো কোনোটি পর পর মিলযুক্ত। এ ধরনের কবিতাকে কেউ কেউ পদ্য বলতে ভালোবাসে। আবার কিছু কিছু কবিতা সনেট প্রকরণের হলেও সেগুলো মাত্রাবৃত্তে রচিত। এসব কবিতা সম্পর্কে আপনার বক্তব্য জানতে চাই।**

– শাহাদাৎ তৈয়ব, একেবারে নিরেট সাহিত্যসুলভ একটি প্রশ্ন শেষের দিকে করে আমাকে ধন্য করেছো। এটি একটি চমৎকার প্রশ্ন। একেবারেই চমৎকার। দেখো আমি তো কবিতার এক কর্মী, কবিতার কর্মী হিসেবে.... (কবি কিছুক্ষণের জন্য জরুরি কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।)

হ্যাঁ, আমি বলেছি যে, আমি কবিতার এক নগন্য কর্মী, আমি কবিতা প্রেমিক, সৌন্দর্যপ্রেমিক, প্রকৃতিপ্রেমিক। সম্ভবত আগের প্রশ্নে প্রকৃতির বিষয়ে একটি কথা এসেছে। আসলে এটা আমার সহজাত বিষয়- দুঃখ আমাকে বেদনাহত করে, প্রেম আমাকে আপ্লুত করে, প্রকৃতির প্রেম আমাকে দিশেহারা করে ফেলে, এবং শাহাদাৎ তৈয়ব, তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে– মীর কাসেম আলী ভাইয়ের সঙ্গে আমি যখন বঙ্গোপসাগরের সৈকতে পৌছে সুমদ্র দেখি, আমি এতো আপ্লুত হয়ে পড়েছিলাম যে, সম্ভবত পনেরো/বিশ মিনিটের মধ্যে আমার মাথা ধরে যায়। ঠিক তেমিনভাবে কাসেম আলী ভাইয়ের সঙ্গে যখন আমি নদীর তীরবর্তী বনাঞ্চলের ভেতর দিয়ে নাফ নদীকে দেখেছিলাম এবং নাফ নদীর ওপারে আরাকানকে দেখেছিলাম, তখনো আমার অল্প সময়ের মধ্যে প্রচণ্ডভাবে মাথা ব্যথা বেড়ে গিয়েছিলো। একইভাবে সুন্দরবনে যখন পৌছি, সেন্টমার্টিনে যখন যাই... আমি বাংলাদেশকে একেবারে কাছ থেকে দেখার স্বপ্ন দেখেছিলাম। আমার এখনো স্বপ্ন জাগ্রত আছে যে, অন্তত আমি বাংলাদেশের প্রত্যেকটি ইউনিয়নে বেড়াবো। এটা আমার স্বপ্ন, পারলে আমি প্রত্যেকটি গ্রামে বেড়াবো। আমার কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় যাবার অতোটা সাধ নেই, যতোটা সাধ আমার ভিতরে কাজ করে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা গ্রামে যাবার। তো আমি আসলে প্রকৃতিকে এতো ভালোবাসি, আল্লাহর সৃষ্টিকে এতো ভালোবাসি যে, আমি যখন এরকম বিস্ময়কর কোনো প্রকৃতির দিকে

www.nagorikpathagar.org

তাকাই, আমি খুব বেশিক্ষণ সুস্থ থাকতে পারি না। আমার মাথা ধরা বেড়ে যায়। এটা আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না।

তো এখন আমি তোমার সরাসরি প্রশ্নের উত্তরে চলে আসবো। দ্যাখো, গ্লাসের কোনো দোষ নাই। পাত্রের দোষ নাই। তুমি একজন অসম্ভব প্রত্যয়বাদী, তুমি যদি কাচের গ্লাসে মদ খেতে চাও, তাহলে তুমি মদ খেতে পারো। আবার ঐ গ্লাসটায় যদি শরবত চালাতে চাও, চালাতে পারো। গ্লাসের কোনো দোষ নেই। যেই প্রকরণটা আমাদের সামনে এসেছে, যেই বিষয়বস্তুটা আমাদের সামনে এসেছে, যে ফর্মটা আমাদের সামনে এসেছে, আমাদের জন্য এসেছে, এই ফর্মে তুমি প্রবেশ করো। সনেটের একটা ফর্ম আছে, আছে না একটা সনেটের ফর্ম? সেটা তো বাংলাসাহিত্যের একটা সম্পদ। এই ফর্মে কাজ কি মাইকেল মধুসূদন দত্তের আগে কেউ করেনি? করেছে। এই যে সনেটের ফর্ম, এই সনেটের ফর্মে মাইকেল মধুসূদন দত্ত কাজ করেছে। এখন তুমি কবি, তোমরা কবি; তোমরা একবার একটু বিশ্লেষণ করো যে, মাইকেল মধুসূদন দত্ত সনেটকে কতটা সমৃদ্ধ করেছে? তেমনি পয়ার একটি প্রকরণ, পয়ার একটি সিস্টেম এবং এটা বাংলাসাহিত্যের সম্পদ। ঐ যে আমি আগেই উদাহরণ দিয়েছি– গ্লাসের উদাহরণ, তুমি সেই পুরানো গ্লাসটা যত্ন করে রেখে দিয়েছো, তোমার দাদী রেখে গিয়েছিলো, আছে না– তোমার দাদী রেখে গিয়েছে কিম্বা যেমন আমার নানীশাশুড়ি একটা কাঁথা রেখে গেছে, সেই কাঁথাটা আমি পেয়েছি এবং আমার বউ– বউ শব্দটা খুব মজার শব্দ, সেজন্য বউ– আমার বউ ঐ কাঁথাটা খুব যত্ন করে রেখে দিয়েছে, আমি যাতে ব্যবহার করতে পারি। এখন ঐ কাঁথাটা আমি যদি আমার এক শ্যালক আছে– ভালো কবি, সুইডেনে থাকে– ঐ কাঁথাটা যদি আমি ওর জন্য বিছিয়ে দেই তাহলে সেই কাঁথাটার উপরে একজন সর্বাধুনিক কবি যদি শোয়, তাহলে তোমার কাঁথাটার দোষ, না যে শুয়ে পড়লো তার দোষ? আসলে এখানে দোষ না। আমার মাথায় যেটা ঢুকেছে সেটা হলো– এই প্রকরণের ভেতর থেকেই আমি যদি অসাধারণ কিছু রচনা করতে পারি, তাহলে আমার কিছু অসাধারণ রচনা এই প্রকরণের কারণে টিকে থাকতে পারে। সে জন্য আমার যে সেন্স, আমার যে কাব্যভাষা, সেই সেন্স এবং কাব্যভাষায় আমি পুরানো টেকনিক অবলম্বন করতে চাইছি এবং আমার মনে হয়, কোনো পুরাতন পরিশ্রম নয় এটা। তুমি এই টেকনিকের ক্ষেত্রে আল মাহমুদকে দ্যাখোনি, তিনি কি সনেটের প্রক্রিয়াকে গ্রহণ করেননি? শামসুর রাহমান কি গ্রহণ করেননি? কিম্বা সুকান্ত কি করেননি? তোমরাই তো বলে থাকো যে, সুকান্তের কবিতায়, জীবনানন্দ দাশের কবিতায় নজরুলের প্রভাব আছে, বলো না! আসলে সবকিছুরই একটি ধারাবাহিকতা আছে।

www.nagorikpathagar.org

■ **আমরা আসলে প্রশ্নটা এই কারণেই তুলেছি যে, সনেটের কোন দোষ নেই, পয়ারের কোন দোষ নেই, কিন্তু দেখা যাচ্ছে ছন্দের প্রকরণে যেগুলো সনেট, সেগুলো হবে অক্ষরবৃত্তে, সাধারণত আরো ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, আপনি সনেটের প্রকরণে লিখেছেন কিন্তু আপনার ভেতরে বিন্যাস পয়ারের...**

– আরো চমৎকার প্রশ্ন এলো। আগের প্রশ্নের ধারাবাহিকতায় আমি একটি কথা স্পষ্ট করে বলতে চাই। সেটা আমি আগেই স্পষ্ট করে বলার চেষ্টা করেছি। দ্যাখো বাসির, কোনটা পদ্য আর কোনটা কবিতা, এটা যদি তুমি বলো যে আঙ্গিকের ওপর নির্ভর করে, তাহলে কিন্তু সেটা ঠিক না। তুমি যদি আঙ্গিককে সামনে রেখে কোনো কবিতাকে পদ্য বলো, আমার তো মনে হয় না যে, তুমি সুবিচার করলে। কবিতার আলাদা একটি অন্তর্গত ভাবনা আছে, কবিতার আলাদা একটি মর্মগত সৌন্দর্য আছে, কবিতার আলাদা একটি আত্মিক দাবি আছে। সেটা কোন্ প্রকরণের মধ্যে পড়লো সেটা বড় কথা নয়, একটি কবিতা কবিতা হয়ে উঠলো কিনা সেটা তোমাকে ভাবতে হবে। সেজন্য পয়ারের ছন্দে পড়লেই যে সেটা কবিতা হবে না, আমি কিন্তু এই ভাবনার সঙ্গে একমত নই। আমি যেটা চেষ্টা করছি বাসির, সেটা আমি কখনও বলেছি হয়তো। সেটা হচ্ছে যে, সনাতন যে কাব্যধারা, সনাতন যে কাব্য টেকনিক, এই কাব্য টেকনিকের মধ্য দিয়ে আমি ভালো কিছু তৈরি করতে পারি কিনা। এটা কিন্তু আমি কাউকে বলতে চাইনি। কিছু কিছু বিষয় আছে, আমি বলতে চাচ্ছিলাম না। কিন্তু তোমাদের প্রশ্নবাণে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে আমার এই চিন্তাটাকে বলে দিতে হলো।

আল্লাহর রাসূল বলেছেন, তুমি তো কবি ও হাফেজ শাহাদাৎ তৈয়ব এবং বড় আলেমও, তুমি জানো যে আল্লাহর রাসূল বলেছেন, "তুমি যদি বুঝতে পেরে থাকো যে অচিরেই তুমি একটি নেয়ামত পেতে যাচ্ছো, তাহলে ঐ নেয়ামতের কথাটা কাউকে তুমি বলবে না। বললেই যারা পরশ্রীকাতর লোক, তারা তোমার নেয়ামত পাবার আগেই তোমার হাত থেকে সেগুলো কেড়ে নিয়ে চলে যাবে"। এটাই হচ্ছে রাসূলের হাদীসের বিশেষ একটা বিষয়। এখন আমি কিছু কিছু বিষয়ে কাব্যের ব্যাপারে, কিছু কিছু বিষয়ে গানের ব্যাপারে কখনো বলি না। কারণ আমার ভিতরে একটি বিষয় কাজ করে, সে বিষয়টি আর কিছুই নয়, সেটি হলো কিছু কাজ যদি আমি করে যেতে পারি তাহলে হয়তো আমি না টিকলেও আমার পাঠকদের জন্য রেখে যেতে পারি। আর দ্যাখো, আমার কিন্তু নিজের মধ্যে এ বিশ্বাস জন্মেনি যে, আমি ফররুখ আহমদের

www.nagorikpathagar.org

মতো কবি, আমি সুকান্তের মতো কবি, আমি আল মাহমুদের মতো কবি; কিংবা আমি আরো যারা বড়ো বড়ো কবি আছেন তাদের মতো কোনো কবি। এই উপলব্ধি আমার মধ্যে কখনোই দানা বেঁধে ওঠে না, ওঠেনি। কাজেই আমি যে জিনিসটা বলি, সেটা হলো কিছু কাজ করে যাওয়া যায় কিনা। যদি কিছু কাজ করে যেতে পারি তাহলে আমি পরিতৃপ্ত হতে পারবো। আমি পাঠকদেরকে পরিতৃপ্ত করতে পারবো কিনা জানি না কিন্তু যে কাজ করে তারও একটি পরিতৃপ্তির দরকার আছে। সেই পরিতৃপ্তি এখনো আমি অর্জন করতে পারিনি। সেজন্য আমি যা কিছু করছি, আমার একটি উদ্দেশ্য আছে। যেটা এর আগে বলেছি, যখন তুমি কোন কাজ করবে আন্তরিকতার সাথে করবে, মনকে ঢেলে দিয়ে করবে, কোন রকমের চালাকি করবে না। আমি কিছু কাজ করতে চাচ্ছি, কোনো চালাকি করতে চাই না এবং কোনো চালাকি আমি করবো না। বাদ-বাকী কাজ হলো, আমার পরে যারা আসবে তাদের। এবং আমার খ্যাতি, আমার সুনাম– এ ব্যাপারে আমি সত্যিকার অর্থে চিন্তিত নই। কারণ আল্লাহ নিজে বলেছেন– ওয়াতু ইজ্জু মানতা-শাউ ওয়াতু যিল্লু মানতা-শাউ; বিয়াদিকাল খাইর। মানুষের সুখ্যাতি-কুখ্যাতি, মানুষের ইজ্জত-বেইজ্জত সবকিছুর মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

এ বিষয়টি আমার মাঝে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। সেই সঙ্গে কুরআনের আরো একটি বক্তব্য আমাকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছে। সেটা হলো– লাইসা লিল ইনসানি ইল্লা মা-সা'আ– মানুষ যতোটুকু চেষ্টা করবে অতোটুকু সে পাবে। সেজন্যে আমার চেষ্টা হচ্ছে যে, আমি সাহিত্য এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে থাকতে চাই, মনোযোগ দিতে চাই এবং আমার সম্পূর্ণ নিবেদন আমি এখানে পেশ করতে চাই। এক্ষেত্রে যেনো আমি সবরকমের চালাকি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারি, তোমরা দোয়া করো, সাহিত্যকে ভালোবেসেছিলাম, সাহিত্যের সমস্ত শাখাকে ভালোবেসেছিলাম, সেই সঙ্গে আমার মধ্যে সর্বোত্তম মানবতাবোধও কাজ করছে। দুটি জিনিস আমার মধ্যে একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলে। একটি হলো সর্বোত্তম মানবতাবোধ, অন্যটি হচ্ছে সাহিত্যের ক্ষেত্রে পরিশ্রম এবং সর্বোত্তম পরিশ্রম। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এবং সর্বোত্তম আদর্শ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ঐ একই বিষয়– পরিশ্রম ও আন্তরিকতা। আমি যা কিছু করবো তার মধ্যে পরিশ্রম দরকার, নিষ্ঠার দরকার। এটা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও যেমন প্রয়োজন, তেমনি আমি যে আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে চাই সে ক্ষেত্রেও প্রয়োজন। আমি যে আদর্শের কবি সেখানেও সেই নিষ্ঠা এবং শ্রমের দরকার আছে। সবশেষ কথা হলো, আমরা সবাই মিলে যা কিছু করি, যদি সেখানে এই শ্রম এবং আন্তরিকতাকে, নিষ্ঠাকে ঢেলে দিয়ে তপস্যা করতে পারি তাহলে আমাদের পরিশ্রম সত্যিই কাজে আসবে।

www.nagorikpathagar.org

■ **ধন্যবাদ মল্লিক ভাই। অনেক কথা উঠে এসেছে। অনেক মূল্যবান সময় দিয়েছেন।**

– তোমাদের পত্রিকার সকল পাঠককে আমার পক্ষ থেকে প্রাণঢালা অভিনন্দন। তোমাদেরকেও আমি অভিনন্দিত করছি এবং যাজাকাল্লাহ বলে তাগিদ দিচ্ছি। আল্লাহ তোমাদেরকেও পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে এগিয়ে যাওয়ার তওফিক দিন।

আমার মতো একজন সামান্য কবির সাক্ষাৎকার নেবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হবে না, হয় না। সেখানে তোমাদের মধ্যে সাক্ষাৎকার নেয়ার যে আগ্রহ জাগ্রত হয়েছে এটাকেও আমি আল্লাহর এক অপরিসীম রহমত বলে মনে করি।

www.nagorikpathagar.org

[অগ্রন্থিত সাক্ষাৎকার- ১]

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের সাক্ষাৎকার

■ **আপনি কিভাবে লেখালেখির মধ্যে জড়িয়ে পড়লেন?**

– আমার আব্বা ছিলেন শিক্ষক, আমার আব্বা ছিলেন কবি এবং আমার আব্বা ছিলেন একজন যথার্থ আলেম। ছিলেন অসাধারণ বক্তা।

আমার একমাত্র চাচা ছিলেন অত্যন্ত সুপুরুষ। ভাষা সৈনিক অধ্যাপক আযম সাহেবকে দেখলে আমার চাচার কথা অজান্তেই মনে পড়ে।

সেই চাচা ছিলেন চমৎকার এক গায়ক। আব্বা লিখতেন পুঁথি, আব্বা লিখতেন জারী। চাচা তাঁর দল-বল নিয়ে গেয়ে বেড়াতেন সেই সব পুঁথি, সেইসব জারী।

আমার আম্মার ছিল ছড়া কাটার অভ্যাস। যেমন:

তোরা সবাই আয়
গাছের ছায়া লম্বা লম্বা বেলা বয়ে যায়।

অথবা

মুড়ি ফুটতিছে চট্‌চট্‌
খাইয়ে যা সব ঝট্‌পট্‌

আমার বড় ভাই আহমদ আলী মল্লিক দক্ষিণাঞ্চলের এক বিখ্যাত কবি। চল্লিশের দশকে বাগেরহাট পিসি কলেজে, আমার বড় ভাই এবং ভাষা সৈনিক

www.nagorikpathagar.org

ড. হালিমা খাতুনরা একসাথেই পড়াশোনা করেছেন। ঐ সময় কবি আবুবকর সিদ্দিকও ঐ কলেজের ছাত্র ছিলেন। পিসি কলেজে তখন যে সাহিত্যচক্রটি অভিনন্দিত হয়েছিলো তার অগ্রসৈনিক ছিলেন ওঁরাই।

বড় ভাইয়ের ছিলো সাহিত্যের এক বিশাল ভান্ডার। অল্প বয়সেই আমি ঐ ভান্ডারের এক কৌতূহলী পাঠকে পরিণত হয়েছিলাম। পরিণত হয়েছিলাম- হঠাৎ কখন- কবি সুকান্তের ভক্তে। সেই বয়সে আমি তাঁর অনেক কবিতাই আবৃত্তি করতে পারতাম।

বড় ভাইকে দেখতাম : রাত জেগে জেগে কবিতা লিখছেন। পাশে ভাবী। কখনো পান বানিয়ে দিচ্ছেন। কখনো গভীর আবেগ নিয়ে কবিতা শুনছেন। অত্যন্ত মেধাবী এই ভদ্র মহিলা [এ সময়ের কুয়েতস্থ বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত রুহুল আমিন সি.এস.পি. সাহেবের বড় বোন] কিভাবে যে জেগে থাকতেন সারা রাত- আজো ভাবতে অবাক লাগে।

মূলত লেখালেখিতে জড়িয়ে পড়ার পেছনে আমার পারিবারিক ঐতিহ্যই আমাকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করেছে বলে মনে হয়। কিন্তু একটা পর্যায়ে ছাত্র- ইসলামী আন্দোলন এবং ঐ আন্দোলনের প্রথম সারির ক'জন নেতা আমাকে যেভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন- তার কোন তুলনাই হয় না। সর্বজনাব মওলানা আবদুল হাই, মতিয়ার রহমান খান, সিদ্দিক জামাল, আনসার উদ্দীন হেলাল, বাসারাত হোসেন, অধ্যাপক নাজির আহমদ, অধ্যাপক আবু নাসের মুহাম্মদ আবদুজ্জাহের, মীর কাশেম আলী, মাসুদ আলী, মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, মাওলানা আবু তাহের, সাইফুল আলম খান, আজহারুল ইসলাম ভাইয়েরা তাঁদের কয়েকজন।

হ্যাঁ, মোহতারাম মীর কাসেম আলী ভাই এ ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত গহীন এবং অতলস্পর্শী। ঐসব গুণীজনদের ভালোবাসা আমাকে উদ্বেলিত করেছিলো ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন, ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতির অঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়তে।

মাওলানা আবদুর রব, মাওলানা আতাহারুল ইসলাম, মাওলানা সেকেন্দার আলী, ক্বারী মোহাম্মদ রুহুল আমীন, অধ্যাপক অনীল হালদার, অধ্যাপক হালিমুজ্জামান, অধ্যাপক গোলাম রসূল, ড. এস, এম, লুৎফর রহমান, কবি ও গবেষক আবদুল মান্নান সৈয়দ, প্রবীণ শিক্ষাবিদ ও ঔপন্যাসিক শওকত আলী, ড. আশরাফ সিদ্দিকী প্রমুখ আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষকই শুধু নন, পরম অনুপ্রেরণাও। তাঁদের অবদানকে আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ না করে পারি না।

www.nagorikpathagar.org

■ আপনি কোন মাধ্যমে কাজ করতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। আপনার প্রিয় কর্মের কথা বলবেন কি?

– এই চমৎকার প্রশ্নটির জন্যে সত্যিই আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনি যে বেশ চালাক তা অন্তত এই প্রশ্নটির ধরন দেখে বোঝা যায়। সে যাই হোক, আপনাকে ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেলাম। উত্তর দিলাম না।

■ কেন সৃজনশীল কাজ বেছে নিলেন? সাহিত্য চর্চায় আপনার উদ্দেশ্য কি?

– ঐ যে আগে বলেছিঃ সাহিত্যপ্রবণতা আমার রক্তের উত্তরাধিকার অথবা রক্তের এক অনিবার্য অন্বয়। তবু 'সাহিত্যের জন্যে সাহিত্য' করাটাকে আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ঘৃণা করি। আমি মনে করি, মানুষ হিসেবে প্রত্যেক মানুষেরই একটা কর্তব্য আছে। লেখকও একজন মানুষ। বরং সবচেয়ে সচেতন মানুষ। তার লেখালেখির ভেতর দিয়ে সে 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' এই গানই গাইবে। অর্থাৎ যে মানুষ 'সৃষ্টির সেরা' সে মানুষের কল্যাণ-নির্দেশ যথার্থভাবে লেখকই করতে পারেন। কেননা লেখক শুধু লেখকই নন, তিনি জ্ঞানীও। এক হাদীসে কুদসীতে পেয়েছিলাম। [আল্লাহ বলছেন:] আমি জ্ঞানী। আর জ্ঞানীরাই আমার প্রিয়। সুতরাং লেখকরা আল্লাহর ভালোবাসার মূল্য দেবে আল্লাহর নির্দেশিত পথেই।

কুরআনের ছোট্ট একটি সূরার ছোট্ট একটি আয়াত সর্বসময় আমাকে তাড়িত করেঃ তোমাকে যেসব নেয়ামত দান করা হয়েছে তার প্রত্যেকটিরই জবাবদিহি তোমাকেই করতে হবে।

লেখক সত্তা আল্লাহর এক বিশেষ দান। আমি খুব বড় কোন লেখক নই। সামান্য এক কবিতাকর্মী মাত্র। তবু যতটুকু লিখবো– আমি তাঁর দানের উদ্দেশ্যকে মনে রেখেই লিখবো। তাঁর সন্তুষ্টির জন্যেই লিখবো। তাঁর সৃষ্টির জন্যে লিখবো। তাঁর চিরকালের কল্যাণবারতা পৌছে দেবার জন্যে লিখবো। সত্যিকার সত্য তো তাঁরই সত্য, সত্যিকারের সৌন্দর্যতো তাঁরই সৌন্দর্য। আমি সেই সত্য এবং সৌন্দর্যের কথা- যতটুকু পারি, বিপুল গৌরবে পরিবেশন করে যাবো। কবির ভাষায় আমি উদাত্ত আহ্বান জানাবোঃ

এ দুর্ভাগা দেশ হতে হে মঙ্গলময়
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে
উদার আলোক মাঝে উন্মুক্ত বাতাসে। -রবীন্দ্রনাথ

■ সাহিত্য জীবনের অংশ কিন্তু আমাদের সাহিত্য শাশ্বত জীবনচেতনা কতটুকু অর্জন করতে পেরেছে?

www.nagorikpathagar.org

– আপনার প্রশ্নের দু'টি দিক আছে। একটি হচ্ছে আমাদের সাহিত্যে জীবনচেতনার প্রসঙ্গ। অন্যটি হচ্ছে আমাদের সাহিত্যে শাশ্বত জীবনচেতনার প্রসঙ্গ।

দেখুন, বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য কিন্তু বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ ভাষা এবং সাহিত্য। এই গৌরবের কথাটি আমরা অবশ্যই মনে রাখবো। সত্যি বলতে কি, এই ভাষা এবং সাহিত্যে জীবন চৈতন্য ছিলো বলেই বিশ্বসভায় তার সমাদর। সেই জীবন চেতনা কি ফুরিয়ে গেছে? আমি বলবো: না, ফুরায়নি, বরং আরো বৈচিত্র্য অর্জন করেছে। এখন দ্বিতীয় প্রসঙ্গ নিয়ে যদি আলোচনায় আসি তাহলে বলতে হয়- শাশ্বত জীবনচেতনা মানে যদি হয় ইসলামী জীবন চেতনা তাহলে কিন্তু প্রসঙ্গটির গভীরেই যেতে হবে।

আমি আপনাকে ১৮৮০ সালের দিকে নজর দিতে বলবো। তখনকার টগবগে মুসলিম প্রতিভাবানরা দৃষ্টি কাড়বার মত শাশ্বত জীবনচেতনার যে আধুনিক ইমারাত গড়বার উদ্যোগ নিয়েছিলেন তার ভিত্তি তো সে সময়ই নির্মিত হয়ে গিয়েছিলো।

এখনই এই ১৯৮০'র দিকে একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকান। দেখবেন- শাশ্বত জীবন চেতনা কতটুকু অর্জিত হয়েছে। ১৯৮০ আপনাকে উৎসাহিত করবে, আদৌ হতাশ করবে না। তারও আগে অর্থাৎ ১৯৪০'র দিকে তাকান। প্রাণ জুড়িয়ে যাবে।

মূলত: ১৮৮০, ১৯৪০ এবং ১৯৮০'র যথার্থ মূল্যায়ন হয়নি। হয়নি আরো অনেক উল্লেখযোগ্য দশকের। হলে কিন্তু শাশ্বত জীবনচেতনার পাল্লাই ভারী হয়ে যাবে।

■ **কথাসাহিত্য নিয়ে কাজ করার ব্যাপারে আপনার বিশেষ কোন পরিকল্পনা আছে কি?**

– কবি ইকবাল বলেছেন:

তু শাহী হায় পরওয়াজ হায় কাম তেরা
তেরে সামনে আসমাঁ আওর ভি হায়
অর্থাৎ তুমি হচ্ছো বাজপাখী [এক আকাশ থেকে আরেক আকাশে]
উড়ে বেড়ানোই তোমার কাজ।
তোমার সামনে এখনও [অনেক আকাশ উড়তে] বাকী রয়ে গেছে।

হ্যাঁ কথাসাহিত্যে সাহস করবার ইচ্ছে আছে।

www.nagorikpathagar.org

■ ৭০ দশক এবং '৮০ দশক সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

– '৭০'র দশক এবং '৮০'র দশকের মধ্যে কিছু পার্থক্যতো আছেই। বিশ্বাসগত পার্থক্য '৮০'র দশককে অধিকতর উজ্জ্বলতা দিয়েছে। '৮০'র দশকের অন্যান্য কাব্য-বৈশিষ্ট্যও অত্যন্ত স্পষ্ট। নাহলে, বিরূপ মন্তব্য শুরু হয়েছে কেন? হিংসুটেরা বসে নেই কেন?

■ এ পর্যন্ত আপনার কতগুলো বই বের হয়েছে? এখন কি লিখছেন?

– আমার সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা এখানে। যে কোনো কারণেই হোক, আপাতত আমার কোন প্রকাশক নেই। তবু ভাগ্য ভালো যে, একটি গানের বই এবং একটি কবিতার বই আমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষীরা বের করে দিয়েছিলেন।

এখন কি লিখছেন? নারে ভাই, ঠিক পরিকল্পিতভাবে লিখছি না, লিখতে পারছি না। তবু কখনো গদ্য কখনো পদ্য লিখছি এখন। অনুবাদে হাত দিতে চাইছি।

■ আমাদের সাহিত্য বর্তমানে দু'টো শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এতে কতটুকু লাভ বা ক্ষতি হচ্ছে।

– এই বিভক্তি কোনকালে ছিলো না? থাকবেই। প্রতিযোগিতার দরকার আছে। বায়তুল আক্‌সা উদ্ধারকর্তা গাজী সালাহ্‌উদ্দীন আইয়ুবীর ভাষায়ঃ শেষ অবধি- স্বপ্ন, শ্রম, সততা এবং ঐকান্তিকতারই বিজয় সুনিশ্চিত।

■ বিভিন্ন কবি বিভিন্নভাবে কবিতার সংজ্ঞা দিয়েছেন, আপনি কাকে কবিতা বলবেন?

– কবিতা হচ্ছেঃ প্রিয়তমার আরেক নাম। কবিতা হচ্ছে নিসর্গের আরেক রহস্য। শব্দ এবং অলঙ্কারের শুদ্ধতম মাধুর্য। কবিতা হচ্ছেঃ কবি হাস্‌সান বিন সাবিতের (রা.) কাব্য-ধীতে এবং কাব্য-বুদ্ধিতে মুগ্ধ হয়ে রাসূল (স.) এর পক্ষ থেকে পুরস্কৃত এক মেধাবী চাদরের ঐশ্বর্য।

■ আপনি কি সাহিত্যের ' পোস্ট মডার্নিজম' স্বীকার করেন?

– ষোলকলা নকলের ভ্যাজালের বাজারে,
আসলের ভাগে দেখি কাচকলা ভাজারে;
ভালোবাসা মায়াটায়া তাও খাদে ভরা হে,
গলাবাজি বোলচালে পড়ে নাতো ধরা হে। -আবুবকর সিদ্দিক

■ কবিদের জন্যে সাংবাদিকতা পেশাটা আত্মঘাতী। আপনি কি মনে করেন?

– কখনো কখনো আত্মমর্যাদাও। কখনো কখনো কবি আল মাহমুদও। প্রকৃত কবির জন্যে পেশা কোন সমস্যা নয়। কবির ভাষায় :

www.nagorikpathagar.org

দুঃখ সহার তপস্যাতে
হোক আমাদের জয়
ভয়কে যারা মানে তারাই
জাগিয়ে রাখে ভয়।

■ **সাম্প্রতিক সময়ে এক ধরনের কবিতা পড়ে, পাঠক বলছেনঃ কিছুই বুঝলাম না। কবি বলছেন : 'আমাদের পাঠকরা কবিদের সঙ্গে তালমিলিয়ে অগ্রসর হতে পারছেন না তাই এমন হচ্ছে'। আর এক ধরনের কবিতা পড়ে পাঠক বলছেনঃ 'দরজা খোলা কবিতা'। কবি বলছেনঃ 'কবিতায় স্বচ্ছতা এসেছে'। আপনি কি বলবেন?**

– যারা বলেন, "কিছুই বুঝলাম না'। তারা আসলে কি যে বোঝেন না তাও বোঝেন না। তারা মনে হয় না বুঝেই বাহবা দেবেন-

আমরা সবাই মানমোসল
নদীতে নামিয়ে করি গোসল-

ধরনের কবিতা শুনেই। কিন্তু মোসলমান শব্দটিকে যে এইমাত্র জবাই করা হয়েছে- সে খবর তাদের নেই। অন্ত্যমিলই কবিতা নয়- এ বোধও তাদের নেই।

আবার যেসব কবিরা বলছেনঃ 'পাঠকরা...তাল মিলিয়ে... পারছেন না'। আমি তাদের বক্তব্যও মেনে নিতে খানিকটা কষ্ট বোধ করি। কষ্ট বোধ করি পাঠকদের খুব বেশী বোকা মনে করি না বলে। ঐ যে কথায় আছে– এক কাঠি বাজে না। নিশ্চয়ই কবিতার কোথাও একটা সমস্যা যাচ্ছে। সে সমস্যাটা সম্ভবত দু'দিকেরই। কবি এবং পাঠকেরই। কোন কোন কবি এমন কিছু লিখছেন যা কবিতা-পদবাচ্য নয়। 'আধুনিক কবিতাকেও দেহমনে কবিতা হতে হবে। যদি তা সেই প্রাথমিক শর্ত পালন না করে, তবে তাকে নিয়ে কিসের বড়াই? সব শিল্পের ক্ষেত্রেই ভালোমন্দ আছে, কবিতার ক্ষেত্রেও আছে'- গবেষক জীবেন্দ্র সিংহরায়ের এই বক্তব্যের সাথে একমত হয়ে বলতে চাইঃ

সাম্প্রতিক সব কবিতাই ভালো কবিতা নয়। হতেও পারে না। সুতরাং পাঠকের ওপর দোষ চাপিয়ে লাভ নেই। অন্যদিকে যেসব পাঠক কবিতার গভীরে যাবার ব্যাপারে অনভিজ্ঞ কিন্তু ঢালাও মন্তব্য করতে দ্বিধা করেন না তাদেরও বোঝা উচিত যে, পৃথিবী এক জায়গায় যেমন থেমে থাকে না কাব্যের জগতও তেমনি এক জায়গায় থেমে নেই। থাকবেও না।

www.nagorikpathagar.org

আমি মনে করি, সংবাদপত্রের পাঠক আর কবিতার পাঠক এক নয়। কবিতার দুর্বোধ্যতা নিয়ে অতীতেও প্রশ্ন ছিলো, ভবিষ্যতেও থাকবে। তবে প্রকৃত কবিতার পাঠকের অভাব হবে না কোন কালেই। দুর্বোধ্যতার অভিযোগ কি মাইকেলের বিরুদ্ধেও ছিলো না? রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধেও ছিলো না?

■ **বাংলাদেশে একটা শাশ্বত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জন্য কি কি প্রয়োজন?**

– আমি শাশ্বত সাংস্কৃতিক বিপ্লব বলতে ইসলামী সাংস্কৃতিক বিপ্লবকেই বুঝি। অন্য কিছু তো নয়ই।

১. সত্যিকার অর্থে ইসলামী দ্বীনও যা ইসলামী সংস্কৃতিও তাই। ইসলামী দ্বীন অর্থাৎ ইসলামী জীবনবিধান প্রতিষ্ঠার যে কর্মসূচি, ইসলামী সংস্কৃতির বিজয়ের জন্যেও ঐ একই কর্মসূচি। ইসলামী বিপ্লব এবং ইসলামী সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সম্পর্ক হচ্ছে রুহ এবং জিসিমে [দেহ]'র সম্পর্কের মত। একটা থেকে আরেকটাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। হ্যাঁ, দু'টোর মধ্যে পার্থক্য যদি কিছু থেকেই থাকে, তাহলে সে পার্থক্য কাণ্ড ও শাখার পার্থক্য। কাণ্ডের কাজ নয় শাখা অস্বীকার করা; শাখার কাজ নয় কাণ্ডকে উৎপাটিত করা।

২. ঐ বিপ্লবের বিষয়টিকে সর্বপ্রথম বুঝতে হবে। বুঝতে হলে কুরআনের জ্ঞান, হাদীসের জ্ঞান সত্যিই অপরিহার্য, অপরিহার্য ইসলাম ও ইসলামী সংস্কৃতির ওপর ব্যাপক পড়াশোনার। আজকাল অনেকেই আন্দাজের ভেতর দিয়ে ইসলামী সংস্কৃতির নামে মুসলিম সংস্কৃতি, না হয় সেকুলার সংস্কৃতির চর্চা করে যাচ্ছেন। অনেকে আবার ইসলামী বিপ্লব খুব ভালো বোঝেন কিন্তু ইসলামী সংস্কৃতি বোঝেন না কানাকড়িও অথচ ছড়ি ঘোরানোর ব্যাপারে ওস্তাদ। এইসব লোকের ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কিত মৌলিক কোন জ্ঞান না থাকার কারণে, কখন যে কী করে বসেন বোঝা মুশকিল। ভয়াবহ ব্যাপার হচ্ছে: বিভ্রান্ত লোকেরা এদেরকে খুব কৌশলে কাজে লাগায় এবং এদেরকে দিয়ে যা খুশি তাই করায়- শেষ অবধি। সেই জন্যে বোধের সাথে আজ প্রয়োজন তীক্ষ্ণ সতর্কতার।

৩. বলতে দ্বিধা নেই, ইসলামী বিপ্লবও বোঝেন ইসলামী সাংস্কৃতিক বিপ্লবও বোঝেন যারা, তাদেরই এগিয়ে আসতে হবে সর্বাগ্রে। এগিয়ে আসার অর্থ হচ্ছে ব্যক্তিগত সামর্থ নিয়ে এগিয়ে আসা, সমন্বিত উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসা, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনশক্তি নিয়ে এগিয়ে আসা, সম্মিলিত কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে আসা, সর্বোপরি একটি বিপ্লব সাধনের লক্ষ্যে এগিয়ে আসা। কবি ফররুখের ভাষা:

সব সংকটে সকল সড়কে
ঘূর্ণাবর্তে বজ্র কড়কে

www.nagorikpathagar.org

প্রলয় তুফানে, শহীদি রক্তে
মুক্তির ছবি আঁকবো
জেহাদের এই ঝাণ্ডা আমরা
চিরদিন উঁচু রাখবো॥

ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার কোনো বিকল্প নেই, সেই সাথে খুব বেশী প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের। ইসলামী সাংস্কৃতিক বিপ্লব সাধনের জন্যে অধিকতর উদারতার সাথে আজ ঐ দুটি বিষয়কে বিবেচনা করতে হবে।

আসলে আকাশের চেয়েও অতিরিক্ত এক আকাশের ব্যাপ্তি নিয়ে ইসলামী সংস্কৃতির অস্তিত্ব। সেই আকাশের মত ব্যাপ্তিকে সংকুচিত করেছে ইসলামের জঘন্য দুশমনেরাই- ক্রমাগতভাবে। এই সংকোচন শুরু হয়েছে মুসলিম জাহান থেকে জেহাদ সম্পর্কিত ধারণা বিলুপ্ত করবার ষড়যন্ত্রের কালো অধ্যায় থেকে।

ড. ইকবাল তাই বলতে বাধ্য হয়েছিলেন :

শুধু অর্থনৈতিক সমস্যাই দেশের একমাত্র
সমস্যা নয়।... সাংস্কৃতিক সমস্যা
মুসলিমদের পক্ষে আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৩২ সালের ২১শে মার্চের এক বক্তৃতায় ইকবাল খোলাখুলিভাবে প্রস্তাব করেছিলেন:

আমি সবগুলো বড় বড় শহরে সাংস্কৃতিক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করি।

উপমহাদেশের সবচেয়ে সাংস্কৃতিক সচেতনতাসম্পন্ন মহামানুষটি কেন ঐসব বক্তব্য রেখে গেছেন, তা আমাদের তলিয়ে দেখতে হবে। এবং আত্মসমালোচনাও করতে হবে যে, আমরা প্রত্যেকেই পারতপক্ষেও দায়িত্ব পালন করছি কি না?

সুতরাং আমাদের কাজ আমাদেরই করতে হবে। আমাদের দায়িত্ব অন্যরা প্রতিপালন করবে- এ দূরাশা ছাড়া আর কিছু নয়। কবি ফররুখ তাই যথার্থ বলেছেন :

তোরা চাসনে কিছু কারো কাছে
খোদার মদদ ছাড়া
তোরা পরের উপর ভরসা ছেড়ে
নিজের পায়ে দাঁড়া।।

www.nagorikpathagar.org

তোরা নিজের পায়ে দাঁড়াস যদি
বইবে আবার আলোর নদী
এই দুনিয়ার গুলশানে ফের
জাগবে নতুন সাড়া।।

মূলত আত্মগঠন, সংগঠন, প্রশিক্ষণ, সংগ্রাম এবং বিপ্লবী জনশক্তি, একটি শাশ্বত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জন্যে অপরিহার্য। এর কোন বিকল্প নেই। সেই কারণে শুদ্ধতম রাজনৈতিক আন্দোলনকে এড়িয়ে যাবার পরিবর্তে জড়িয়ে ধরবার আবশ্যকতাকে অস্বীকার করা বাতুলতা মাত্র।

■ **নতুনদের মধ্যে প্রতিশ্রুতিশীল কাউকে দেখতে পাচ্ছেন কি?**

– প্রতিশ্রুতিশীল পাঁচজন/দশজন নয়- সারা দেশে শত শত দেখতে পাচ্ছি। লিখে রাখুন, মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যেই ওদেরকে আপনিও দেখতে পাবেন- ইনশাআল্লাহ। দেখতে পাবেন প্রতিশ্রুতিশীলতার পর্দা পেরোনা বিজয়ী এবং প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত হিসেবে।

কথাশিল্পী মরহুম জামেদ আলী, নাট্যকার ড. আকরাম হোসেন, ড. সিরাজুল ইসলাম, শিল্পী হামিদুল ইসলাম, কবি সাজজাদ হোসাইন খান, কথাশিল্পী মাহবুবুল হক, প্রবন্ধকার আবদুল মান্নান, গবেষক মিয়া মোহাম্মদ আইয়ুব, আবৃত্তিকার নজরে মাওলা, কবি ও ডা. মোর্শেদ আলী, ড. হুমায়ুন কবীর, সংগঠক ও কলামিস্ট জয়নাল আবেদীন আজাদ, কবি রাগিব হোসেন চৌধুরী, ড. মাহবুব মোর্শেদ, কবি ও সাংবাদিক মাসুদ মজুমদার, ড. আবদুল বারী, কবি ফরিদ আহমদ রেজা, কবি সোলায়মান আহসান, কবি আসাদ বিন হাফিজ, কবি মোশাররফ হোসেন খান, মরহুমা কবি লায়লা রাগিব, প্রবন্ধকার খন্দকার আয়েশা খাতুন, গল্পকার ফজিলা তাহের, কবি চৌধুরী গোলাম মাওলা, অধ্যাপক আমীরুল ইসলাম, অধ্যাপক চৌধুরী আব্দুল হালিম, সাংবাদিক নাজিব ওয়াদুদ, অধ্যাপক সৈয়দ আজীজ, নাট্যকার আ. স. ম. শাহরিয়ার, নাট্যকার আহমদ নাসিমুল হুদা নওশাদ, আবু হেনা আবিদ জাফর, সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, কবি গাজী রফিক, শিল্পী মোমিন উদ্দীন খালেদ, মজিদ মাহমুদ, ইশারফ হোসেন, অধ্যাপক আহসান সাইয়েদ, শিল্পী জামালুদ্দীন, কবি সাংবাদিক আহমদ মতিউর রহমান, শরীফ আব্দুল গোফরান, ইঞ্জিনিয়ার রাশিদুল হাসান, আ জ ম ওবায়েদুল্লাহ, শিল্পী ও গল্পকার হাসান আখতার, কবি সৈয়দ রফিক, কবি আশরাফ আল দীন, কবি বুলবুল সরওয়ার, শিল্পী-কবি গোলাম মোহাম্মদ, কবি গাজী এনামুল হক, ইসমাঈল হোসেন দিনাজী, শিল্পী তোয়াহা, শিল্পী ফরিদী নোমান, কবি নিজাম উদ্দীন সালেহ, গল্পকার আব্দুল হাই মিনার, কবি ও ছড়াকার ফারুক

www.nagorikpathagar.org

হোসেন, শিল্পী ও ছড়াকার মহিউদ্দিন আকবর, শিল্পী তাফাজ্জল হোসেন খান, শিল্পী আবুল কাশেম, শিল্পী তারেক মনোয়ার, সৈয়দ মঞ্জুর হোসেন, মরহুম মহিউদ্দিন বাকী, অধ্যাপক খন্দকার আবদুল মোমেন, সম্পাদক ও সংগঠন শাহেদ মুবীন, নাসির হেলাল, বদরুল ইসলাম মুনীর, অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর, অধ্যাপক সালমান আযামী, কবি কামাল মাহবুব এবং এদের বন্ধুরা- '৭০ এবং '৮০'র দশকে ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতির অঙ্গনে যে নতুন জোয়ার এনেছিলেন, সে জোয়ারের কলোকলোশ্বর সীমান্ত অতিক্রম করেছে সেই কবে!

সম্ভাব্য বিজয়ী এবং সম্ভাব্য প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তরা হচ্ছে এই এঁদেরই প্রত্যয়ের সহযাত্রী, শক্তিধারা সহযোদ্ধা।

'৯৫'র শেষ তিন মাসের মধ্যে বাংলাদেশের প্রধান শহরগুলো আমি ঘুরে বেড়িয়েছি। কোথাও যোগদান করেছি সাংস্কৃতিক সম্মেলনে, কোথাও সাহিত্য সম্মেলনে, কোথাও কবিতা পাঠের আসরে এবং কোথাও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের কোলাহলে। ফলে আমার মনে হয়েছে- ঢাকার নাসীর মাহমুদরা, আবু তাহের বেলালরা, হাসনাত কাদেররা, হাসিনুর রবরা, ফজল মাহমুদরা, গাজী জসিমরা, আ. জ. ম. জাকিররা, রফিক মোহাম্মদরা, নূরুন্নাহার লিমুরা, চট্টগ্রামের আমিনুল ইসলাম নজীররা, জুয়েলরা, মাঈন উদ্দীন জাহেদরা, রাজশাহীর সায়ীদ আবুবকররা, বগুড়ার মাহফুজুর রহমানরা, খুলনার কণকরা, বরিশালের 'শিকড়' সন্ধানীরা, সিলেটের ঐতিহ্যবাদীরা এবং সারা বাংলাদেশের ইতিবাচক সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সব্যসাচীরা- ইনশাআল্লাহ বিস্ময়কর কিছু একটা করবেই, কেউ রোধ করতে পারবে না। কবি বে'নজীর আহমদের মত আমি তাই গেয়ে উঠি:

মরা বন্দরে নোঙ্গরে বাঁধা কিশতি মোর
তুলি মাস্তুলে চঞ্চল পাল দখিনা বায়
আবার টুটিল বাঁধন বাঁধার শিকল ডোর
নয়া জিন্দেগীর নয়ালী চাঁদ
দিলের দহনে জাগায়েছে বুঝি হাজারো সাধ।।

■ **সাম্প্রতিক তরুণদের অভিযোগ অগ্রজরা দায়িত্ব পালন করছেন না- অর্থাৎ তরুণদের সনাক্ত করতে অগ্রজরা নারাজ। আপনার কি মনে হয়?**

– কেউ সনাক্ত করলো আর না করলো, তার তোয়াক্কা কোনো প্রতিভাধর করে না। অগ্রজদের সবাইকে, ঢালাওভাবে, অভিযোগ করা মনে হয় ঠিক হবে না।

www.nagorikpathagar.org

■ **লেখালেখি ইত্যাদি ব্যাপারে ঘরের সহযোগিতা কতটুকু পান?**

– আলহামদুলিল্লাহ। রীতিমত গর্ব করার মত সহযোগিতা পাই। আমার স্ত্রী সাবিনা মল্লিক লেখিকা সংসদের সাথে জড়িত, অন্যতম দায়িত্বশীলাও। লেখিকা সংসদের পরিচালিকা হচ্ছেন আমাদের বন্ধু কবি আসাদ বিন হাফিজের স্বনামধন্যা স্ত্রী মোহতারিমা কামরুন্নেসা মাকসুদা। ঐ যে একটা ছড়ায় আছে না?

গুডবাই কামরুন চল্‌লাম
দেখা হবে শেষ হলে সংগ্রাম। -আসাদ বিন হাফিজ

ঐ কামরুনই হচ্ছেন বিখ্যাত এই ছড়ার কামরুন- মোহ্‌তারিমা কামরুন্নেসা মাকসুদা।

হ্যাঁ, আমার স্ত্রী সাবিনা মল্লিক দৈনিক সংগ্রামের মহিলা বিভাগের সম্পাদিকা, ইসলামী চিন্তাবিদ ও বিখ্যাত লেখিকা মোহতারিমা শামছুন্নাহার নিজামীরও সহকারী অর্থাৎ দৈনিক সংগ্রামের মহিলা বিভাগের সহকারী সম্পাদিকা। ইতোমধ্যে সাবিনা মল্লিকের 'উলন বিলেন গল্প' নামে একটি গল্পের বইও বেরিয়েছে। লেখালেখির প্রায় সব ব্যাপারেই আমরা একে অপরকে সহযোগিতা করে থাকি।

■ **বাচ্চাদের কথা বলুন। আপনার বসবাস বা প্রতিবেশের কিছু পাঠকদের বলবেন কি?**

– আমার বড় মেয়ের নাম জুম্মি নাহদিয়া- তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী। ও ওর মায়ের স্বভাব পেয়েছে- সারাক্ষণ গল্পের বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকে। কবিতা, ছড়া, গল্প, নাটক লেখা সে ইতোমধ্যে তার মত করে শুরু করেছে।

ছোট মেয়ে- নাজমি নাঁতিয়া বানিয়ে বানিয়ে কি সব গান গায় সারাদিন, ছড়াও কাটে। একটা না একটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পছন্দ করে।

একমাত্র ছেলে- হাসসান মুনহামান্না। সবার ছোট। কথা বলতে শিখেছে। সারাদিন ছুটোছুটি করে। তার মা এবং তার নানীর খুব ভক্ত। আর ভক্ত তার মাহিন মামার। মাহিন জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন ফুলকুঁড়ি আসরের কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলদের একজন।

আমার ছেলেমেয়েদের জন্যে খুব একটা সময় আমি দিতে পারি না, সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকি বলে। এ জন্যে, ওদের যে খুব একটা অভিযোগ আছে আমার প্রতি তা মনে হয় না। কখনো কখনো অভিযোগ করলেও, ওদের মা ইসলামী আন্দোলনের অগ্রসরকর্মী হওয়ার কারণে, সুন্দর করে বুঝিয়ে দেয় বলে, অভিযোগ আবার অনুরাগে পরিণত হয়ে যায়।

www.nagorikpathagar.org

ওরা ওদের ছোট মামা রাহিদের কাছ থেকে আবৃত্তি শেখে। ছোট দুই খালার কাছে শেখে গান। নানীর কাছে শোনে দারুণ সব গল্প। নানী ইসলামী আন্দোলনের সাথে যুক্ত। অসাধারণ গানের গলা তাঁর। কবি শাকিল রিয়াজ ওদের আরেক মামা। ওদের মেঝো মামা এক সময়ের খ্যাতিমান গীতিকার আমিনুল ইসলাম। ওদের মেজো মামী সুমাইয়া নাফিস খুব চমৎকার গল্প লেখেন। আর ওদের গৃহশিক্ষক রোকনুজ্জামান কাজল উচ্চারণ শিল্পীগোষ্ঠীর সহকারী পরিচালক।

আমার শ্বশুরের ইন্তেকালের অল্প কিছুদিন আগে থেকে আমরা এক সাথেই আছি। বসবাস এবং প্রতিবেশের দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে সাহিত্য এবং সাংস্কৃতির পরিবেশে।

■ **কি সে আপনি খুশি থাকেন? খাওয়া-দাওয়ায় পছন্দ অপছন্দ কি?**

– কুরআন অধ্যয়নের ভেতর দিয়ে যে দিনটি আমার শুরু হয়, যে দিনটিতে আমি আমার অফিসিয়াল দায়িত্ব ঠিকঠাকমত পালন করতে পারি, যথাযথ নামায আদায় করতে পারি, পড়াশোনা করতে পারি, লেখালেখি করতে পারি, ইসলামী আন্দোলনের কাজ করতে পারি, পরিবারের জন্যে কিছুটা সময় বরাদ্দ করতে পারি, লেখক-শিল্পীদের সাথে আড্ডা মারতে পারি, গরিব-দুঃখীদের দান করতে পারি; বিশেষ করে কুরআনের একটি আয়াত মুখস্থ করতে পারি, কবিতার দু'টি লাইন মুখস্থ করতে পারি; এবং আলুমাখা বা অন্য কোন ভর্তা, টমেটো বা অন্য কোন টকের ডাল, পালং বা অন্য কোন শাকের তরকারী দিয়ে দু'টো ভাত খেতে পারি, সেদিনটি ভর আমি খুব খুশি থাকি।

আমি গুটিয়ে যাই- বদমেজাজী নেতা দেখলে, সুবিধাবাদী লেখক দেখলে, কর্কষভাষী সমালোচক দেখলে, পক্ষপাতদুষ্ট সম্পাদক দেখলে, জ্ঞানপাপী বুদ্ধিজীবী দেখলে, চরিত্রহীন রাজনীতি দেখলে, গরিবের শত্রু দেখলে, পোলাও- কোর্মা-বিরানী দেখলে।

■ **আমাদের মুদ্রণ শিল্পে সংকটটা কোথায়? দেশের কথা বলুন?**

– কোথায়, সংকট নেই
আর দেশের কথা?

মার্কিনী কেউ কেউ রুশী
কেউবা চীনা তাই খুশি
কেউ বামে আর কেউ ডানে
কত্তো রকম চাল জানে
কেউ ভারতী কেউ ফ্যাসী
দেশের ভেতর নেই দেশী।। -ফারুক হোসেন

www.nagorikpathagar.org

সত্যি কথা বলতে কি? আল্লাহর আইন এবং সৎ লোকের শাসন ছাড়া কোনোকালেও দেশ এবং দেশের জনগণের সমস্যা দূর হবে না, হতে পারে না।

■ নতুনদের জন্য পরামর্শ কি?

১. কুরআনের ঐ জাহাজ বোঝাই
হিরা মানিক পান্নাতে
লুটে নেরে লুটে নে সব
ভরে তোল তোর শূন্যঘর।। -নজরুল

২. দিকে দিকে ঐ জ্বলিয়া উঠিছে
দ্বীন ইসলামী লাল মশাল

ওরে বেখবর তুইও ওঠ জেগে
তুই তোর প্রাণ প্রদীপ জ্বালা।। -নজরুল

৩. আজকে ছোট কালকে মোরা
বড় হবো ঠিক
জ্ঞানের আলোয় আমরা আলো
করবো চতুর্দিক।। -ওস্তাদ আবদুল লতীফ

৪. ভীত-কম্পিত যারা কাপুরুষ ঘৃণ্যতম
মুক্তি-আজাদী তাহাদের তরে রুদ্ধদ্বার
গোলামী তসবি পড়িছে তাহার দমবদম
পরিহারো যত মোনাফেকীন
মুর্দার তরে নহে গো বন্ধু তোমার দীন।। - বে'নজীর আহমদ

৫. আজকে তোমার পাল উঠাতেই হবে
ভাঙা মাস্তুল দেখে দিক করতালি
তবুও জাহাজ আজ ছোটাতেই হবে। -ফররুখ

৬. জীবনের চেয়ে দৃপ্ত মৃত্যু তখনি জানি
শহীদি রক্তে হেসে ওঠে যবে জিন্দেগানী।। -ফররুখ

৭. তোমরাই আমাদের আশার স্থল। কিন্তু তোমরা আত্ম-বিস্মৃত তাই আজ আমরাও অধঃপতিত। যতদিন পর্যন্ত তোমরা আপনাদিগকে না জানিতেছ, ততদিন পর্যন্ত আমাদের আশা ফলবতী হইতেছে না। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

[৮ই মার্চ ১৯৯৬ সালে 'সোনার বাংলা' পত্রিকায় এই সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন- শাহীন হাসনাত]

www.nagorikpathagar.org

[অগ্রন্থিত সাক্ষাৎকার- ২]

গানের মধ্যে আমি সবসময় গভীর এবং অপ্রতিরোধ্য আবেগ অনুভব করি

কবি মতিউর রহমান মল্লিক এদেশের একজন খ্যাতিমান কবি। শুধু কবি কেন-তিনি সফল গীতিকার, সুরকার, প্রাবন্ধিক এবং শিল্পীও। কবিতা, গানের পাশাপাশি অনুবাদে রয়েছে তার অসাধারণ অবদান। সবার প্রিয় উপন্যাস 'পাহাড়ি এক লড়াকু' ছাড়াও অনুবাদ-কাজে তার সুনাম সাহিত্যাঙ্গনে কম নয়। তার ছড়া-কবিতা-গানে রয়েছে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার সাহসী প্রেরণা, জাতিকে জাগিয়ে তোলার অনন্য পদক্ষেপ। সত্যের ব্যাপারে সবসময়ই তিনি আপসহীন। কবি মল্লিক মূলত ছোটবেলা থেকেই ইসলামী ঐতিহ্যে লালিত। জীবনের শুরু থেকেই ইসলামী তাহজীব-তমদ্দুনের সাথে সম্পর্ক ছিল গভীর। জীবনের অনেকগুলো ধাপ পেরিয়ে আজ তিনি সকলের প্রিয় মানুষ বললে মোটেও অত্যুক্তি হবে না।

গানে-গানে মুসলিম জাতির চরিত্র, ঐতিহ্য, করণীয় সৃষ্টি রহস্যসহ বিভিন্ন বিষয় খুব চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন যা অনেকের পক্ষেই করা অসম্ভব।

তার একক গানের ক্যাসেট বের হয়েছে। বেশ কয়েকটি গান হৃদয়ে নাড়া দেয়। তিনি বিরামহীনভাবে লিখে যাচ্ছেন। এ পর্যন্ত তাঁর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে পাঁচটি।

কিশোরকণ্ঠ : কিভাবে বেড়ে উঠেছেন।

মল্লিক : আমার আব্বা আমার ৪/৫ বছর বয়সে মারা যান। ১৩ ভাই বোনের মধ্যে আমি সবার ছোট। আমার যখন কিছু বুঝবার বয়স হয়েছে তখন আমি পেয়েছি ২ ভাই ২ বোনকে আর সকলেই ইন্তেকাল করেছেন। তাদের থেকে বয়স আমার অনেক কম। মজার ব্যাপার হলো, বড় ভাইয়ের বড় মেয়ে আমার বয়সী এবং বড় বোনের বড় মেয়ে আমার বড়।

www.nagorikpathagar.org

আমি ছিলাম মায়ের শেষ সম্বল। ছোটবেলায় আমার সবকিছু মাকে কেন্দ্র করেই হয়েছে। মায়ের অভ্যাস ছিল ছড়া বানিয়ে বানিয়ে গল্পের আসর জমানো। মায়ের কাছে শুনেছি এবং আমার শিক্ষকদের কাছেও শুনেছি- আমার আব্বা ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানপিপাসু। বাড়ি থেকে ২/৩ মাইল দূরে ফকিরহাটে হেঁটে গিয়ে প্রায়ই দৈনিক পত্রিকা পড়ে আসতেন। আব্বা ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষক। ফুরফুরা শরীফের পীরের মুরিদ। সুন্দরবন অঞ্চলে এখনো আব্বার কিছু ভক্ত-ছাত্র-মুরিদ আছে। আব্বা ছিলেন খুব উঁচুমানের একজন বক্তা। তাঁর বক্তৃতায় খুব বেশি ফার্সি বয়াত থাকত। ফার্সি ও উর্দু কবিতা থাকত।

বড় ভাই একজন নামজাদা কবি ও হাইস্কুলের শিক্ষক। এলাকার কোন মুরব্বিরা আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করলে এখনো বলতে হয় কায়েম মুন্সী সাহেবের ছেলে আমি অথবা কবি সাহেবের ছোট ভাই আমি। বড় ভাইয়ের বিপুল পরিমাণে বইয়ের সংগ্রহ ছিল। যাতে বিশ্বসাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, বিশেষ করে বাংলা ভাষার প্রায় সব কবির কবিতার বই।

শিক্ষার শুরুতেই ছোটবেলায় বাড়িতে পেয়েছিলাম- আমাদের এলাকার প্রখ্যাত ক্বারী রুহুল আমিন সাহেবকে। যিনি অত্যন্ত পরহেজগার মানুষ। বিদ্যুৎসাহী মানুষ। এই ক্বারী সাহেবের যত্নে এবং স্নেহে আমার বেড়ে ওঠা আরম্ভ। আম্মাও ছিলেন অত্যন্ত শিক্ষানুরাগী, সব ব্যাপারে তিনি ছাড় দিলেও লেখাপড়া ও নামাজের ব্যাপারে কোন ছাড় দিতেন না। আম্মা বুড়ো বয়সেও কারী সাহেবের কাছে- আমাদের সাথে- পর্দার আড়ালে থেকে কুরআন পড়তেন।

বাড়িতে ক্বারী সাহেবের কাছে পড়তে পড়তেই সরাসরি মাদ্রাসায় ভর্তি হই। ভর্তি হই তৎকালীন দাখেলে আউয়াল অর্থাৎ বর্তমান ফাইভে, আমি কখনও প্রাথমিক স্কুলে পড়িনি। প্রথম থেকেই মাদ্রাসায় পড়েছি। এবং মাদ্রাসায় পড়াটা আমার জন্যে অত্যন্ত গৌরবের বিষয় হয়ে গিয়েছে।

বাংলাদেশ হওয়ার পর আওয়ামী লীগ সরকারের হাতে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা চরমভাবে মার খাওয়ার কারণে, কিছুদিন রামপালের উজলকুড় হাই স্কুলে পড়াশোনা করেছি। উজলকুড় হচ্ছে মংলা পোর্টের কাছে রামপাল নামের একটি থানার হাইস্কুল। কিছুদিন ড. নীলিমা ইব্রাহীমের গ্রামের হাইস্কুল মূলঘর হাইস্কুলেও পড়াশোনা করেছি।

www.nagorikpathagar.org

আমার গ্রামের মাদ্রাসার নাম বারুইপাড়া সিদ্দিকীয়া সিনিয়র মাদ্রাসা। এই মাদ্রাসাতেই মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী সাহেবও পড়াশোনা করেছেন। এখানেই আমি ফাযিল পর্যন্ত পড়াশোনা করেছি। আর কামেল কিছুদিন পড়েছি খুলনা আলিয়া মাদ্রাসায়। মাঝখানে কিছুদিন বাগেরহাট আলিয়া মাদ্রাসায় ও যশোর লাউড়ী আলিয়া মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেছি। ইন্টারমিডিয়েট পড়েছি বাগেরহাট পিসি কলেজে। বাংলায় অনার্স পড়েছি ঢাকা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে।

কিশোরকণ্ঠ : লেখালেখিতে কিভাবে এলেন এবং কাদের অনুপ্রেরণায়?

মল্লিক : মূলত বাড়ির পরিবেশ ছিল সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার পরিবেশ। আব্বা ছিলেন এলাকার খ্যাতিমান জারী গানের লেখক। ছোট চাচা ছিলেন জারী গানের দক্ষ গায়ক ও ওস্তাদ। বড় ভাই প্রখ্যাত কবি ও বাংলা ভাষার শিক্ষক। মেজো ভাই ক্রীড়াবিদ ও ছোটগল্পকার। আম্মা স্বভাব ছড়াকার। এ রকম একটি সাংস্কৃতিক পরিবশে বেড়ে ওঠার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সাহিত্যাঙ্গনে, কাব্যাঙ্গনে প্রবেশের প্রধান অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে আমার বড় ভাই মল্লিক আহমদ আলী। আমার মাদ্রসার প্রায় সব শিক্ষকই আমাকে উৎসাহিত করেছেন। বিশেষ করে আমার শিক্ষক মাওলানা আবদুল হাইয়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

গ্রামের পরিবেশটাও ছিল সাহিত্য-সংস্কৃতির অনুকূলে। আমরা বেশ কয়েকজন একসাথেই লেখালেখি শুরু করেছি। যাদের মধ্যে কবি ও গীতিকার শাহ মুহাম্মদ মতিয়ার রহমান উল্লেখযোগ্য। মতি ফরাজী নামেই তার সর্বাধিক পরিচিতি। আমার এই বন্ধু বর্তমানে বাগেরহাট জেলা জাসাসের সহ-সভাপতি। তার একটি স্বরচিত ও স্বসুরারোপিত গানের ক্যাসেট সাইফুল্লাহ মানছুরের স্টুডিওতে রেকর্ড হয়ে আছে। কিন্তু আর্থিক সমস্যার কারণে আমি তা এখনও প্রকাশ করতে পারি নাই।

আমাদের গ্রামটা সত্যিই সাংস্কৃতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ। নদীর ঘাটে কিংবা খেলার মাঠে কিংবা দিঘীরঘাটে প্রায় প্রতিদিনই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতো। এসব অনুষ্ঠানের অপরিহার্য শিল্পী ছিল রজব আলী, অসাধারণ পল্লীগীতির গলা তার। একেবারেই গরিবের ছেলে, এখনও হাটে হাটে গান গেয়ে গেয়ে ঔষধ বিক্রি করে সংসার চালায়। শাহ মতিয়ার রহমানের কথা আগেই বলেছি। আমাদের ঐ সব আসরের আর এক মধ্যমণি আকবর আজাদ। ও এখন বাগেরহাট জেলা জাসাসের সভাপতি। সুতরাং আমার সাংস্কৃতিক চৈতন্যকে আমার গ্রাম আরও তীক্ষ্ণ করেছে। এখনতো আমাদের গ্রামে প্রতিবছর সাংস্কৃতিক উৎসব হচ্ছে। উৎসবের

www.nagorikpathagar.org

নেতৃত্ব দিচ্ছে খানজাহান আলী শিল্পীগোষ্ঠী বাগেরহাট, আমাদের এলাকায় ইসলামী সাহিত্য পরিষদ নামে আরো একটি সাহিত্য সংগঠনও রয়েছে। এ শিল্পীগোষ্ঠীর অধিকাংশ শিল্পীরাই আমাদের এলাকার। অর্থাৎ বারুইপাড়া, আড়পাড়া, মূলঘর, কাঁঠালতলা, পাইকপাড়া, সোতাল, কাঁটাখালী, ভট্টপ্রতাপ, অযোধ্যা, কার্তিকদিয়া, বাগদিয়া ইত্যাদি অঞ্চলের। এ শিল্পীগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতা করছেন- মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদীর সরাসরি ছাত্র মাওলানা মুজিবুর রহমান, শাহ মতিয়ার রহমান, আকবর আজাদ প্রমুখ। এ শিল্পীগোষ্ঠীর সার্বিক পরিচালনায় রয়েছে অধ্যাপক হায়দার আলী। তাকে সহযোগিতা করছে এলাকার অন্তত ২ডজন অধ্যাপক-শিক্ষক। যেমন- অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার, অধ্যাপক মুহাম্মদ ঈসা, অধ্যাপক জিল্লুর রহমান, মাওলানা আবু জাফর, অধ্যাপক হাসিবুর রহমান। অধাপক ওয়ালিউর রহমান, মাওলানা মোস্তফাসহ আরো অনেকে। ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের সাথে যুক্ত হওয়ার পর সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে আমি সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছি এবং প্রশ্রয় পেয়েছি আমার সংগঠনের নেতাদের কাছ থেকে। যাদের মধ্যে অধ্যাপক মতিয়ার রহমান খান, জনাব সিদ্দিক জামাল, জনাব আনসার উদ্দিন হেলাল, জনাব বাসারাত হোসেন বকুলের নাম অবিস্মরণীয়।

আমার বন্ধুরাও আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন হৃদয় ও মন দিয়ে। যাদের মধ্যে মাওলানা মজিবুর রহমান [মুজিব দাদা], মাওলানা তালেবুর রহমান, মাওলানা আশরাফ আলী, মৌলভী আব্বাস সাহীদ, সমীর কুমার বোস, মোস্তফা কামাল, মাহফুজ হালদার, মাহমুদুল হাসান হালদার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমার সাংগঠনিক জীবনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্সের শিক্ষক মুজাহিদুল ইসলামের নাম সত্যিই বারবার স্মরণ করতে হয়। স্মরণ করতে হয় আমিন দুদু ও হাফেজ সুলতান আহমদকে।

সাংগঠনিক জীবনের এক পর্যায়ে অসাধারণ আনুকূল্য দিয়েছিলেন- সর্বজনাব মীর কাসেম আলী, আবু নাসের মুহাম্মদ আবদুজ্জাহের, মুহাম্মদ কামারুজ্জমান, আব্দুল কাদের মোল্লা, অধ্যক্ষ মাওলানা আবু তাহের, ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব, সাইফুল আলম খান মিলন, মাসুদ মজুমদার, তাসনীম আলম, আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, অধ্যাপক নাজির আহমদ, আবদুল মান্নান তালিব প্রমুখ।

মূলত আমার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে ওঠার পেছনে ইসলামী আন্দোলনের অবদান হচ্ছে সবচেয়ে বেশি।

www.nagorikpathagar.org

কলেজে পড়াকালে আমাকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা দিয়েছেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক শাহ্ হালিমুজ্জামান, অধ্যাপক গোলাম রসূল, অধ্যাপক অনীল হালদার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এককালের শিক্ষক প্রখ্যাত কবি আবু বকর সিদ্দিক, ষাট দশকের অন্যতম লেখক কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ এবং প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও ঔপন্যাসিক শওকত আলী।

কিশোরকণ্ঠ : কেন লেখালেখি করেন?

মল্লিক : ছোটবেলা থেকে লেখালেখির মধ্যে আনন্দের সন্ধান করছিলাম। এইভাবে এক পর্যায়ে লেখালেখির মধ্য দিয়ে সত্য ও সুন্দরের সন্ধান করেছি। এখন লেখালেখি নিয়ে আছি- সর্বোত্তম সত্য ও সর্বোত্তম সুন্দর প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সর্বোচ্চ ভূমিকা রাখার জন্য।

কিশোরকণ্ঠ : বাংলাদেশের শিশুসাহিত্য সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

মল্লিক : বাংলাদেশের শিশুসাহিত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বাংলাদেশের শিশুসাহিত্য সারা বিশ্বের শিশুসাহিত্যের চেয়ে, মানের দিকে থেকে আদৌ নিম্নমানের নয়। এ ক্ষেত্রে প্রকাশনার সমস্যাই বড় সমস্যা। এবং বাজারজাতকরণের ব্যাপারটি ঐ সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। সোজা কথায় শিশুসাহিত্যের হাজার পাণ্ডুলিপি পড়ে আছে লেখকদের ঘরে ঘরে, যৎসামান্য যা প্রকাশিত হচ্ছে তাই দিকে দিকে আলোড়ন তুলছে।

শিশুসাহিত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর এক চোখা-নীতি। এবং প্রকাশনা সংস্থাগুলোর অদূরদর্শিতা এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে দায়ী।

কিশোরকণ্ঠ : এ সমস্যা সমাধানে কি পদক্ষেপ নেয়া যায় বলে আপনি মনে করেন।

মল্লিক : এ সমস্যা সমাধানে যদি ব্যক্তি ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে ওঠে, সেই সঙ্গে প্রতিটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসে তাহলেই লাভ হবে সবচেয়ে বেশি। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলবাজী থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। এবং প্রকৃতপক্ষে সমগ্র জাতিকে বড় করে দেখতে হবে। ব্যাংকগুলোকে আর্থিক উন্নয়নের পাশাপাশি জাতীয় উন্নয়নের ভবিষৎ নাগরিক গঠনের লক্ষে সমানভাবে পরিকল্পনা নিতে হবে। সর্বোপরি শিশুকার্যক্রমের ব্যাপারে উপেক্ষার মনোভাব ত্যাগ করতে হবে সবাইকে।

www.nagorikpathagar.org

কিশোরকণ্ঠ : আপনার ছেলেবেলা এবং বর্তমান সময়ের শিশুদের ছেলেবেলার মাঝে পার্থক্য করেন কি?

মল্লিক : পার্থক্য তো আছেই আর এ পার্থক্যটা স্বাভাবিক। তবে মৌলিক দিক থেকে বিচার করতে গেলে আসলে কোন পার্থক্য নেই।

আমাদের ছেলেবেলায় আমরা ফুটবল খেলা নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম। এখনকার ছেলেরা ব্যস্ত থাকছে ক্রিকেট খেলা নিয়ে। আমরা ব্যস্ত থাকতাম গল্পের বই নিয়ে। এখনকার ছেলেমেয়েরা ব্যস্ত থাকে কম্পিউটার নিয়ে। আমরা ব্যস্ত থাকতাম আব্বা-পরিবার-আত্মীয়-স্বজন নিয়ে এখন ব্যস্ত থাকে পরিপার্শ্ব ও বহির্বিশ্ব নিয়ে। দুঃখ শুধু একটি ক্ষেত্রে, সেটি হলো আমরা সে সময়ে পরিবার, বিদ্যালয় এবং পরিবেশের কাছ থেকে অহরহ ভালো হবার উৎসাহ পেতাম সেখানে আজকে ভালো হবার জন্যে এবং সৎ হবার জন্যে উৎসাহ দেবার পরিবেশই যেন সীমিত হয়ে আসছে। তবুও এই দুঃখজনক অবস্থার বিরুদ্ধে একটি আন্দোলন যে-প্রবলতর হয়ে উঠছে তা আমরা টের পাচ্ছি- সবচেয়ে সান্ত্বনা এখানেই।

কিশোরকণ্ঠ : বর্তমানে কবিদের একাংশের মাঝে রেষারেষি, একজন আরেক জনকে স্বীকৃতি দিতে চান না। এক্ষেত্রে একজন কবি হিসেবে আপনার বক্তব্য জানতে চাই।

মল্লিক : ঐ রেষারেষিটা মৌলিক চিন্তা না- থাকার কারণে, আসলে শত্রু না-চেনার কারণে অসততা এবং অদূরদর্শিতার কারণে।

তবে সত্যিকারের কবিদের মধ্যে কোনো রেষারেষি নেই; আছে বন্ধুত্ব এবং ভ্রাতৃত্ববোধের পবিত্রতম বিবেচনা।

কিশোরকণ্ঠ : আপনার প্রিয় লেখক কারা?

মল্লিক : আমার প্রিয় লেখক এজরা পাউন্ড, টলস্টয়, ইকবাল, নজরুল, ফররুখ। মাইকেল, মধুসূদন দত্তও আমার প্রিয় লেখক। যেমন প্রিয় আল মাহমুদ।

সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদীর লেখা আমার দারুণ রকমের প্রিয়। কিন্তু আমার প্রিয়তম লেখক হচ্ছেন- হাস্‌সান সাবিত, আবদুল্লাহ রাওয়াহা, আলী আবু তালিব এবং লবীদ (রা.)।

কিশোরকণ্ঠ : শিশুদের জন্য আপনার ব্যক্তিগত পরিকল্পনা কি?

মল্লিক : শিশু-কিশোর ভাই-বোনদের জন্যে অনেক বেশি লিখতে চাই। এবং সব ধরনের লেখা। আপাতত বেশি-বেশি অনুবাদ করবো বলে একটা

www.nagorikpathagar.org

সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ইতিমধ্যে অনেকগুলো বিদেশী শিশুতোষ গল্পের বই আমি সংগ্রহ করেছি- 'পাহাড়ি এক লড়াকু' শেষ হয়ে গেলেই শুরু করবো ইনশাআল্লাহ।

কিশোরকণ্ঠ : গানের জগতে কিভাবে এলেন?

মল্লিক : আমার আব্বা গীতিকার ছিলেন। মা ছিলেন মুখে-মুখে ছড়া-কাটায় দক্ষ। চাচা ছিলেন গায়ক। বড় ভাই কবি আহমদ আলী মল্লিক এক বড় মাপের কবির নাম।

গানের কথাই বলুন আর কবিতার কথাই বলুন সবই আমার রক্তের উত্তরাধিকার।

গানের মধ্যে আমি সবসময় গভীর এবং অপ্রতিরোধ্য আবেগ অনুভব করি। আমার এই গানের আবেগে ইসলামী আন্দোলন এনে দিয়েছে বহতাগতি এবং অন্য এক চৈতন্য। এসব কথাতো আমি আগেই বলেছি; তাই না? তবু এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় গানের জগতে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী।

কিশোরকণ্ঠ : কোন সময় লেখালেখি করতে ভালো লাগে?

মল্লিক : বাদ ফজর লেখালেখি করতেই আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে। তবে ভোর রাতের আকর্ষণকে উপেক্ষা করতে পারি না- এ সময়টা কাটে আমার পড়াশোনা করে।

কিশোরকণ্ঠ: আপনি একাধারে কবি, গীতিকার, সুরকার, শিল্পীও। কোনটাকে অগ্রাধিকার দেন?

মল্লিক : কখনো মনে হয় আমি একজন কবি, কখনো মনে হয় আমি একজন গীতিকার, কখনো মনে হয় আমি একজন সুরকার, কখনো মনে হয় আমি একজন শিল্পী; আবার কখনো মনে হয় না-না, আমি কিছুই না- বড়জোর ঐসব অঙ্গনের অক্ষম এবং মাঠকর্মী মাত্র। এবং বিস্মৃতির অতল তলই আমার সর্বশেষ ঠিকানা।

কিশোরকণ্ঠ : আপনার পারিবারিক জীবন সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

মল্লিক : মজার প্রশ্ন বটে। আমার স্ত্রী একজন ব্যাংকার। ইসলামী ব্যাংকের অফিসার। গল্পলেখায় সত্যিই দক্ষ। সাবিনা মল্লিক নামেই পরিচিত। বড় মেয়ে জুম্মি নাহদিয়া-বাদশাহ ফয়সাল স্কুলে ক্লাস এইটে পড়ে। কবিতা লেখে। গানের গলা খুব ভালো। ছোট মেয়ে নাজমি নাঁতিয়া- ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন ইন্টান্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজে পড়ে। ওরও চমৎকার গলা। একমাত্র ছেলে হাস্‌সান মুন্‌হামান্না। ও পড়ে

www.nagorikpathagar.org

ইসালামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজে। গান গাইতে পারে, তবে আবৃত্তিতে ভালো।

আসলে আমার ছেলেমেয়েদের নানী সত্যি সত্যিই একজন মেধাবী শিল্পী। সেই কারণে ওদের কণ্ঠও সুন্দর এবং সুরেলা হয়েছে বলে আমার মনে হয়।

কিশোরকণ্ঠ : ইসলামী আন্দোলনকে সফলতার দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক আন্দোলন কতটুকু সহযোগিতা করতে পারে?

মল্লিক : আগেই বলেছি ইসলামী আন্দোলন এবং ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্যে মূলত কোনো পার্থক্য নেই। ইসলামী আন্দোলনও যা, ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনও তাই। তবু কাজের সুবিধার জন্যে কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করাই ইসলামী আন্দোলনের নামে এবং কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নামে।

আসলে মাথার মগজ যেমন গোটা শরীরকে সহযোগিতা করে, ঠিক তেমনটিই ইসলামী আন্দোলনকে সহযোগিতা করতে পারে ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলন।

কিশোরকণ্ঠ : বাংলাদেশে ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনে কি কি অসুবিধা আপনি অনুভব করেন? এর সমাধান কি?

মল্লিক : ইসলামী আন্দোলন এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্যে যে কোনো পার্থক্য নেই- এই বোধের অভাবই ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পথে সবচেয়ে বড় অসুবিধা। অধিকাংশ লোক ইসলামী আন্দোলন বোঝে না বলেই ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনও বোঝে না।

জাতীয় পর্যায়ের কোনো কেন্দ্রীয় সংগঠন এখনো গড়ে ওঠেনি; গড়ে ওঠেনি কোনো কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান- এসব অসুবিধার সাথে সাথে উপায়-উপকরণের অভাব তো আছেই। তবে ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের জন্যে অর্থ খরচের প্রয়োজন নেই বরং এ অপচয় না করাই ভালো এ ধরনের মনোভাবই ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পথে সবচেয়ে বড় অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবু ঘন-কালো-মেঘ চিরকালের জন্যে আকাশ আটকে রাখতে পারে না। পারছেও না।

কিশোরকণ্ঠ : কিশোরকণ্ঠ পত্রিকার নামকরণ তো আপনিই করেছিলেন? বর্তমানে কিশোরকণ্ঠ সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি?

মল্লিক : হ্যাঁ, কিশোরকণ্ঠের নামকরণটা করেছিলাম আমি। তবে এই নামকরণ

www.nagorikpathagar.org

করার কাজটা করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন তৎকালীন কিশোরকণ্ঠের উদ্যোক্তাদের একজন ও বর্তমানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের রেজিস্ট্রার, খ্যাতিমান লেখক সাহিত্যক ও গীতিকার আ.জ.ম ওবায়দুল্লাহ ভাই। তিনিই আমার কাছে একটি শিশু-কিশোর পত্রিকার নাম চেয়েছিলেন। আমি বেশ চিন্তাভাবনা, করেই নামটি দিয়েছিলাম। কিন্তু আমি তখন ভাবতেই পারিনি, নামটি তিনি এবং তার সহকর্মীরা গ্রহণ করবেন।

আসলে কিশোরকণ্ঠকে সত্যিই ভালোবেসে ফেলেছি, যাকে বলে প্রচণ্ড রকমের ভালোবাসা। তাই মূল্যায়ন করতে যাবো না। শুধু বলবো- কিশোরকণ্ঠের কোনো তুলনা হয় না। কেননা কিশোরকণ্ঠ আমার পত্রিকা, আমার আদরের ছেলে-মেয়েদের পত্রিকা, তাদের মায়ের পত্রিকা এবং আমার স্বজনদেরও পত্রিকা। পারতপক্ষে মূল্যায়ন করলাম না কিন্তু কয়েকটি দাবি তো পেশ করতে পারি।

১. অন্তত দুইবছর অন্তর অন্তর 'কিশোরকণ্ঠ শিশু-কিশোর সাহিত্য-পুরস্কার' প্রদান করতে হবে।
২. অন্তত দুই বছর অন্তর শিশু-কিশোর সাহিত্য-সম্মেলন করতে হবে।
৩. কিশোরকণ্ঠ গল্প-সংকলন, কিশোরকণ্ঠ ছড়া-সংকলন, কিশোরকণ্ঠ প্রবন্ধ-সংকলন ইত্যাদি প্রকাশ করা

কিশোরকণ্ঠ : কিশোরকণ্ঠ পাঠকদের উদ্দেশ্যে আপনার কিছু বলার আছে কি?

মল্লিক : হ্যাঁ, আছে তো বটেই।

১. খুব ভালো করে কিশোরকণ্ঠ পড়তে হবে। ভুল ধরিয়ে পরামর্শ দিতে হবে। লেখকদেরকে উৎসাহিত করে চিঠি লিখতে হবে।
২. পাঠক ফোরাম [কিশোরকণ্ঠ পাঠক ফোরাম] গড়ে তুলতে হবে। এবং গ্রাহক বাড়াবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।
৩. কিশোরকণ্ঠকে একটি সর্বোত্তম শিশু-কিশোর পত্রিকা হিসাবে দাঁড় করাবার জন্য সবরকমের সহযোগিতা করতে হবে।
৪. কিশোরকণ্ঠের জন্যে আন্তরিকভাবে দোয়া করতে হবে। যেন আল্লাহ পত্রিকাটিকে শিশু-কিশোরদের জন্য সঠিক পথের প্রদর্শক হিসেবে কবুল করে নেন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে : মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম

www.nagorikpathagar.org

[অগ্রন্থিত সাক্ষাৎকার- ৩]

ইসলামের আলো গ্রহণ করেই আমাদের সাংস্কৃতিক অন্ধকার দূর করতে হবে

মতিউর রহমান মল্লিক বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট কবি, গীতিকার, গায়ক এবং সংগঠক। সাংস্কৃতিক অঙ্গনের মানুষ হিসেবে জনগণের হৃদয়ের স্পন্দনটা তিনি ভালোই অনুভব করতে পারেন। তাঁর সাক্ষাতকারটি গ্রহণ করেছেন- তৌহিদুর রহমান।

সংগ্রাম : বাংলাদেশের জনগণের সংস্কৃতি ও মিডিয়া সংস্কৃতি কি এক? এক না হলে তার কারণ কি?

মল্লিক : এদেশের সংখ্যাগুরু জনগণের বিশ্বাস ও আদর্শ এবং তার দ্বারা নির্ধারিত চেতনার বহিঃপ্রকাশ-ই হলো বাংলাদেশের জনগণের সংস্কৃতি বা জনসংস্কৃতি (Public culture)। সুতরাং সুস্পষ্ট সত্য হলো- এদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তি হচ্ছে ইসলাম।

মিডিয়া বলতে আমরা বুঝে থাকি রেডিও, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, নাট্যশালা ও নাটক, বিজ্ঞাপন শিল্প, সঙ্গীত শিক্ষালয়, নাট্যবিদ্যালয়, আর্টস্কুল, ফ্যাশন শো, মেলা, জাদুঘর, ভাস্কর্য, শিক্ষাঙ্গন, লাইব্রেরী, খেলাধুলা, সংবাদপত্র, সাহিত্য, পাঠ্য-পুস্তক, সেমিনার, এনজিও, ধর্মাচরণ ইত্যাদি।

বর্তমান পরিস্থিতির দিকে তাকালে বাংলাদেশের জনসংস্কৃতি ও মিডিয়া সংস্কৃতি যে এক নয় তা প্রমাণিত। মিডিয়াগুলো যারা পরিচালনা করছেন বা যাদের উপর এ-দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তারা সংখ্যাগুরু মানুষের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ঐতিহ্যবাহী সুস্থ-সংস্কৃতিকে অগ্রাহ্য, ঘৃণা ও অবজ্ঞার তীরে বানবিদ্ধ করায় অভ্যস্ত। প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছে বাংলাদেশ নামক আমাদের এই প্রিয় ভূ-খণ্ডটির অভ্যুদয়ের পর

www.nagorikpathagar.org

থেকে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর যে দলটি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল, তারা দেশের সবগুলো সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান দখল করে নেয় এবং তাদের সেক্যুলার চিন্তা-ভাবনায় বিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গকে সমস্ত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োগ প্রদান করে। এখনো তারাই সেসব প্রতিষ্ঠানসমূহ দখল করে আছেন। তারাই আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী, বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সংস্কৃতির শেকড় কাটতে নিয়োজিত। সুতরাং এক তো নয়ই বরং একটি সাংঘর্ষিক অবস্থানে রয়েছে আমাদের মিডিয়া সংস্কৃতি ও জনসংস্কৃতি।

সংগ্রাম : দেশে নানা দিক থেকে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চলছে বলে অনেকে মনে করেন। এর স্বরূপ সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

মল্লিক : দেশে নানা দিক থেকে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চলছে এ কথা অনেকে নয়, প্রায় সকলেই মনে করেন। যারা নীতি-নৈতিকতায় বিশ্বাসী, যাদের অন্তরের প্রকোষ্ঠে ধর্মীয়বোধ এখনো সজাগ, যারা সত্য ও সুন্দরের উপাসনায় নিজেদের মগ্ন রাখতে চান, এমন প্রতিটি সচেতন মানুষই দেশে নানা দিক থেকে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন পরিচালিত হচ্ছে বলে মনে করেন।

আগ্রাসনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করলে, বলতে হয় জনবিচ্ছিন্ন সেক্যুলার চিন্তা দ্বারা অচ্ছন্ন শেকড় কাটা, জ্ঞানপাপী কিছু আধমরা আত্মবিক্রিত রাম বাম বুদ্ধিজীবীর ইঙ্গিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে আমাদের মহাগৌরবময় মুসলিম আচরণকে পরিত্যাগ করে হিন্দুয়ানী সংস্কৃতিকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। যেমন- মঙ্গল প্রদীপ জ্বালানো, উলুধ্বনি ইত্যাদি সব আপত্তিকর গোলামী মানসিকতাপূর্ণ আচরণ। মসজিদের নগরী বলে খ্যাত ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মূর্তি নির্মাণ করে সমগ্র জাতিকে পৌত্তলিকতার পাঁকে নিমজ্জিত করেছে। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে পাশ কাটিয়ে গীতা, উপনিষদের হিন্দু-দর্শনে বিশ্বাসী কবিকে চাপিয়ে দেয়ার প্রয়াসের কথাও এখন সবারই জানা। “শিখা চিরন্তন” জ্বালানোর মধ্য দিয়ে জাতিকে শিরকের সাথে যুক্ত করার প্রয়াসও লক্ষণীয়।

সর্বোপরি সমগ্র জাতিকে শিরকের সাথে যুক্ত করার জন্য শিরকপন্থী পৌত্তলিক গোষ্ঠী যেন উঠেপড়ে লেগেছে। সরকারী অনুষ্ঠানাদিতে পবিত্র কুরআন পাঠের পর অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের গ্রন্থ পাঠের প্রক্রিয়া পবিত্র কুরআনকে চরমভাবে অপমান করার তুল্য কাজ। সমগ্র জাতি এ প্রক্রিয়াকে ধিক্কার জানানো সত্ত্বেও ক্ষমতাসীনরা এ কার্যক্রম চলমান

www.nagorikpathagar.org

রেখেছেন। এছাড়া বলা যায় আকাশ সংস্কৃতির নামে ভারতীয় অশ্লীল নাচ-গান-ছায়াছবির অবাধ প্রদর্শন সমগ্র জাতিকে যৌনতার জাতিতে পরিণত করার কু-প্রবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়। এছাড়াও শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলাম, ইসলামী বিষয়াদিকে পরিত্যাগ করার পরিকল্পিত অপপ্রয়াস লক্ষণীয়। রেডিও, টেলিভিশনসহ প্রচার মাধ্যমগুলোতে ইসলাম, ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও ইসলামী মূল্যবোধকে হেয়প্রতিপন্ন করার ঘৃণ্য মানসিকতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। মোটকথা সর্বক্ষেত্রেই এখন প্রবল আগ্রাসনের ছবি ভেসে উঠছে।

সংগ্রাম : সংস্কৃতি প্রসঙ্গে গ্রহণ ও বর্জনের কথা প্রচলিত আছে। এর ভিত্তি কি হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন।

মল্লিক : ব-দ্বীপ বাংলার অধিকাংশ মানুষ ধর্ম বিশ্বাসে ইসলামী জীবনধারায় বিশ্বাসী। এ-বিশ্বাস লাভ করেছি আমরা পবিত্র কুরআন থেকে। সুতরাং গ্রহণ বর্জনের ক্ষেত্রে মানদণ্ড হলো নির্দেশমালা অনুযায়ী। আমরা সকলেই জানি পবিত্র কুরআন পৃথিবীর মাটিতে আগমনের সাথে সাথেই আরবের জাহেলী সমাজ পরিবর্তিত হয়ে নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির উদ্ভাবন করেছিলো। যার আলোয় প্রাচ্য-পাশ্চাত্য মূর্খতার অন্ধকার থেকে আলোকের রাজ্যে প্রবেশ করে ধন্য হয়েছিলো। এই ইতিহাস আমাদের জানা আছে। সুতরাং আমাদের কাজ হবে ইতিহাসের পুনঃনির্মাণ, যার ফলে সেই চির নতুন আদর্শকে অবলম্বনের মাধ্যমে আলোকিত জাতি হিসেবে পৃথিবীতে দৃষ্টান্ত হয়ে অন্যের অনুপ্রেরণাকারী হিসেবে আবারও আবির্ভূত হতে পারি।

একটি কথা সব সময় সর্ব অবস্থায় মনে রাখতে হবে, ইসলাম কোন বিশেষ জনগোষ্ঠী, বিশেষ কোন মানচিত্রের জন্যে পৃথিবীতে আগমন করেনি। এটি একটি সার্বজনীন ও বিশ্বজনীন মতাদর্শ। এ মতাদর্শ থেকে সকলেই আলো গ্রহণ করে নিজ নিজ গৃহের অন্ধকার দূরীভূত করতে পারে। সুতরাং আমাদেরকে সেই আলো থেকেই আলো গ্রহণ করে সাংস্কৃতিক অন্ধকার দূরীভূত করতে হবে।

সংগ্রাম : দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সংস্কৃতির স্বরূপ কেমন হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন।

মল্লিক : বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব জনাব আরিফুল হক বলেন, "কালচার হচ্ছে জাতির প্রাণ। সেই প্রাণশক্তিকে অরক্ষিত রেখে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তিসমূহ জাতিকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। প্রাণ অরক্ষিত রেখে শুধু শরীরের হেফাজত করলে যেমন প্রাণ বাঁচানো যায় না,

www.nagorikpathagar.org

তেমনি কালচারকে আগ্রাসনের মুখে ঠেলে দিয়ে জাতিকে বাঁচানোর চেষ্টা বৃথা।" সুতরাং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সামগ্রিকভাবে নিজস্ব সত্তাকে পরিষ্কারভাবে জানতে হবে। নিজস্ব সত্তাকে পরিষ্কারভাবে জানলে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে একটি পরিচ্ছন্ন বোধ আমাদের মানস পরিমণ্ডলে স্থিতি লাভ করবে। আমরা হয়ে উঠবো পূর্ণ মানুষ, ইসলাম যাকে 'কামিলে ইনসান' অভিধায় আখ্যা দেয়। আর একজন ইনসানে কামিল হলেন একজন প্রকৃত মানুষ এবং একজন প্রকৃত মুসলমান। একজন প্রকৃত মুসলমান স্বাভাবিকভাবেই একজন সাচ্চা দেশপ্রেমিক হবেন। কেননা, তিনি ইসলামের অনুশাসনকে গ্রাহ্য করবেন। দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ।

অতএব দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আমাদেরকে একজন প্রকৃত মুসলমান, প্রকৃত মানুষ ও প্রকৃত দেশপ্রেমিক হতে হবে। বিজাতীয় সংস্কৃতি দ্বারা কোনোভাবেই নতুন করে আক্রান্ত না হই। অর্থাৎ স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সংস্কৃতির স্বরূপ হবে আত্মসচেতনতা এবং সচেতন আত্মার দুর্বার উন্মোচন ও অগ্রগতি, যার দ্বারা পাশ্চাত্য ও ভারতীয় তথা সব রকমের অপসংস্কৃতির মোকাবিলায় শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

বস্তুত ঐ শক্তিশালী পদক্ষেপের নাম-ই হচ্ছে একটি দুর্বার, অপ্রতিরোধ্য ও সার্বিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন।

কে এমন আছে যে জাতির পিতা ইব্রাহীম (আ.)-এর নাম শোনেনি? এবং তার ছেলে, তার সত্যনিষ্ঠ প্রিয়তম সন্তান ইসমাঈল (আ.)-এর কাহিনী শোনেনি?

অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর আমলে। কিন্তু ইসমাঈলের কোরবানীর ঘটনা সত্যিই অভূতপূর্ব।

[দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকায় ২০শে ডিসেম্বর ২০০০ প্রকাশিত]

www.nagorikpathagar.org

[অগ্রন্থিত সাক্ষাৎকার- ৪]

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের মুখোমুখি

কবি মতিউর রহমান মল্লিক। দেশের খ্যাতিমান কবি তিনি। শুধু কবি কেন- তিনি সফল গীতিকার, সুরকার, প্রাবন্ধিক এবং শিল্পীও। অনুবাদেও তাঁর হাত অসাধারণ। সত্যের ব্যাপারে তিনি সব সময়ই আপসহীন। তাঁর ছড়া-কবিতা-গানে রয়েছে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার সাহসী প্রেরণা গানে-গানে মুসলিম জাতির চরিত্র, ঐতিহ্য, করণীয়, সৃষ্টিরহস্যসহ বিভিন্ন বিষয় খুব চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন যা অনেকের পক্ষেই করা সম্ভব হয়নি। তিনি লিখে যাচ্ছেন বিরামহীন ভাবে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ পাঁচ। নকীব পত্রিকার মাধ্যমে আমরা তাঁর মুখোমুখি হয়েছিলাম তিনি বলেছেন আমাদেরকে তার কথা। তাঁর সাথে কথোপকথনে ছিলেন অলিউদ্দিন মানিক।

নকীব : আমাদের দেশে মাসিক-দ্বিমাসিক-পাক্ষিক পত্রিকা সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

মল্লিক : আমাদের দেশে মাসিক-দ্বিমাসিক-পাক্ষিক এবং অন্যান্য ম্যাগাজিন পত্রিকা যে পরিমাণ বের হচ্ছে সংখ্যার দিক থেকে সে পরিমান যথেষ্ট নয়। আরো বেশী বের হওয়া উচিত। যা বেরচ্ছে তার মধ্যে আদর্শিক পত্রিকা আরো কম। যেমন পৃথিবী, কলম, কিশোরকণ্ঠ এ ধরনের পত্রিকার সংখ্যা খুবই কম। এ গুলো মূলত; জাতির আশা-ভরসা। এ সব পত্রিকায় যে সব বক্তব্য থাকে সে সব বক্তব্য সারা দেশের মানুষের জন্য খুবই প্রয়োজন। তারপরও মানগত দিক থেকে আমাদের দেশের পত্রিকাগুলোর অবস্থা খুব ভালো নয়। হাতে গোনা কয়েকটি পত্রিকার মান ভালো। আমি মনে করি যে দিন গ্রামে গ্রামে পত্রিকা বের হওয়া শুরু করবে এবং গ্রামে গ্রামে পত্রিকার জন্য কাজ শুরু হবে সে দিনই আমরা মনে করতে পারব যে, পত্রিকা বের করার ব্যাপারে আমরা কাঙ্ক্ষিত অবস্থানে পৌছেছি।

www.nagorikpathagar.org

নকীব : একটি পত্রিকা বের করার জন্য কি কি উপকরণ প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

মল্লিক : এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই আমি বলতে চাই যে, একটি পত্রিকা বের করার জন্য প্রথমে একজন উদ্যমী মানুষের প্রয়োজন। 'প্রেক্ষণ' পত্রিকার কথাই বলা যাক। 'প্রেক্ষণ' পত্রিকা হচ্ছে একটি মানুষের অবিরাম প্রচেষ্টার ফল। অধ্যাপক খন্দকার আবদুল মোমেন একাই একটি পত্রিকা বের করছেন। আসলে কোনো মানুষের ভেতরে যদি তাগিদ থাকে তা হলে আর যে সব উপকরণের প্রয়োজন তা ক্রমাগতভাবে হাতের কাছে এসে যায়। সে জন্য আমি মনে করি যে, একজন অনুপ্রাণিত মানুষের প্রথমে প্রয়োজন। তার পরে সে মানুষটির আরো যা যা প্রয়োজন আছে তার জন্য কাজ করতে হবে। আমাদের দেশে সবচে সমস্যা হচ্ছে যে, পত্রিকা প্রকাশ করার যে প্রয়োজন আছে এই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করার মত লোকের সংখ্যাও খুব কম। ড. শহীদুল্লাহ বলেছেন প্রকাশ কর, "প্রকাশ কর, কেবল প্রকাশ কর। আল্লাহর নামে প্রকাশ কর, যৎ সমান্যই হোক। একেবারে সামান্য হলেও প্রকাশ কর"।

নকীব : লেখক তৈরীর ক্ষেত্রে একটি পত্রিকার ভূমিকা কি হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

মল্লিক : লেখক তৈরীর ব্যাপারে একটি পত্রিকার ভূমিকা অসাধারণ। একটি পত্রিকা চাইলে একজন বড় কবি বানাতে পারেন, একজন বড় প্রবন্ধকার বানাতে পারেন, একজন বড় উপন্যাসিক বানাতে পারেন একজন নামজাদা সম্পাদক, প্রকাশক বানাতে পারেন। আসলে একটি পত্রিকা লেখক তৈরীর সব চেয়ে বড় প্ল্যাটফরম। শুধু লেখকই সে তৈরী করে না বোদ্ধা পাঠকও তৈরী করে এবং শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গনে ব্যক্তিত্বও সে তৈরী করে।

আমাদের পত্রিকা থাকেনা বলে আমাদের যে ধরনের লেখক প্রয়োজন যে ধরনের প্রবন্ধকার প্রয়োজন, সাংবাদিক প্রয়োজন সেই কাঙ্ক্ষিত মানের লোকজনও আমাদের তৈরী হয়নি। তাছাড়া একটি পত্রিকা প্রকাশের বিষয়টি অগ্রগতিরও লক্ষণ যেখান থেকে একটি পত্রিকা বের হলো বুঝতে হবে যে, সেখানকার সবধরনের তৎপরতা বেড়ে গেছে এবং সব ধরনের তৎপরতা সেখানে মজবুতি অর্জন করেছে। যেখানে পত্রিকা নেই সেখানে শিল্প, সাহিত্য সংস্থার অঙ্গনে লোকজনেরও টিকে থাকার মাধ্যম নেই।

www.nagorikpathagar.org

নকীব : লেখার অনুপ্রেরণা কি ভাবে পাওয়া যায়?

মল্লিক : একটি চমৎকার প্রশ্ন। একজন লেখক নানাভাবে অনুপ্রাণিত হতে পারে। আমার মনে হয় একজন লেখক, যিনি লিখতে চান তিনি যদি বিচরণশীল হন অর্থাৎ তিনি যদি চলমান ব্যক্তিতে পরিণত হন তাহলে নানাভাবে তিনি লেখার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা পেতে পারেন। এজন্য উচিত একজন লেখক কে সামাজের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার। যে মানুষটি সমাজের নানা উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত সেই মানুষটি তার কাজের মধ্য দিয়ে লেখার ক্ষেত্রেও অনুপ্রাণিত হতে পারেন। কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন সমাজ সম্পৃক্ত মানুষ। এই পৃথিবীর উর্ধ্বে ও তার সামনে অনেক পৃথিবী রয়ে গেছে। একটি জীবন তার সামনে শেষ জীবন নয়। এই জীবন পার হওয়ার পরও অসংখ্য জীবন তার জন্য কাজ করছে। একজন লেখককে সত্যিকারার্থে অনুপ্রাণিত হতে হলে পড়াশোনা করতে হয়, শিখতে হয়, লিখতে হয়, চোখ-কান-নাক, সবকিছু খোলা রাখতে হবে। যে যত বেশি পড়বে সে তত বেশি লেখার উপাদান পাবে। যে যত বেশি সন্ধানী হবে সে তত বেশি লেখবার মত সম্পদ পাবে।

নকীব : প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে একজন তরুণ উদ্যোগী লেখকের প্রতি আপনার পরামর্শ কি?

মল্লিক : এটি একটি এমন ক্ষেত্র যে, এক এক জনের কাছ থেকে একেক রকম পরামর্শ পাওয়া যেতে পারে। আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে কিছু পারামর্শ দিত পারি। প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে চর্চার। যত বড় মেধাবী হোক না কেন সেই মেধার সাথে যদি চর্চার অভ্যাস না থাকে তাহলে সে মেধা কোন কাজে আসে না। আর চর্চা করার জন্য অলসতাকে পরিহার করা উচিত। যে মানুষটি অলস সেই মানুষটির পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। সে যত বড় যোগ্যতার অধিকারীই হোক। এই জন্যই আল্লাহ রাব্বুল, আলামিন বলেছেন "লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফি কাবাদ"-অর্থাৎ আমি মানুষকে দুঃখ কষ্টের মধ্যে সৃষ্টি করেছি। যে সব মানুষ কষ্ট করতে পারে সে সব মানুষ ভাগ্যবান। চর্চার জন্য কষ্ট করা দরকার। বেশি বেশি লেখা পড়া করা দরকার। বেশি বেশি লেখা পড়া করলেই প্রতিতা আরও বিকশিত হয়।

নকীব : বর্তমান বাংলাদেশে লেখকদের পৃষ্ঠপোষকতা যথেষ্ট কিনা?

মল্লিক : আমারতো মাঝে মধ্যে মনে হয় বাংলাদেশের লেখকদের কোনই পৃষ্ঠপোষক নেই। বাংলাদেশের লেখকদের পৃষ্ঠপোষকতা যদি থাকত

www.nagorikpathagar.org

তা হলে তাদের এ অবস্থা হতো না। পাশ্চাত্য দুনিয়া একজন লেখক লিখে যা উপর্জন করে সেই উপার্জন সেখানকার একজন বড় ব্যবসায়ীর পক্ষেও সম্ভব নয়। আর আমাদের এখানে যারা লিখতে চায় তাদের জন্য চাকুরী-বাকুরী করা ছাড়া কোনই উপায় থাকে না। একজন লেখককে লেখার উপরে বেঁচে থাকা আমাদের দেশে সম্ভব হচ্ছে না। পৃষ্ঠপোষকতা বলতে যা বুঝায় লেখকদের জন্য আমাদের দেশে তার কিছুই নাই। সামান্য কিছু চাকরী দিচ্ছে, বেঁচে থাকার জন্য ব্যবস্থা করে দিচ্ছে যেটা আগেও ছিল না। তবুও এখন দু'একটি জায়গায় এটা দেখা যাচ্ছে। এটা একটা ভালো লক্ষণ। পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে সাহিত্যের উৎকর্ষতা হয় না। আগের দিনে লেখকদের পৃষ্ঠপোষকতা করত রাজ রাজারা। পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্র করেছে, আর এখন? এখন নামকাওয়াস্তে কিছু প্রতিষ্ঠান আছে। যথার্থ অর্থে তারা পৃষ্ঠপোষকতা করে না। দু'চারজন লেখককে পৃষ্ঠপোষকতা করলেও রাজনীতির ঘোর মার-প্যাঁচের একটা জটিল অবস্থা করে যাচ্ছে। আমি মনে করি এসব ক্ষেত্রে আমাদের তা-ই করা উচিত যা লেখক-শিল্পী-সাহিত্যিকদের জন্য রাসূল সা. করেছেন। আমিতো মনে করি যে, লেখক, শিল্পী-সাহিত্যিকদেরকে যথার্থ সম্মান করার মত একটি মহান মানুষ পৃথিবীতে এসেছিলেন যার নাম মুহাম্মাদ (সা.)। সাহিত্য এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর সুন্নাহ যদি চালু হত তাহলে যথার্থ পৃষ্ঠপোষকতা রক্ষা পেত।

নকীব : সাক্ষাৎকার দেয়ার জন্য নকীব পত্রিকার পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ।

মল্লিক : সুদূর নোয়াখালী থেকে এসে সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য আপনাদেরকেও ধন্যবাদ।

তথ্যসূত্র

[প্রকাশিত সাক্ষাৎকার]

১. দারুসসালাম, একটি মননশীল মাসিক, জানুয়ারি ২০০০,২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, সম্পাদক: মোহাম্মদ শরিফ হোসেন।

২. মেঠোপথ, সৃজনশীল সাহিত্য সাময়িকী, ডিসেম্বর ২০০০,সম্পাদক: এফ এম মোহাম্মদ নূরুল হক ।

৩. নিব, একটি শোভন ছড়াপত্র, ফেব্রুয়ারি ২০০১, সম্পাদক: আফসার নিজাম

www.nagorikpathagar.org

৪. চাঁড়ুলিয়া, সাহিত্য ত্রৈমাসিক, এপ্রিল-মে-জুন ২০০১, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, সম্পাদক: ওমর বিশ্বাস।

৫. আমাদের নোয়াখালী, একটি তথ্যভিত্তিক ম্যাগাজিন, বিজয় দিবসের বিশেষ সংখ্যা ২০০১, সম্পাদক: আবুল খায়ের নাঈমুদ্দীন।

৬. দ্রষ্টা, একবিংশের সাহিত্যপত্র, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০০২, সম্পাদক: নাঈম মাহমুদ, প্রকাশনায়: বিপরীত উচ্চারণ সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ।

৭. সুরসঞ্চারী, ইসলামী গানের প্রথম ব্যাকরণ, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০২, প্রকাশক: মুহম্মদ সোয়াইব হোসাইন, পরিচালক: বিকল্প সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ, রাবি, রাজশাহী, লেখক : আমিরুল মোমেনীন মানিক।

৮. নাবিক ৩, ডিসেম্বর ১৯৯৯, মতিউর রহমান মল্লিককে নিয়ে বিশেষ সংখ্যা, সম্পাদক: ওমর বিশ্বাস।
উল্লেখ্য, নাবিকের এ সংখ্যাটিতে মতিউর রহমান মল্লিককে নিয়ে লিখেছেন- হাসান আলীম, সাবিনা মল্লিক, রফিক মুহাম্মদ, আকিব একরাম ও আহমদ মফিজ [মরহুম কবি গোলাম মোহাম্মদের ছদ্মনাম]।

[অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকার]

১. এই সাক্ষাৎকারটি নেয়া হয়েছিল 'বিপরীত উচ্চারণ' অথবা অন্য কোন সাহিত্য সংকলনের জন্য। 'দারুসসালাম' পত্রিকায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকারটির বিষয় ছিল গানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ওই সাক্ষাৎকারটিকে বর্ধিত আকারে পুনঃপ্রকাশের লক্ষ্যে এ সাক্ষাৎকারটি নেয়া হয়েছিলো। দারুসসালামে কবি মৃধা আলাউদ্দীনের গ্রহণ করা ওই সাক্ষাৎকারটিই ছিলো মতিউর রহমান মল্লিকের গান নিয়ে প্রথম আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার। যা একটি পত্রিকায় বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। আমাদের ইচ্ছে ছিলো, আরও কিছু প্রশ্নের জবাব এতে সংযোজিত হোক। দুটি সাক্ষাৎকারকে একটিতে পরিণত করে আমরা প্রস্তুত করেছিলাম। ওই সাহিত্য সংকলনটি প্রকাশ না হওয়ায় এ সাক্ষাৎকারটি অপ্রকাশিত থেকে যায়। এটি আমার (আহমদ বাসির) কাছেই সংরক্ষিত ছিলো। সাক্ষাৎকারটি নেয়া হয়েছিলো ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, কবির শেখের টেকের বাসায় বসে।

২. কবির 'চিত্রল প্রজাপতি' কবিতার বইটি বের হওয়ার পরপরই এ সাক্ষাৎকারটি নেয়া হয়েছে। কবি তাজ ইসলামের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'স্বরশব্দ' সাহিত্যপত্রের জন্য সাক্ষাৎকারটি নেয়া হয়। এর আগে স্বরশব্দের একাধিক সংখ্যা প্রকাশ পেলেও পরবর্তীতে এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে এ সাক্ষাৎকারটিও আলোর মুখ দেখতে পায়নি। সম্পাদক তাজ ইসলামের নিকট থেকে এটি সংগ্রহ করা হয়। সাক্ষাৎকারটি নেয়া হয়েছিল ২০০৭ সালে।

www.nagorikpathagar.org

দেশজ প্রকাশন

Motiur Rahman Mollik
Rachanabali- 4th Part
Published on September 2024
Price: 610 Tk only

ISBN: 978-984-98985-4-2